নারীর কোনও দেশ নেই

তসলিমা নাসরিন

অল্পকথা

বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা কলামগুলো একত্র করে এই গ্রন্থ। 'নির্বাচিত কলাম', 'যাবো না কেন যাবো', 'নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য', 'ছোট ছোট দুঃখ কথা'র কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে নারীর কোনও দেশ নেই। আমি বিশ্বাস করি নারীর কোনও দেশ নেই। দেশ মানে যদি নিরাপত্তা, দেশ মানে যদি স্বাধীনতা, তবে নারীর নিশ্চয়ই কোনও দেশ নেই। পৃথিবীর কোথাও নারী স্বাধীন নয়, পৃথিবীর কোথাও নারীর নিরাপত্তা নেই। নিরাপত্তা যে নেই, তা প্রতিদিনের ঘটনা-দুর্ঘটনায় প্রকাশ পায়, যার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এই কলামগুলোর অধিকাংশই। এক একটি মুহূর্ত মিশেই অবশ্য কাল তৈরি হয়। আমি যে কালের মানুষ, সেই কালেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে এনে ফ্রেমে পুরেছি। যে ছবিটি দেখা যাচ্ছে, সেটি আঁধার আঁধার। কিন্তু আগামী কালের ফ্রেমে একটি আলোকিত ছবি চাই, এই চাওয়াটি বা এই স্বপ্নটি আছে বলেই আঁধারকে মেলে ধরি। আমার স্বপ্নটিকে কেউ কেউ 'সাহস' বলে ডাকে। যে যে নামেই ডাকুক, আমার এইটুকু ভুললে চলে না যে আমি এই বিশ্বের শত কোটি নির্যাতিত নারীর একজন। আমি যদি আমার কথাই খানিকটা বলি, তাহলেই যথেষ্ট আমি বা আমরা কেমন আছি, তা বোঝাবার জন্য।

কলকাতা   তসলিমা নাসরিন
২০০৭

বইটি উৎসর্গ করছি সেই মেয়েদের, যারা পাছে লোকে কিছু বলার
ভয়ে থেমে থাকে না, তারা যা তাদের ইচ্ছে করে, তা-ই করে

সূচিপত্র

পুরুষের বেলায় ‘অধিকার’, নারীর বেলায় ‘দায়িত্ব’

পুরুষেরা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে যে মর্যাদা পায়, নারীরা তা পায় না। পায় না, কিন্তু পাওয়া উচিত। এটি নতুন কোনও কথা নয়, সমতায় এবং সততায় বিশ্বাস করা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বহুকাল ধরে বলছেন এ কথা। মুঠো মুঠো ইতিহাস তুলে, তত্ত্ব-তথ্য-দর্শন বর্ষণ করে তাঁরা দেখিয়েছেন একসময় নারীর অবস্থা কোথায় ছিল, বিবর্তনে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং কতটা পথ এখনও বাকি আছে বুড়ি ছুঁতে।

মেয়েদের কি কেবল এই তৃতীয় বিশ্বই ঠকাচ্ছে! প্রথম বিশ্বেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কোনও ধারণা ছিল না মেয়েরা মায়ের জাতের বাইরেও একটি জাত, সে জাতের নাম মানুষ-জাত। মেয়েরা চিরকালই নগণ্য হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে, নাগরিক হিসেবে নয়। নাগরিক শব্দটির উৎপত্তি নগর থেকে। একসময় এক একটি নগরই ছিল এক একটি রাষ্ট্র। ভূমধ্যসাগরের কিনারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পনেরোশ নগরই, প্ল্যাটো মজা করে বলতেন ‘পুকুরের চারধারে ব্যাঙের মতো’, ছিল সেকালের গ্রীস। গ্রীসে, আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে প্রথম যেখানে গণতন্ত্র চালু হয়েছিল, সেই গণতন্ত্রে নাগরিকের মর্যাদা পেত যারা সরকার চালাতো, রাজনীতির জ্ঞান ছড়াতো, তারাই, হাতে গোনা কিছু গণ্যমান্য লোক। নাগরিকত্ব পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকতো বাচ্চাকাচ্চা, নারী আর ক্রীতদাস-দাসী।

নাগরিকত্ব, নাগরিক অধিকার — এসব ধারণার ধীরে ধীরে উত্তরণ হতে থাকে। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আরও বিস্তৃত হয়, আরও গভীর হয় নাগরিকত্বের বোধ। সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য এটির প্রয়োজন ছিল। নাগরিক-নীতিবোধ গড়ে তুলে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় প্রতিশ্রুত হওয়া, স্ব স্ব কর্মে, শ্রমে, শৃঙ্খলায়, দেশাত্মবোধে-প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করা ছিল নাগরিক হওয়ার শর্ত। সাম্রাজ্যের সকলেই নাগরিকত্ব পেয়ে গেল। এটি কেবল মুখের কথা হয়ে রইল না, রীতিমত আইনী প্রতিষ্ঠা পেল। চমৎকার ব্যাপার। কিন্তু নাগরিক হওয়া থেকে বঞ্চিত এই রোমান সাম্রাজ্যেও রয়ে গেল দুটো জাত(!), নারীজাত আর নিচুজাত।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে এক পক্ষের কাঁধের দায়িত্ব অপরপক্ষের কাঁধেও কিছু গড়িয়ে গেল। নাগরিককে একগাদা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পালন করার জন্য, কিন্তু নাগরিকের জন্য রাষ্ট্রের কি কোনও দায়িত্ব নেই ? নিশ্চয়ই থাকা উচিত, এখন থেকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল নাগরিকের শারীরিক, পারিবারিক, বৈষয়িক নিরাপত্তা বিধান করা।

রাষ্ট্রের দায় দায়িত্ব এবং নাগরিকের অধিকার বিষয়ে ফরাসি দার্শনিকদের চিন্তাভাবনা সাধারণ জনগোষ্ঠীতে এমনই প্রভাব ফেলেছিল যে ফরাসি বিপ্লবের মতো বিস্ময়কর ঘটনাও একদিন ঘটে গেল। লেখা হয়ে গেল মানুষের অধিকারের আইন। ওদিকে আমেরিকার মতো নতুন দেশেও পরিবর্তনের জোয়ার উঠেছে। স্বাধীনতা আন্দোলন ঘটেছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সমানাধিকারের সংবিধানও রচিত হয়ে গেছে, গেছে বটে, কিন্তু ক্রীতদাস প্রথা, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, পুরুষতন্ত্র সবই বহাল তবিয়তেই বিরাজ করছে তখন, যেসব প্রথায়, বাদে, তন্ত্রে কালো মানুষ, দরিদ্র আর নারীর কোনও অধিকার স্বীকার করা হয়নি।

পুরুষেরা এভাবেই বিশ্ব জুড়ে নিজেদের অধিকারকে ‘মানুষের অধিকার’ বলে ঘোষণা করেছে। কোনও বিপ্লবই — কোনও সংবিধানই — কোনও আইনই নারীর পক্ষে কোনও টুঁ শব্দ করেনি। নারীকে আদৌ মানুষ ভাবার মন বড় বড় বরেণ্য বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরও ছিল না। পুরুষের জন্য ‘অধিকার’ এর ব্যবস্থা হয়েছে, পুরুষের কথা বলার, ভোট দেবার, ভোটে দাঁড়াবার, ভাবার, স্বাধীনতা পাবার অধিকার। নারীর জন্য হয়েছে দায়িত্বের ব্যবস্থা । ঘরসংসার সামলানো, পুরুষকে সুখ স্বস্তি দেওয়া, সন্তান উৎপাদন করা, সন্তানাদি লালন পালন করার ‘দায়িত্ব’। এক শতক দুই শতক করে সময় পার হচ্ছে, নারীকে যে কুয়োতে ফেলে রাখা হয়েছিল, সে কুয়োতেই আছে, ওদিকে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে তথাকথিত গণতন্ত্রের চমক বাড়ছে, রংঢং বাড়ছে, স্বাধীনতা এবং অধিকার পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু কী আশ্চর্য, নারীর অধিকারের কথা কোনও পুরুষ বা মহাপুরুষ উচ্চারণ করছেন না। দুএকজন বলেছেন বটে, কিন্তু নারীকেই দাঁড়াতে হয়েছে শেষ অবধি, রক্ত ঝরিয়ে নারীকেই লড়তে হয়েছে নিজের অধিকার আদায় করতে। ভোটের অধিকারের জন্য দীর্ঘ বছর ধরে আন্দোলন করে তবেই সফল হয়েছে পশ্চিমের নারীরা। কিন্তু পশ্চিমের নারীর সফলতার অর্থ কিন্তু ব্যাপক অর্থে নারীর সফল হওয়া নয়। এই একবিংশ শতাব্দীতেও পৃথিবীর অনেক দেশেই নারীর ভোটের অধিকার নেই। নারী এখনও রাজনীতি অর্থনীতি, শিক্ষা স্বাস্থ্য সর্বক্ষেত্রে ভয়ংকর বৈষম্যের শিকার। নিজের প্রাপ্য অধিকার থেকে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত।

ঔপনিবেশিকতাবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিভূরা নারীকে ঠিক কী চোখে দেখেছেন, নারীর নাগরিকত্বের প্রশ্ন নিয়ে তাঁদের ভাবনা-চিন্তার রকমই বা কী ছিল! কী ছিল? ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে সংঘাত শুরু হলে ওই শক্তির ঐতিহ্যর চেয়ে ভারতীয় ঐতিহ্য যে কালি-কালিমা মুক্ত, গঙ্গাজলে স্নাত, শুদ্ধ — তা বোঝাতে ভারতীয় নারীকে আগের চেয়েও বেশি বন্দি হয়ে থাকতে হল ঘর গৃহস্থালির ক্ষুদ্র জগতে। ভারতীয় সংস্কৃতি, সে সংস্কৃতি নারীর স্বাধীনতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করার সংস্কৃতি হলেও তা রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব জাতীয়তাবাদীরা ভারতীয় নারীর ঘাড়েই চাপিয়েছিল। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম দিকে প্রচুর বইপত্র বেরিয়েছে নারীর স্থান যে ঘরে, স্থান যে বাইরে নয়, তা বোঝাতে। বাইরের জগত

পুরুষের, নারীর নয়। বাইরের জগতে শক্তি সাহস দরকার, বাইরের জগত পরিশ্রমের, সংগ্রামের, বাইরের জগত যুদ্ধের, রাজনীতির, ওখানে পুরুষকে মানায়, নারীকে নয়। নারী নরম। নারী ভঙ্গুর। নারী ভীতু। নারী বুদ্ধু। 'আত্মবিস্মৃতি' এবং 'আত্মত্যাগ', এ দুটো জিনিস দিয়েই নারীকে সংসারধর্ম পালন করতে হবে। এ থেকে সামান্যও বিচ্যুতি চলবে না। এদিকে পুরুষের জন্য দুটো গুণ খুব প্রয়োজনীয়, 'আত্মনির্ভরতা' এবং 'আত্ম গৌরব'। এ দুটো গুণ নারীর থাকলে ঘর সংসার ভেস্তে যাবে, সমাজ নষ্ট হবে, জাতির সর্বনাশ হবে।

নারীর জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীতার কথা বলা হত, সে শিক্ষা আদর্শ স্ত্রী এবং আদর্শ মাতা হিসেবে গড়ে ওঠার শিক্ষা। উনিশ'শ বিয়াল্লিশ সালে বের হওয়া 'নারীধর্ম শিক্ষা' বইটিতে নিয়মশৃঙ্খলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নম্রতা, নতজানুতা এসব শিক্ষা পই পই করে নারীকে দেওয়া হয়েছে। বইটিতে আদর্শ গৃহিণীর ছবি আছে, প্রথম নারী ঝাঁ চকচকে রান্নাঘরে বসে চরকা কাটছে, দ্বিতীয় নারী একটি গোছানো বৈঠক ঘরে বসে 'নারীর কর্তব্য' নামের বই পড়ছে, তৃতীয় নারী ওই একই ঘরে একটি মাদুরের ওপর বসে একটি শিশুর সঙ্গে খেলছে। মেনে চলার জন্য নারীর উদ্দেশে কিছু নিয়ম দেওয়া আছে বইটিতে। নিয়মগুলো এরকম। ১. সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং রাতে ঘুমোতে যাবার সময় ভগবানের নাম নেবে। ২. সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠতে হবে, তা না করতে পারলে উপোস কর। ৩. স্নান করে এসে সূর্যের পুজো কর। ৪. এক হাজার পাঁচশ বারো বার হরে রাম মন্ত্র উচ্চারণ কর। ৫. ভগবানকে প্রতি ঘন্টায় কমপক্ষে একবার করে মনে কর। ৬. বয়স্কদের পা ছুঁয়ে প্রণাম কর। ৭. কখনও ক্রোধান্বিত হবে না। ৮. ভগবানের পুজো কর। ৯. কখনও অতৃপ্তি বা অসন্তুষ্টি দেখাবে না। ১০. যদি তোমার স্বামী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের ওপর তোমার চোখ পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম নেবে। ১১. কখনও কোনও সমালোচনা করবে না। ১২.খাওয়ানোর সময় কাউকে ঠকাবে না। ১৩. কখনও নিষ্ঠুর হয়ো না। ১৪. কখনও কৌতুক কোরো না। ১৫. কখনও অন্যের মনে কষ্ট দিও না। ১৬. সদা সত্য কথা বল। ১৭. কখনও কিছু লুকিয়ো না। ১৮. যদি তুমি নিয়ম ভঙ্গ কর, তবে একশ আটবার হরে রাম মন্ত্র জপো। — ঘোর জাতীয়তাবাদী-ধার্মিক-পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ থেকেই এই আদেশ। ভগবান-সেবায়, স্বামী-সেবায়, সংসার-সেবায় যেন মগ্ন হয় নারীকুল। ভারতীয় নারীকে হতে হবে ভারতীয় আদর্শের প্রতীক, কিন্তু ভারতের পূর্ণ নাগরিকত্ব পাবার যোগ্যতা তাদের থাকবে না। ভারতের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে প্রতিহত করা হবে। ঘটনা তো তাই ঘটেছে, ঘটিয়েছে পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষেরা, জ্ঞানে গুণে তারাই তখন সর্বেসর্বা। শাসকের ভাষা ও সংস্কৃতির পাঠ নিয়ে শাসকের তন্ত্র মন্ত্র শিখে শাসককেই আক্রমণ করেছে। ভালো কথা, কিন্তু কোথায় তারা সমতা আর সাম্যের স্বপ্ন নিয়ে অন্তঃপুর থেকে নারীকে উদ্ধার করবে, তা নয়ত করেছে উল্টোটি।

উনিশ'শ সতেরো থেকে উনিশ'শ চল্লিশ অবধি ভারতে নারীর ভোটের অধিকার নিয়ে ইওরোপ আমেরিকায় যে রকম আন্দোলন হয়েছিল, তা না হলেও, মৃদুকণ্ঠে

তর্ক বিতর্ক চলেছে। ভোটের অধিকার একজন নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার, অথচ তার এই অধিকারকে অস্বীকার করেছে ভারতীয় হিন্দু মুসলিম দুই ধর্মেরই জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ। নারী ভোটের অধিকার পেলে সংসার উচ্ছন্নে যাবে, পর্দাপ্রথার ক্ষতি হবে।— সে কী ভয়ার্ত চিৎকার ভারতবর্ষ জুড়ে! নারীত্ব আর নাগরিকত্ব এ দুটোর মিলন কিছুতেই নাকি হতে পারে না।

নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন, নাকি সর্বজনীন ভোটাধিকার, কোনটা চাই? নারীদের একদল এই পক্ষে তো আরেকদল ওই পক্ষে। তিরিশের দশকে গোড়ার দিকটায় এ-ই ঘটে। রাজনীতিকদের মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক চলে দীর্ঘদিন। বিতর্ক চলছে, এর মধ্যে দুম করে একদিন, ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে, পুনা প্যাক্টে সায় দিয়ে দিলেন কংগ্রেসের কিছু নেতা, সঙ্গে গাঁধীজিও। হিন্দু এলাকায় নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করে এলেন তাঁরা। আপোস করলেন। ভোটাধিকারের জন্য বিভিন্ন-ধর্মবিশ্বাসী নারীর একজোট হয়ে যে আন্দোলন, সে আন্দোলনের কণ্ঠদেশ ঠান্ডা মাথায় কেটে দিয়ে এলেন।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের আগ পর্যন্ত ভারতীয় নারীবাদীরা ইংরেজ এবং আইরিশ নারীবাদীদের প্রেরণায় ভোটের দাবির জন্য পথে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই নারীর দাবি-প্রসঙ্গ উবে গেল জাতীয়তাবাদের হাওয়ায়। সবার তখন স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার সাধ। নারীকে দাসী বাঁদি ভাবার প্রাচীন পুরোনো পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ তখন জাতীয়তাবাদী চেতনার খোরাক। নারীসংস্থা-সংগঠন যদিও ছিল বেশ কিছু, সকলে, বুঝে না বুঝে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে গেল। ভোটের প্রশ্ন উঠলে সরোজিনী নাইডু, বেগম শাহ নেওয়াজ, রাধাবাই সুব্বারিয়ান সকলে মিনমিন করে বলতে চেষ্টা করেছেন যে, 'নারীরা সংসারধর্ম ঠিক ঠিক পালন করেও রাজনৈতিক অঙ্গনে পা ফেলতে পারে, ভোট দিতে পারে। এতে নারীর নারীত্ব, সতীত্ব কিছুই খোয়া যাবে না। রাজনৈতিক সচেতনতা এলে নিজের সন্তানকেও আদর্শবাদী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।' নারীনেত্রীরা, কারও যেন কোনও ভুল বোঝার অবকাশ না থাকে, বলে দিয়েছেন যে, 'তাঁরা নারীবাদী নন। তাঁরা পশ্চিমের নারীদের মতো লিঙ্গযুদ্ধ চাচ্ছেন না। তাছাড়া, নারীবাদী আন্দোলনের কোনও প্রয়োজন ভারতবর্ষে নেই। কারণ এখানে যে কোনও কাজেই পুরুষ নারী পরস্পরকে সহযোগিতা করতেই অভ্যস্ত।' কিছু উচ্চ-মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, সচ্ছল, সুযোগ সুবিধে পাওয়া নারী কী ভয়ংকরভাবেই না ভুলে গিয়েছিলেন দেশের অধিকাংশ নারীর কথা, অধিকাংশ যারা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিরক্ষর, নির্যাতিত, অবহেলিত এবং অসম্মানিত।

ভারত স্বাধীনতা পেল, বিভক্ত হল দেশ, বিভক্ত হয়ে গেল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ রেখে দাঁড়ানো নারী। নারীর পরিচয় এখন আর 'নারী' নয়, তারা কেউ 'সংখ্যাগুরু', কেউ 'সংখ্যালঘু'। তারা এখন ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় টিকিয়ে রাখার যন্ত্র। নারী-স্বাধীনতার যে আন্দোলনটি ভারতবর্ষে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তার বড় করুণ মৃত্যু হলো। ভারতীয় সংবিধান জোর দিয়েছে ধর্মের স্বাধীনতার। আর এই সুযোগে অশিক্ষিত অসহিষ্ণু মুসলমান-পুরুষেরা মুসলমান-নারীদের ভারতীয় গণতন্ত্রের

মানবাধিকার, নিরাপত্তা আর ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য করছে। শাহবানু মামলাতে দেখা গেছে এ ক্ষেত্রে মদত দিচ্ছে সম্প্রদায়ে বিশ্বাসী সাম্প্রদায়িক রাজশক্তি।

উনিশ'শ চৌত্রিশ সালে সর্ব ভারতীয় নারী-সভায় দাবি উঠেছিল সমতার আইনের, উত্তরাধিকার, বিবাহ এবং সন্তানের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করার দাবি, সেদিনের সেই দাবি আজও দাবি হিসেবেই রয়ে গেল। অবশ্য এই দাবি এখন অনেকটা অচ্ছুতের মতো। 'মুসলিম পারিবারিক আইন'-এর সংস্কার বা এর বিলুপ্তি নিয়ে কথা উঠলেই হিন্দু-মৌলবাদী-দলের সমর্থক হিসেবে দুর্নাম কামাতে হবে, এই ভয় তথাকথিত সেকুলার নারী-পুরুষেরও। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, যে বিধিতে নারী পুরুষের মধ্যে সমতার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হয়, সেই বিধি কি গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত নয়! 'ধর্মীয় আইন' যদি মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ধ্বংস করে, তবে সেই আইন অক্ষত রেখে কার কী লাভ করছে ভারতবর্ষ? ধর্ম তো ক্ষণে ক্ষণে দেশটিকে ছোবল দিচ্ছে, তবু ধর্মকে দুধকলা খাইয়ে বড় করার অদম্য স্পৃহা দূর হয় না অদূরদর্শী স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদদের!

হিন্দু আইনে নারী পুরুষের বৈষম্য ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলা হয়েছে কিন্তু মুসলিম আইনে নারীর অধিকার এখনও বড় একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন। শাস্ত্র অনুসরণ করে 'পারিবারিক আইন' তৈরি হয় যে রাষ্ট্রে, সে রাষ্ট্রকে 'সেকুলার' বলি কী করে! সম্প্রদায় ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন দেওয়ানি বিধি থাকে, কী করে তবে সেই রাষ্ট্রকে 'অসাম্প্রদায়িক' বলি! নারী পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত নয় যে রাষ্ট্রে, সেই রাষ্ট্রকে 'গণতন্ত্র' বলি কী করে!

অনেকে বলে, সতীদাহ, মুসলিম পারিবারিক আইন, এবং আরও অনেক লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারতের নারীরা দীর্ঘ দীর্ঘকাল আন্দোলন করেছেন। এ বিষয়ে আমার দ্বিমত আছে। ভারতবর্ষে, সত্যিকার অর্থে, আমার বিশ্বাস, কোনও শক্তিশালী নারীবাদী সংগঠন ছিল না, কোনও নারীবাদী-আন্দোলনও হয়নি, এ যাবৎ নারীর পক্ষে যা কিছুই হয়েছে, হয়েছে সমাজসংস্কারক শিক্ষিত পুরুষের করুণায়। অশিক্ষার অন্ধকারে পুরে সংসারখাঁচায় বন্দি করে রাখার পুরুষতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের শিকার নারী, এই নারী তার অধিকারের ব্যাপারে অচেতন, এই নারী স্বাধীনতার স-ও জানে না। কিছু পাওয়ার জন্য যাদের কঠিন সংগ্রাম করতে হয়নি, তারা জানে না পাওয়ার অর্থ কী। কোনওরকম আন্দোলন ছাড়াই যারা নানারকম অধিকার পেয়ে যায়, তাদের পক্ষে অধিকারের গুরুত্ব বোঝা কঠিন, প্রাপ্য অধিকার আদায় করার জন্য আন্দোলন করাও কঠিন। নারীবিরোধী আইনের অন্যায় অত্যাচারে বছরের পর বছর ধরে নারী অসহনীয় দুর্ভোগ পোহাতে থাকলেও, ভয়াবহ গণধর্ষণের শিকার তারা হলেও, গণহারে তাদের খুন করা হলেও খুব কম নারীই পথে নামে প্রতিবাদে। ভারতের নারীরা হাত গুটিয়ে বসে থাকে কোনও মহাপুরুষ এসে তাদের সব সমস্যার সমাধান করে যাবে এই আশায়।

আসলে, সে সংস্কৃতির কোনও দেশে কোনও সমাজে সংস্কৃতি হিসেবে সম্মান পাওয়া উচিত নয়, যে সংস্কৃতি মানুষের মুক্তচিন্তা এবং স্বাধীনতার ক্ষতির কারণ হয়, যে সংস্কৃতি নির্মমভাবে মানুষের অধিকার হরণ করে। মানুষের কল্যাণের জন্যই সংস্কৃতি। অকল্যাণকর কিছু ঘটলে সে সংস্কৃতির হয় আমূল সংস্কার হোক, নয় তা ছুড়ে ফেলা হোক আবর্জনায়। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সংস্কৃতিই পুরোনো হয়ে পচে গলে মরে গেছে। মানুষ এগিয়ে গেছে সামনে।

নারীর অধিকার এবং বহুসংস্কৃতির সমাজকে একই সঙ্গে কী করে টিকিয়ে রাখা যায়, এই প্রশ্ন সামনে। আমার বক্তব্য হল, যে করেই হোক অধিকার টিকিয়ে রাখতে হবে, এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে যদি সংস্কৃতি চলতে পারে ভালো, তা নয়তো পিছিয়ে পড়বে। পড়ুক। নারীর প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব নারীর অধিকারকে বাঁচিয়ে রাখা।

সূত্র: *জেনডার্ড সিটিজেনশিপ*, অনুপমা রায়

বাঙালি পুরুষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিনে বেশ অনেকে গৌরব করে বলেছে যে সুনীলের জীবনে বহু নারীর সমাগম ছিল, আমি বসে ভাবছিলাম, আজ কি কোনও লেখিকাকে নিয়ে এমন কথা কেউ বলতে পারবে যে তার জীবনে পুরুষ ছিল অনেক, পুরুষদের সঙ্গে প্রচুর প্রেম করেছে সে, চমৎকার সব কবিতা লিখেছে পুরুষদের নিয়ে, তার বহু-পুরুষ-গমন নিয়ে গৌরব কি করতে পারবে কেউ, যেমন গৌরব সুনীলের বেলায় করা হয়! সুনীল বা অন্য যে কোনও পুরুষের বেলায়!

বাঙালি পুরুষের সঙ্গে আমার শেষ প্রেম আজ থেকে দেড় যুগেরও বেশি আগে। নির্বাসিত জীবনে প্রেম দুএকবার এসেছে। ভিন ভাষায় প্রেমের অনুভব প্রকাশ করা যে সম্ভব হতে পারে তা আমার কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু দেখলাম, সম্ভব। প্রাচ্যের এবং পশ্চিমের পুরুষের মানসিকতা একটা সময়ে গিয়ে একই রকম ঠেকে, একই রকম ম্যাগালোম্যানিয়া রোগে ভোগা, কিন্তু আচার আচরণে এক নদী তফাত। বেশির ভাগ বাঙালি পুরুষ মনে করে প্রেম করতে হলে সাতজন নারীর সঙ্গে প্রেম করতে হয়। এবং এর নাম বুঝি আধুনিকতা। সাতজনের সঙ্গে যা করা হয় তার নাম ফষ্টিনষ্টি হতে পারে, প্রেম নয়, আধুনিকতা তো নয়ই। একজন নারীর সঙ্গে প্রেম করে যে দীর্ঘ দীর্ঘ বছর সুখে অতিসুখে কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এ বিষয়ে তাদের ধারণা প্রায় নেই বললেই চলে। আধুনিকতা নয়, এর নাম আমি বলি প্রাচীনতা। রাজা বাদশাহ বা জমিদারদের জীবন যেরকম ছিল, উপপত্নীতে হারেম ছেয়ে থাকত, সেই প্রাচীন পুরোনো জীবনটি প্রায় সব পুরুষই যাপন করতে চায়, প্রকাশ্যে না পারলে লুকিয়ে, লুকিয়ে না পারলে মনে মনে। ভারতবর্ষের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরুষদের বীভৎস রকম সুবিধে দিয়ে আসছে। এইসব সুবিধে তাদের এত বেশি আকাশে উঠিয়ে দিয়েছে যে নিচের দিকে চাইলে কীটপতঙ্গের মত, তুচ্ছ খড়কুটোর মত দেখায় নারীদের, কিছুতে আর তাদের মানুষ বলে বোধ হয় না। যে সমাজে নারী বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, জীবনভর নির্যাতিত, যে সমাজে নারীদের যৌনসামগ্রী ছাড়া আর কিছু মনে করা হয় না, সেই সমাজ থেকে হঠাৎ গিয়ে পড়েছি পশ্চিমের আধুনিক সমাজে, যেখানে পুরুষ এবং নারীর কোনও ভেদ খালি চোখে বোঝা তো অসম্ভবই, তলিয়ে দেখলেও কোনও সুতো পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে নারী পুরুষের সমানাধিকার যে দেশগুলোয় সবচেয়ে বেশি, সেসব দেশে বাস করতে গিয়ে দেখেছি

পুরুষেরা একজনের সঙ্গে প্রেম করে, তার সঙ্গেই জীবন যাপন করে, ঘুরে ঘুরে সাত রমণীর সঙ্গে শুতে যায় না। যদি ভালোবাসা উবে যায়, তবে সম্পর্কের ইতি ঘটিয়ে দেয়। নতুন করে পরে হয়তো কাউকে ভালোবাসে। নতুন কোনও সম্পর্ক তৈরি করে, তৈরি করে যাকে সত্যিকার ভালোবাসে, তাকে নিয়ে। বিয়ের কাগজ ওসব দেশে কোনও জরুরি কাগজ নয়, যে জিনিসটি সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে, তা কোনও কাগজ নয়, পত্র নয়, সমাজের রক্তচক্ষু নয়, তার নাম হল ভালোবাসা। নিখাদ ভালোবাসা। ভালোবাসা না থাকলে পশ্চিমে বিচ্ছেদ হয়, এ দেশে ভালোবাসা না থাকলেও বিচ্ছেদের প্রশ্ন ওঠে না। ওঠে না নারী অসহায় বলে, পরনির্ভর বলে, সন্তান লালন পালনের ভার নারীর ওপর বর্তায় বলে, সংসার সাজিয়ে রাখার জন্য নারী সুন্দর সামগ্রী বলে, ভালো পোশাক পরা সাজগোজ করা উন্নতমানের দাসী বলে।

মিথ্যের ওপর, জোড়াতালির ওপর দাম্পত্য সম্পর্ক টিকে থাকে। হৃদয়ে প্রেম নেই, অসন্তোষ আছে, ঘৃণা আছে, অথচ কেবল অভ্যেসের কারণেই বাঙালি পুরুষেরা পুরো জীবন কাটিয়ে দেয় স্ত্রীর সঙ্গে। স্ত্রীকে ভালোবাসা এবং কেবল স্ত্রীসঙ্গেই তুষ্ট থাকা, তারা মনে করে, খুব একটা গৌরবের কাজ নয়, এতে পৌরুষ উজ্জ্বল হয় না। সাধারণ মানুষ তো নয়ই, অসাধারণ মানুষও সত্যিকার শ্রদ্ধা করতে শেখেনি নারীকে, না শিখলে যা হয়, নারীর সম্মান অসম্মানের তোয়াক্কা কেউ করে না। শিল্পী সাহিত্যিক পুরুষদের সঙ্গে আমার বন্ধুতা শত্রুতা সবকিছু। এদের দেখেছি, আহা নারীর প্রেমে যেন জীবন দিয়ে দেবে এমন। খুঁজে পেতে দেখা যায়, একই সঙ্গে কয়েকজন নারীর জন্য তারা একই রকম হা পিত্যেশ করছে। বিশ্বস্ততা বা ফেইথফুলনেস, যেটা নারী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পশ্চিমে, এই প্রাচ্যে এই ভারতবর্ষে এই বাংলায় সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয়, সবচেয়ে অবান্তর, সবচেয়ে নগণ্য বিষয়। তবে বিশ্বস্ত এক পক্ষকে থাকতে হবে, সে হল 'স্ত্রীজাতি'কে। স্ত্রীজাতি স্বামীর নাম উচ্চারণ করবে না, বারণ। স্ত্রীজাতি তাদের স্বামীদের আমার কর্তা বলে সম্বোধন করবে, নিয়ম। স্ত্রীজাতি স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, স্বামীর ঘামেভেজা রুমালের মতো, দুর্গন্ধ অন্তর্বাসের মতো, অন্য পুরুষের ব্যবহার-অযোগ্য।

অল্প ক'জন বাঙালি পুরুষের সঙ্গে আমার যৌন সম্পর্ক ঘটেছে, এতেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। অন্য নারীর অভিজ্ঞতাও আমার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। পশ্চিমের পুরুষেরা তাদের সঙ্গীর শীর্ষসুখের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন, সঙ্গীকে সাত আকাশে উড়িয়ে পুলকপ্রপাতে ভাসিয়ে তারপর সুখের সমুদ্রে নিজের নৌকোখানি ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাঙালি পুরুষ তাদের সঙ্গী নিয়ে মোটেও ভাবিত নয়। সঙ্গীকে শরীরের সাঁড়াশি দিয়ে আটকে রেখে, যেন বাঘে এইমাত্র একটা নরমসরম হরিণ ধরেছে, তড়িঘড়ি নিজের খাওয়াটা খেয়ে নেয়। এভাবেই তৃপ্ত হয় নিঃসাড় নারীর ওপর পুরুষের মনের কোণে লুকিয়ে থাকা ধর্ষণের স্বাদ নেওয়ার গোপন কামনা। শক্তি খাটিয়ে শরীরের তলে চেপে পিষে যেন কোনও কোলবালিশের ওপর নিজের বীর্য পতন ঘটিয়ে পাশ ফিরে পুরুষের পরমানন্দে ঘুমিয়ে পড়াকে সংসারে

কার সাধ্য নিন্দা করে! যে কোনও সভ্য সমাজে কোনও স্বামী যদি স্ত্রীর ইচ্ছের বাইরে তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে, সেই সম্পর্ককে যাহা বলা হয় তাহা সম্বন্ধে অধিকাংশ বাঙালি পুরুষ আদৌ অবগত নহেন, তাহার নাম ধর্ষণ। এবং ধর্ষণের শাস্তি স্বামী নামক ধর্ষকদের অন্য যে কোনও ধর্ষকের মতই মাথা পেতে বরণ করতে হয়। অধিকাংশ বাঙালি পুরুষ অবাধ যৌনসম্পর্কে পারদর্শী বলে নিজেদের যৌনবিশারদ মনে করে, তারা কিন্তু জানেই না নারীর যৌনাঙ্গের যাবতীয় শিল্প/বিজ্ঞান সম্পর্কে খুঁটিনাটি, কোথায় স্পর্শ করলে নারী খরদাহে পোড়ে, কোথায় করলে জলোচ্ছ্বাসে ভাসে তা কে কবে জানতে চেষ্টা করে! রমণের জন্য রমণী রক্তিম হল কি না তা বোঝার ইচ্ছেও কারও হয় না। পুরুষ বোঝে কেবল তার নিজের সুখ, নিজের আনন্দ। বাঙালি পুরুষেরা নিজেকে কদর্যভাবে ভালোবাসে, যদিও বলে, কাব্য করে, কোনও নারীকে সত্যিকার কিন্তু তারা ভালোবাসে না।

পুবের দেশগুলোয় একটা কথা খুব চালু আছে, 'পশ্চিমে ফ্রি সেক্স চলে'। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি, পশ্চিমে আমি কোনও ফ্রি সেক্স দেখিনি, ফ্রি সেক্স দেখেছি পশ্চিম বাংলায়, দেখেছি বাংলাদেশে। এখানে যৌন উত্তেজনার তীব্রতায় যে কারও ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পুরুষেরা দ্বিধা করে না। পশ্চিমে সেক্সের জন্য একটা বড় জিনিসের দরকার হয়, সে হল ভালোবাসা। অন্তত ভালো তো লাগতে হবে। আরও একটা জিনিসের দরকার হয়, তার নাম সততা। পশ্চিমে যে ব্যতিক্রম কিছু দেখা যায় না, তা নয়। সাইকোপ্যাথ সব দেশেই থাকে। কোথাও কম, কোথাও বেশি। বাঙালি কোনও সাইকোপ্যাথকে কি সত্যি সত্যি সাইকোপ্যাথ বলা হয়! হয় না। বরং অনেক সময় তাদের বুদ্ধিজীবী বলা হয়ে থাকে। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার রাখেন বলে মনে করেন, এই হল সমস্যা। বুদ্ধিজীবীরা সাধারণত পুরুষ, তাঁরা অন্যায় করলে সে অন্যায়কে অন্যায় বলে মনে করা হয় না। সত্তর পার করেও বুদ্ধিজীবীরা সতেরো বছরের কিশোরীর বুকে থাবা বসাতে সংকোচ করেন না। ওই থাবাকে লোকে নিজগুণে ক্ষমা করে দিয়ে বলে যে, এ কবিতা বা উপন্যাস লেখার বা কোনও শিল্প গড়ার বা বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণা আহরণ করা বৈ কিছু নয়। শিষ্যরা মাথা নেড়ে সায় দেয়। এখানে এই গুরু শিষ্যের দেশে, সাধারণের চেয়ে দু-ইঞ্চি ওপরে উঠেই যে কেউ গুরু বনে যেতে পারে, আর বাজারে হাত বাড়ালেই অগুনতি শিষ্য। বলো যে পৃথিবীটা চ্যাপ্টা। শিষ্যরা সমস্বরে বলবে, ঠিক ঠিক। শুনেছি পুরুষ-শিষ্যরা তাদের স্ত্রীদের প্রায়ই উপঢৌকন হিসেবে দেয়, চেখে টেখে ঢেঁকুর তুলে গুরু অবশ্য যার মাল তাকে ফেরত দেন, কিন্তু আবার চাখার আবার মাখার একটি অলিখিত চুক্তি করে নিয়েই তবে দেন। ব্যাপারটি একতরফা নয়, গুরুরা ফাঁক পেলেই শিষ্যদের নানারকম সুবিধে দান করে যারপরনাই উদারতা দেখিয়ে থাকেন।

বাঙালি পুরুষের কি নীতি বলে কিছু নেই! হ্যাঁ অনেকের নীতি আছে। অধিকাংশ নীতি প্রদর্শন করছে বাইরে, ভেতরে যদিও দুর্নীতির আখড়া। আমি প্রত্যেকের কথা বলছি না। বলছি অনেকের কথা। বলছি অধিকাংশের কথা। স্ত্রীদের তাঁরা বাড়ির লোক বলেন। ঘরের বউ বলেন। বাড়িঘর পাহারা দেওয়ার জন্য, বাড়িঘরের কাজকম্ম

সারার জন্য বাড়িতে থাকে বলে বউএর সঙ্গে সম্পর্ক ঘরের, বাড়ির। বাড়ির বাইরে যে বউকে নিয়ে তাঁরা বেরোন না তা নয়, বেরোন, তবে ওই বেরোনো বন্ধুকে নিয়ে বেরোনোর মত নয়, অনেকটা কাঁধে পাহাড় নিয়ে বেরোনোর মতো। লক্ষ্য করেছি স্ত্রীদের পাশাপাশি হাঁটার অভ্যেস পুরুষের নেই। স্বামী আগে হাঁটবে, স্ত্রী হাঁটবে পিছনে। সপ্তপদীর হন্টন থেকেই বুঝি শুরু হয়ে যায় সুখী বিবাহের এই শর্ত। পুরুষ তার প্রেমিকা নিয়ে অবশ্য পাশাপাশি হাঁটে তবে ততদিন হাঁটে যতদিন না প্রেমিকাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া হয়। যতদিন পাবো পাবো, ততদিন পাশাপাশি। পাওয়া হয়ে গেলেই আমি সামনে, তুমি পিছনে।

প্রেমের গুরু রবিঠাকুরই যদি প্রেমিকাকে নিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে না পারেন, তবে আর আমাদের রমেন রঞ্জনের দোষ কী! পাওয়া হোক বা না হোক, রবীন্দ্রনাথের বেলায় কিন্তু অবশ্য সামনে পিছনের ব্যাপার ছিল না, যা দেখেছি যা শুনেছি সবই হল, আমি উঁচুতে, তুমি নিচুতে। আমি চেয়ারে, তুমি আমার পায়ের কাছে।

বাঙালি পুরুষের মধ্যে স্ত্রীকে পরম বন্ধু এবং প্রেমিকা ভাবার রেওয়াজ নেই। তাঁরা স্ত্রীকে কিছু স্বাধীনতা দান করে বাইরে বলে বেড়ান যে স্বাধীনতা দিয়েছেন। যেন স্বাধীনতা কাউকে দেবার জিনিস, যেন এ মানুষের জন্মগত অধিকার নয়! বাঙালি পুরুষ আলাদা নয়। সব রক্ষণশীল, সব পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রায় এরকমই নিয়ম। কিন্তু বাঙালি পুরুষ শিক্ষিত হয়েও, শিল্পী হয়েও, সাহিত্যিক হয়েও, বুদ্ধিজীবী হয়েও পুরুষতন্ত্রের আরাম ভোগ করার জন্য পাগলপ্রায়।

বলা হয়, পশ্চিমের পুরুষের হৃদয় বলে তেমন কিছু নেই, প্রেমে বাঙালিই পড়ে, বাঙালিরই হৃদয় আছে, বাঙালিই কাঁদে। সম্পূর্ণ ভুল কথা। প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে গেলে পশ্চিমী নারী পুরুষ উভয়কেই আমি উন্মাদের মত কাঁদতে দেখেছি। একদিন দুদিনের কান্না নয়, মাসব্যাপী কান্না। বছরব্যাপী কান্না। ছুরিতে হাত পা কাটতে দেখেছি। বিষ খেতে দেখেছি। মেট্রোর তলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছি। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞর কাছে দৌড়োতে হয় ভগ্ন হৃদয়ের প্রেমিক প্রেমিকাকে। পৃথিবী ঘুরে অনেক হৃদয়বান প্রেমিক দেখেছি, বাঙালি পুরুষের মতো পাষণ্ড প্রেমিক কমই দেখেছি। বাঙালি পুরুষের মতো অপ্রেমিকও আমি কম দেখেছি।

নারী শরীর

নারী শরীর নিয়ে এতকাল পুরুষেরা লিখেছেন, এঁকেছেন, গড়েছেন তাঁদের মনের মাধুরী মিশিয়ে। নারীর অধিকার ছিল না নারীর শরীর নিয়ে লেখার। মন নিয়ে লিখতে পারে, কিন্তু শরীর নিয়ে নয়। কিন্তু নারী-লেখক-কবিরা এখন পুরুষের তৈরি করা গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছেন। তাঁরা তাঁদের শরীর নিয়ে তাঁদের মতো করে লিখছেন। নারীর শরীর যে পুরুষের সম্পত্তি নয়, অথবা পুরুষ-লেখক-কবিদের অধিকৃত বিষয় নয়, তা নারী-লেখক-কবিরা যদি অনুধাবন করতে পারেন, তবে সাহিত্যের জগতে খুব বড় একটি পরিবর্তন দেখা দেবে। বাঙালি সমাজ কুৎসিত পুরুষতন্ত্র দ্বারা এখনও আক্রান্ত, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে পুরুষতান্ত্রিক নিয়মনীতিগুলো ভাঙার চেষ্টা সামান্য হলেও চলছে, সম্ভবত বাঙালি নারী-লেখক-কবিদের অনেকেই সুশিক্ষিত এবং স্বনির্ভর এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন বলেই। কিন্তু সমাজে এখনও নারী অসহায়, এখনও নারী পণ্য, ভোগ্যপণ্য, যৌনসামগ্রী হিসেবেই চিহ্নিত। নারী ইস্কুল কলেজে যাচ্ছে, কিন্তু সত্যিকার শিক্ষিত হচ্ছে না। নারী উপার্জন করছে, কিন্তু পুরুষের ওপর নির্ভরশীলই থেকে যাচ্ছে। বেশির ভাগ নারীই পুরুষতন্ত্রের ধারক এবং বাহক। বেশির ভাগ নারীই জানে না যে তারা নির্যাতিত। বেশির ভাগ নারীই ভয় পায় বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেতে। নারীর জন্য এই অসহায় অবস্থাটি সৃষ্টি করেছে এই পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা। নারী এই সমাজে পুরুষের দাসী। খালি চোখে দাসীকে দাসী বলে মনে হয় না যদিও, সম্পর্কের গভীরে গেলেই বোঝা যায় যে দাসী। নারী যখন প্রেমিকা, সে দাসী, নারী যখন স্ত্রী, তখনও সে দাসী। উন্নতমানের দাসী। পুরুষ প্রেমিক বা স্বামীর আদেশ নির্দেশ মেনে চলতে হয় তাকে। পুরুষ যেভাবে চায়, নারীর সেভাবে নিজেকে গড়তে হয়। সাজসজ্জা, আচার ব্যবহার, দোষগুণ সবকিছুর ধারণাই পুরুষের তৈরি করা। প্রেম ভালোবাসা পুরুষের জন্য অস্ত্র, নারীকে দুর্বল করার। প্রভু এবং দাসীতে প্রেম হয় না। পণ্যের সঙ্গে আর যাই হোক, প্রেম হতে পারে না। নারী নিজের যৌনইচ্ছের কথা প্রকাশ করলে তাকে ছি ছি করে সমাজের সকলে। নারীর যৌনকামনা থাকতে নেই, থাকলে সে নির্লজ্জ, সে নষ্ট, সে বেশ্যা। নারী তার শরীর সাজাবে পুরুষের জন্য, নিজের জন্য নয়। নারী বেঁচে থাকবে পুরুষের জন্য, নিজের জন্য নয়। এরকমই তো নিয়ম। ক’জন নারী জানে সঙ্গমে শীর্ষসুখ বলে একটি ব্যাপার আছে! খুব কম নারীই জানে। বেশির ভাগই মনে করে যৌনতা পুরুষের জিনিস। নারী

শুধু পুরুষের আনন্দের জন্য ব্যবহৃত হবে। শরীর নারীর, কিন্তু এতে অধিকার পুরুষের। নারী এক হাত থেকে আরেক হাতে সমর্পিত হয় সারাজীবনই। তার মালিক বদলায়। পিতা থেকে প্রেমিকে, প্রেমিক থেকে স্বামীতে, স্বামী থেকে পুত্রতে। নারীর জীবন তো নারীর নয়। বিভিন্ন সম্পর্কের পুরুষের কাছে নারী বাঁধা, শৃঙ্খলিত। এই যখন অবস্থা আমাদের সমাজের, তখন নারী-লেখক-কবিরা যখন নিজের শরীরের ওপর নিজের অধিকারের কথা লেখেন, যৌনস্বাধীনতার কথা লেখেন, তা হয়তো সমাজের সত্যিকার রূপকে তুলে ধরে না, কিন্তু একধরনের বিপ্লব, সেটি ছোটখাটো হলেও, কাগজে কলমে হলেও, ঘটায়। অনেকটা আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো, কেউ জ্বালিয়ে দিল, এখন কেবল ছড়িয়ে পড়লেই হলো। যে মেয়েরা লেখক-কবি নয়, তাদের মধ্যে আগুন নেই তা নয়, কিন্তু তাদের আগুন তাদের মধ্যেই থেকে যায়, প্রকাশ হয় না খুব। তাই সমাজ পরিবর্তনে শিল্পী সাহিত্যিকরা সবসময়ই খুব বড় ভূমিকা রাখে।

আমি নাকউঁচু সমালোচকদের মতো করে বলবো না যে শরীর নিয়ে লিখলেই তো শুধু হবে না, লেখা সাহিত্যপদবাচ্য হল কি না তা দেখতে হবে। না, আমি তা দেখবো না। মেয়েরা যাই লিখুক, যেভাবেই লিখুক, হৃদয় দিয়ে যদি লেখে, তা অন্যের হৃদয় স্পর্শ করবেই। সাহিত্যকে আমি কোনও সংজ্ঞায় ফেলতে চাই না। পাঠকের যদি ভালো লাগে, পাঠক যদি আলোড়িত হয় কোনও কবিতা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ পড়ে, তা-ই সাহিত্য। আমার ভাবনাটি এরকম।

নারী শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে, এটি আমার কাছে অনবদ্য একটি কবিতা। শৃঙ্খল ছেঁড়ার বা ভাঙার যে শব্দ, সে শব্দ আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গীত। এ নিয়ে কেউ যদি গল্প লেখে বা কবিতা লেখে, তা আশ্চর্য সুন্দর সাহিত্য, আমি তা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। হাজার বছর ধরে পরা শেকল ভেঙে যে নারী মুক্ত হয়, সে কবিতা না লিখুক, আমি তাঁকে কবি বলি বিশ্বাস করি।

সুন্দরী

অ্যান্টিএজিং, এক্সফলিয়েটর্স, মাস্কস, আই ব্রাউজ, আই লাইনার্স, আই শ্যাডো, বেস মেকআপ, ব্লাশ, কনসিলার, ইলুমিনেটর্স, লিপ গ্লস, লিপ লাইনার্স, লিপস্টিক, নেইল পলিশ — এরকম সহস্র সামগ্রী আজ বাজারে কেন? কাদের ব্যবহারের জন্য? এর উত্তর আমরা সকলেই জানি। মেয়েদের। আমার প্রশ্ন, কেন মেয়েদের এসব ব্যবহার করতে হবে? কেন মেয়েদের আসল চেহারাকে আড়াল করতে হবে নানান রঙ দিয়ে? কেন বানাতে হবে নকল একটি মুখ? নকল চোখ, নকল ঠোঁট, নকল গাল? এই প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে মেয়েরা, কারণ নিজেদের সত্যিকার চেহারা নিয়ে তারা হীনমন্যতায় ভোগে। কে এই হীনমন্যতাবোধটি জাগালো? কে বলেছে মেয়েদের মুখে কোনও ত্রুটি আছে, তাই অজস্র প্রসাধন মেখে সেই মুখকে ত্রুটিমুক্ত করতে হবে! ত্রুটিমুক্ত করলে তারা সুন্দরী আখ্যা পাবে!

মেয়েরা তটস্থ। খাবে না। খেলে মেদ জমবে শরীরে। কোথাও মেদ জমতে দেওয়া যাবে না। বুকের মাপ এই হতে হবে, কোমর ওই, পেট সেই, নিতম্ব এমন, উরু তেমন। সব কিছুরই মাপ নির্দিষ্ট করা আছে। সেই মাপ মতো শরীর বানাতে মেয়েরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। খাবার দেখলে ভয়। না খেতে খেতে মেয়েদের অনেকে আজ অ্যানোরেক্সিয়া আর বুলিমিয়া রোগে ভুগছে। মেয়েদের শরীরের আকার আকৃতি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কী মাপ হওয়া উচিত, তা তৈরি করছে কারা? শরীর নিয়ে মাপজোকের অংক কষছে কারা? কারা বলছে কোনও একটি মাপের মধ্যে শরীরকে না ফেললে সেই শরীর সুন্দর নয়? সেই মেয়ে সুন্দরী নয়?

মেয়েদের শরীর-এর জন্য বিশ্ব ব্যতিব্যস্ত। তাদের পোশাক এবং অলঙ্কারের অন্ত নেই। চারদিকে সাজ সাজ রব। শরীর সাজাও। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সাজাও। এটা পরো। ওটা মাখো। ফুটফুটে ঝলমলে চকচকে রাখো সর্বাঙ্গ। কিন্তু, কেন? কার জন্য? মেয়েরা কি একবারও ভাবে, কার জন্য? কাকে তৃপ্ত এবং তুষ্ট করার জন্য? অনেক মেয়েই জোর দিয়ে বলতে চেষ্টা করবে যে, নিজেদের জন্যই তারা সাজে, নিজের ভালো লাগাই মূল কথা। বটে। ওরকম মনে হয়। কিন্তু, ভালো লাগা এবং না লাগার উদ্রেক হওয়ার পিছনে দীর্ঘকালের শিক্ষা থাকে, তা কে অস্বীকার করবে? কে অস্বীকার করবে নারীকে সাজসজ্জা করানোর ইতিহাস?

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী হচ্ছে পণ্য। পুরুষের ভোগের সামগ্রী। কেউ মানুক না

মানুক, এ কথা সত্য। ঠিক যে রকম রূপ হলে পুরুষের উত্তেজনা জাগে, নারীবস্তুটিকে সেই রকম হতে হয়। এই নারীবস্তুটিকে ঠিক সেই রকম দেখতে শুনতে হতে হয়, যে রকম হলে পুরুষের শরীর এবং মনের আরাম হয়। নারীকে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যে সাজগুলো এবং যে কাজগুলো করতে হয়, তার সবই পুরুষ এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বার্থ রক্ষার জন্য। নারীর সতীত্ব, মাতৃত্ব, নত ও নম্র চরিত্র-রক্ষা সবই পুরুষের স্বার্থে। পুরুষ যেন নারীকে তার অধিকৃত সম্পত্তি এবং ক্রীতদাসী হিসেবে চমৎকার ব্যবহার করতে পারে। নারীকে কুক্ষিগত করার নানা রকম পদ্ধতির চল আছে। সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতির নাম প্রেম। প্রেম, নারীকে, এমনকী সবল নারীকেও এমন দুর্বল করে, এমন গলিয়ে ফেলে যেন পুরুষের চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় হওয়া ছাড়া নারীর আর কোনও উপায় না থাকে। সংসার মঞ্চে স্ত্রীর ভূমিকায় যাওয়ার আগে প্রেমিকার মহড়া চলে। এই মহড়ায় প্রেমিক পুরুষটির জন্য ত্যাগে এবং তিতিক্ষায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে পারলে নারী উতরে যায়।

সুন্দরী। এই বিশেষণটি এবং ধারণাটি পুরুষতন্ত্রে বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারী উভয়েরই তৈরি। তারাই নির্ধারণ করে কোন শরীরের নারীকে সুন্দরী বলে আখ্যা দেওয়া যাবে। তাদের দখলে আছে প্রচার এবং পণ্যসামগ্রীর বাণিজ্য। প্রচার হয়ে গেল ওই শরীরটি সুন্দর, অমনি ওই শরীরের মতো বুকপেটকটিউরুনিতম্ব বানানোর আয়োজন শুরু হয়ে যায়। ট্রেডমিল, এক্সারসাইজ বাইক, লাইপোসাকসান, প্লাস্টিক সার্জারি, সিলিকন ব্রেস্ট। বাজার ছেয়ে যায় পণ্যে, সেই পণ্যের ওপর সঙ্গে সঙ্গে নারীর দল হুমড়ি খেয়ে পড়ে অথবা তাদের ধাক্কা দিয়ে হুমড়ি খাওয়ানো হয়। নারীকে সুন্দরী হতে হবে। সুন্দরী না হলে এই সমাজে তার কোনও মূল্য নেই। সুন্দরী না হলে তার বন্ধু থাকবে না, বান্ধব থাকবে না, প্রেম হবে না, বিয়েও হবে না ভালো, ভালো চাকরি জুটবে না, কাজকম্মের ফল পাবে না, একঘরে হয়ে পড়ে থাকতে হবে। নারী তাই প্রাণপণে পণ্য হতে চায়। যেন সে বিকোয় ভালো। যেন তার শরীরটি ভালো খায় লোকে। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করতে নারী হঠাৎ শেখে না। শেখে জন্ম থেকেই। বাড়ির আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে শেখে, বাইরে পা বাড়িয়েই শেখে। রেডিও টেলিভিশনে শেখে, পত্র পত্রিকায় শেখে। মেয়েদের ম্যাগাজিন পড়ে আরও বেশি শেখে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে ঢুকে যায় এ জাতীয় শিক্ষা। ফলে, নারীর অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান বুদ্ধি ধারণ করার ক্ষমতা পুরুষের চেয়ে নারী অনেক কম রাখে।

সুন্দরীর সংজ্ঞা স্থান কাল ভেদে ভিন্ন রকম ছিল। আগে গায়ে গতরে মাংস থাকলে সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী বলা হত। এখন যত হাড়সর্বস্ব হবে, যত রুগ্ণ দেখতে হবে, না-খাওয়া-চেহারা হবে, তত সে সুন্দরী বলে বা পণ্য বলে গণ্য হবে। উনিশ শতকের চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে নারীদের ভারী তলপেট দেখলে মনে হয় বুঝি সকলেই সন্তান সম্ভবা। পেটের মেদ ঝরানোর কোনও নিয়ম তখন তৈরি হয়নি। এখন নিয়ম তৈরির পর শিল্পও বদলে গেছে। শিল্পও তো বেশ রমরমা শিল্প এখন। চারদিকে শরীরের স্বাভাবিক মেদ মাংস ঝরানোর প্রতিযোগিতা চলছে। বিশেষ করে তরুণীদের মধ্যে।

অনেকে বলে, ঠাকুরমা দিদিমারা অনেক বেশি স্বাধীন ছিল এই জমানার মেয়েদের চেয়ে। তারা অনেক বেশি নিশ্চিন্তে ছিল তাদের যা আছে তাই নিয়ে। নিজেদের শরীরের গড়ন নিয়ে তাদের হীনমন্যতায় ভুগতে হত না, নাক চোখ মুখ পরিবর্তনের জন্য চাপও অনুভব করতো না। হ্যাঁ, আগে যেমন তেমন দাসী হলেই চলতো। এখন সুন্দরী দাসী চাই। দিন দিন পুরুষের চাহিদা বাড়ছে। আর বাজার পরিকল্পনায় চাহিদা মাফিক নারী-পণ্য তৈরির ব্যবস্থা জোরদার হচ্ছে। শক্তিশালী মিডিয়া এবং মার্কেট সুন্দরী নারীর মডেল বা স্যাম্পল দেখিয়ে দিয়েছে, এখন এই ট্র্যাপে মেয়েরা টুপটুপ করে পড়ছে। সুন্দরী অসুন্দরী দু জাতের মাথায় স্বাভাবিকভাবেই মারাত্মক একটি চাপ। অসুন্দরীকে সুন্দরী হতে হবে, সুন্দরীকে সুন্দরীই থেকে যেতে হবে। এই চাপে, মস্তিস্ক সেই মেয়েদের যত না ভোঁতা, তার চেয়েও ভোঁতা হচ্ছে আরও। তাবৎ সম্ভাবনার ইতি ঘটিয়ে নিজেদের বেশ্যায় পরিণত করছে মেয়েরা। বেশ্যালয়ে বাস করে অভদ্র বেশ্যা, আর বেশ্যালয়ের বাইরে বাস করে ভদ্র বেশ্যা। দুজনেরই কাজ পুরুষকে মুগ্ধ করা, পুরুষকে আমোদ আহ্লাদ দেওয়া, যারপরনাই আনন্দ দেওয়া।

শারীরিক সৌন্দর্যই এই পচা পুরোনো পিছিয়ে থাকা সমাজে একটি মেয়ের প্রধান সম্পদ। সম্পদহীন মেয়ের জীবন রাস্তার কুকুর বেড়ালের মত, দুর্বিষহ। বিশ্বায়নের ফলে পশ্চিমা দেশের সুন্দরীর সংজ্ঞা এখন ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। সংজ্ঞা অন্তঃস্থ করছে আপামর জনগণ। চিন জাপানের মেয়েরাও এখন চোখ বড় করতে চাইছে, নাক টিকোলো করতে চাইছে। পারলে জিন পাল্টে দেয়। ডিএনএ র দিক নিশানা ঘুরিয়ে দেয়। পশ্চিমা দেশের পুরুষেরা নারীর ঠ্যাং দেখে পুলকিত হয়। ঠ্যাং নিয়ে আদিখ্যেতা কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও করেনি। কিন্তু হালের বিশ্বায়ন পশ্চিমের ঠ্যাং পুবে এনে ছেড়েছে। এখন ঠ্যাং দেখিয়ে মেয়েরা হাঁটা চলা করতে বাধ্য হচ্ছে। প্যান্ট বা স্কার্ট ওপরে উঠতে উঠতে নিতম্ব ছুঁই ছুঁই করছে। ভরা গালের সৌন্দর্যও এখন ভাঙা গালে এসে ঠেকেছে। পণ্যের আধুনিকিকরণ হচ্ছে, একই সঙ্গে নারীপণ্যের গায়েও যুগের হাওয়া। দখিনী হাওয়ার বদলে পশ্চিমী হাওয়া।

আমার বড় ভয় হয়। আরও ঘোর পিতৃতন্ত্রের কাদায় আমাদের সমাজসংসার ডুবে যাচ্ছে দেখে ভয়। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে সমাজে প্রতিষ্ঠিত উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক স্বনির্ভর মেয়েদের যখন ভয়াবহ সাজসজ্জার চেহারা দেখি। কেন তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব! যদি তাদেরই অভাববোধ থাকে, তবে সাধারণ পরনির্ভর মেয়েদের উপায় কী হবে? সহস্র বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরোনোর সংগ্রাম নারীরা কী করে করবে যদি নিজের শরীর নিয়ে তাদের নিজেরই লজ্জা পেতে হয়! মুখে চুনকালি না মাখলে যদি সে নিজেকে যোগ্য মনে না করে চোখ তুলে তাকাবার, তবে শৃঙ্খল ছেঁড়া তো হবেই না, বরং আরও কঠিন শৃঙ্খলে সে নিজেকেই জড়াবে আরও।

পশ্চিমের নারীবাদী আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল ষাট দশকে। কুৎসিত পুরুষতন্ত্রের গালে কষে থাপ্পড় লাগিয়ে নারী তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। রক্ষণশীল

পুরুষেরা তখন নিরবে নারীর উত্থান হজম করলেও এখন উগরে দিচ্ছে। হজম শেষ পর্যন্ত হয়না ওদের। এখন নারীকে পুতুল বানানোর চেষ্টাই তখনকার সেই সফল নারী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া। এখন নারীকে একশ বছর পিছনে টেনে নেবার ষড়যন্ত্র চলছে। নারী আবার শেকল পরো, সাজো, সুন্দরী হও, ঘরে বাইরে সুন্দরী প্রতিযোগিতার দৌড়ে কোমর বেঁধে নেমে পড়ো, এখন নারী-মাংস বিক্রির হাট বসাও চারদিকে। দুঃখ এই, পশ্চিমের নারীবাদী আন্দোলন এই ভারতবর্ষে এলো না, এলো তার ব্যাকল্যাশ, এলো নারীকে পণ্য করার সবরকম হৈ হুল্লোড়।

পটলচেরা চোখ, ফুলের মতো হাসি, কালো মেঘের মতো চুল, পীনোন্নত বুক, সুডোল বাহু — মেয়েদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে এরকম লক্ষ উপমা এবং চিত্রকল্পের ব্যবহারই প্রমাণ করে যে মেয়েদের শরীরই শেষ পর্যন্ত সব। ছেলেটি ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার অথবা ব্যবসায়ী অথবা লেখক অথবা শিল্পী। মেয়েটি বেঁটে বা লম্বা, কালো বা ফর্সা, সুন্দরী বা অসুন্দরী। এখনও পুরুষের পরিচয় তার কর্মে আর নারীর পরিচয় সে দেখতে কেমন, তাতে। দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরে এসব দেখেও মেয়েদের কেন রাগ হয় না? কেন বেশির ভাগ মেয়েই পরমানন্দে মেনে নেয় নারী পুরুষের বিকট বৈষম্য! কেন তারা প্রশ্ন করে না, কেন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে না, আমরা যেমন আছি তেমনই থাকবো? আমরা বোধবুদ্ধি সম্পন্ন রক্ত মাংসের মানুষ, রং করা পুতুল নই। আমরা আসল-এ বিশ্বাসী, নকল-এ নয়। কতটুকু বিদ্যে আমাদের পেটে আছে, কতটুকু শিক্ষা মাথায়, কাজে কেমন পারদর্শী, আমাদের কীসে কেমন দক্ষতা — সেগুলোই দেখার বা দেখাবার।

নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে সামান্য সচেতন হলে মেয়েরা নিশ্চয়ই বুঝতো যে জগতে যত নির্যাতন আছে মেয়েদের বিরুদ্ধে, সবচেয়ে বড় নির্যাতন হল, মেয়েদেরকে সুন্দরী হওয়ার জন্য লেলিয়ে দেওয়া। এর পিছনে যেন মেয়েদের অঢেল টাকা যায়, সময় যায়, মাথা যায়, যেন সর্বনাশ হয়। আর, পুরুষ নিশ্চিন্তে নিরাপদে ভুঁড়িঅলা, টাকঅলা, কুৎসিত কদাকার শরীর নিয়েও জগতের যাবতীয় ক্ষমতায় বহাল তবিয়তে বিরাজ করবে। কেউ তাদের শারীরিক সৌন্দর্য নিয়ে মোটেও ভাবিত হবে না। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে তাদের কাজকর্ম দেখে। এসবের কিছু ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম কখনও উদাহরণ হতে পারে না। অনেকে হয়ত বলবে সিনেমা থিয়েটার এবং বিজ্ঞাপনের জগতে পুরুষের সৌন্দর্য গোনা হয়। তা হয়ত হয় কিছু ক্ষেত্রে, কিন্তু তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। সিনেমার কথা ধরি, দিলীপ কুমারের মতো ইয়া মোটা কোনও অভিনেত্রীকে ভাবা যায় তারকা হিসেবে? যে শরীর নিয়ে গোবিন্দ নায়ক হয়, কোনও মেয়েকে কি অমন স্থূল শরীরে নায়িকা করা হবে কখনও? অমিতাভ বচ্চন তাঁর ত্বকের একশ ভাঁজ নিয়েও আজ মেগা স্টার থেকে যেতে পারেন, রেখাকে কিন্তু বলিরেখা সব ঘুচিয়ে তবে টিকে থাকতে হচ্ছে! উত্তম কুমার ঘরের বাইরে বেরিয়েছেন বয়স হলেও; চুলহীনতা, স্থূলতা, বলিরেখা নিয়েও যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তারকাখ্যাতি কমেনি, বরং বেড়েছে। সুচিত্রা সেনকে কিন্তু

ঘরবন্দি থাকতে হচ্ছে। বেরোলেই তাঁর তারকাখ্যাতি ঝটিতে বিদেয় হবে। এ কথা জানেন বলেই জনসমক্ষে তিনি চেহারা দেখান না। লুকিয়ে আছেন বছরের পর বছর। সুচিত্রা সেন খুব ভালো অভিনেত্রী ছিলেন, কিন্তু অত বড় অভিনেত্রীকেও মর্যাদা পেতে হয় তাঁর শরীরের কারণে। ত্বকে ভাঁজ পড়লে, স্তন নুয়ে পড়লে, চুলে পাক ধরলে, নারীরা, যত বড় অভিনেত্রীই তাঁরা হোন না কেন, আর সম্মান পান না। অপর্ণা সেনএর প্রতিভার ধারে কাছে আসার যোগ্যতা হবে না অনেক পুরুষ-চিত্রপরিচালকের। কিন্তু তারপরও, অজান্তেই তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চমৎকার শিকার হয়ে বসে আছেন। তাঁকেও কী ভয়াবহরকম সাজতে হয়, প্রমাণ করতে হয় যে তিনি সুন্দরী! আর সাহিত্যের জগত? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চেহারা দেখুন, তারাপদ রায়কে দেখুন, এরকম চেহারা নিয়ে কোনও মেয়ে-লেখক কি দুদিনও টিকে থাকতে পারতো?

আমি কান পেতে রই

কলকাতায় অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা আমার হচ্ছে। এখানকার ইস্কুল কলেজ পাশ করা বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোনো মেয়েরা, স্বনির্ভর কী স্বনির্ভর নয়, বলে বেড়ায় যে নারীরা সমানাধিকার পেয়ে গেছে। আপত্তি জানালে শ্লেষ ফুটে ওঠে ঠোঁটের কিনারে, শ্লেষের অনুবাদ করে নিই নিজ দায়িত্বে। আমি এদেশি নই বলে এ বিষয়ে আমি জানি না। নারী নির্যাতন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে অনেকে আকাশ থেকে পড়ে, নির্যাতনের কথা শুনেছে তারা কিছু, তবে, ঠিক কোথায়, কীভাবে, জানে না। সেঁটে থাকলে বিস্তর ভেবে নাক ঠোঁট কুঁচকে বলে দেয়, হ্যাঁ হলে গ্রামে হয় ওসব, শহরে নয়।

আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। আমাকে খুব বোকা দেখতে লাগে। খুব অস্ফুট স্বরে হয়তো জিজ্ঞেস করি, শহরে কোনও নির্যাতন নেই?

মাথা নাড়া উত্তর। না।

কোনও বৈষম্য?

না। না। এখানে মেয়েরা খুবই স্বাধীন।

তা বটে। স্বাধীন। স্বাধীনতার মানে কাকে বলে, এই মেয়েরা কি জানে? আমি নিশ্চিত, জানে না। এই যে স্বাধীন বলে নিজেদের তারা মনে করছে, মন তাদের স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে পারে না বলেই বলছে যে তারা স্বাধীন।

অধিকার কি সব পাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ সবটাই।

সত্যিই কি?

খুব ইনটিরিয়রে, মানে একেবারে গ্রামে অবশ্য মেয়েদের অধিকার পাওয়া হয়নি ততটা। বেচারা, ওদের জন্য সত্যিই মায়া হয়।

শুনে, গ্রামের মেয়ের চেয়েও শহুরে মেয়ের জন্য বেশি মায়া হতে থাকে আমার। লেখাপড়া জানা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেওয়া দুচারটে ছেলেবন্ধুর সঙ্গে মেশা মেয়ে স্বাধীনতার শীর্ষে উঠে গেছে বলে বিশ্বাস করছে। সে দেখেনা তার হাত পায়ে যে শিকল পরানো। সে বোঝে না যে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তার পূর্ব নারীরা যেমন যৌনসামগ্রী আর সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ছিল, তেমন সেও। আধুনিকতার হাওয়া লাগা মেয়েরা পুরুষের ভোগের ক্ষিধে বরং তিনগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই শহুরে

স্বাধীন নারী শাঁখা সিঁদুর প'রে এবং স্বামীর পদবী ধারণ ক'রে নিজেই জানান দিচ্ছে যে সে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। স্বামী নামক যে পদার্থটি তার আছে, সেটি তার নিরাপত্তা, যে নিরাপত্তাটি বিগড়ে গেলে তার সমূহ বিপদ, যে নিরাপত্তাটি খসে গেলে সেও খসে পড়বে।

অর্থ উপার্জনে কী লাভ, যদি একা দাঁড়াবার মতো মনের শক্তি এবং সাহস না থাকে! আমি অনেক স্বনির্ভর মেয়েকে দেখেছি সমাজের নারীবিরোধী নষ্টপচা নিয়মের সামনে নির্বিকার মাথা নোয়াতে। নিজের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখা এবং তা অর্জনের জন্য সব রকম ঝুঁকি নেওয়া সব শিক্ষিত এবং স্বনির্ভর মেয়ের পক্ষেও সম্ভব নয়।

গ্রামের অনেক নিরক্ষর মেয়েকেই আমি দেখেছি উচ্চশিক্ষিত শহুরে দাসী বাঁদীদের চেয়েও বেশি অধিকারবোধ নিয়ে বাঁচে। একটু এদিক ওদিক কেউ করলো তো কোমরে আঁচল বেঁধে গুষ্ঠি তুলে গালাগাল করে তবে ছাড়লো। গায়ে আঁচড় লাগলো, লেঠেল নামিয়ে দিল। নিজের হক আদায় করতে ওস্তাদ তারা। রীতিমত যুক্তি দিয়ে তর্ক করে। শহরের মসজিদে কোনও মেয়ের গিয়ে সাহস নেই নামাজ পড়ে আসে। কিন্তু গ্রামের মেয়েরা দলবেঁধে গিয়ে বিষম বিপ্লব করে নামাজ পড়ে এলো পশ্চিমবঙ্গেরই এক গ্রামে, এই সেদিন। ধর্মাচরণ করে যে মেয়েদের সত্যিকার কোনও লাভ হয় না, তা না জেনেও কিছু একটা তো করে ফেলল, যে কিছুটা ওই সমাজে নিষিদ্ধ ছিল! মেয়েদের পথগুলো শত সহস্র নিষেধের আবর্জনায় ভরা, পথ চলতে গেলে তাদের প্রধান দায়িত্ব যাবতীয় নিষেধগুলো আগে আস্তাকুঁড়ে ফেলা।

গ্রামের মেয়েরা সময় সময় রুখে ওঠে, বুঝে না বুঝে বিপ্লব বাঁধিয়ে ফেলে ঠিক, কিন্তু এর মানে এই নয় যে, গ্রামে যে অশিক্ষা কুশিক্ষা ছিল, তা নেই। নারীনির্যাতন নেই। এখনও সেসবের সবই আছে। বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, স্ত্রীহত্যা, ধর্ষণ, খুন বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। তবে তলে তলে বেশ ক'বছরে বেশ বদলেও গেছে কিন্তু গ্রামের কিছু চিত্র। মেয়েরা ইস্কুলে আগের চেয়ে বেশি যাচ্ছে। ইস্কুল হয়তো ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে একটা সময়ে, কিন্তু যাওয়ার ঢেউটা নতুন। দারিদ্র্য যে একটি বড় কারণ ইস্কুলে না যাওয়ার, তা ইস্কুলের মিডডে-মিলই প্রমাণ করে। ভাত পাবে বলে ইস্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়ে যায়। ভাত না পেলে ভাত অন্য কোথাও থেকে যোগাড়ে লেগে যায়। অ আ ক খ দিয়ে কারুর তো ক্ষিধে দূর হয় না। মেয়েদের জন্য ঘর সংসারের কাজ করা, বিয়ে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণ ইস্কুল ছাড়ার। এই ঝামেলা যাদের নেই, তারা দেখা যায়, দিব্যি ইস্কুল শেষ করে কলেজ অবধি পড়তে যাচ্ছে। সাইকেল চালিয়ে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে, গ্রামের রাস্তাকে আলোকিত করতে করতে যাচ্ছে। শহুরে ক'জন মেয়ে সাইকেল চালায়? কলকাতায় আমি একটি মেয়েকেও এ পর্যন্ত দেখিনি।

শহরের চেয়ে গ্রামের সংখ্যাই যেহেতু বেশি, শহুরে মেয়ের তুলনায় গ্রামের মেয়েই যেহেতু অধিক, গ্রামেই তরতর করে বাড়াতে হবে নারীশিক্ষা। সই করতে পারলেই শিক্ষিত নাম দিয়ে ঢপ মেরে আসা হয়েছে বহুকাল। এবার এসব বন্ধ হোক। শিক্ষিত

মানে সই করতে পারা তো নয়ই, ইতিহাস ভুগোল বিজ্ঞান পড়ে ডিগ্রি অর্জন করাও নয়, শিক্ষিত মানে নিজের অধিকার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করা। নারী যে কারও খেলনা নয়, পুতুল নয়, দাসী নয়, বস্তু নয়, যন্ত্র নয় — সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হওয়াই সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

একটি সমাজ কতটুকু উন্নত, তা ওই সমাজে নারীর উন্নতি কেমন তার ওপর নির্ভর করে। এ কথা আমি বিশ্বাস করি। গোটা জনসংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছে নারী। এই অর্ধেক সংখ্যক মানুষ যদি অশিক্ষিত এবং পরনির্ভর থেকে যায়, যদি নির্যাতিত এবং অত্যাচারিত থেকে যায়, সমাজের জন্য যদি এই বিপুল সংখ্যার মেধা, বুদ্ধি, শক্তি, ক্ষমতা কিছু কাজে না লাগে তবে সেই সমাজ তো পিছিয়েই থাকবে। নারী পিছিয়ে থাকলে প্রগতি পিছিয়ে থাকে। প্রগতি পিছিয়ে থাকলে সভ্যতা পিছিয়ে থাকে।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিঃসন্দেহে আকাশ ছুঁচ্ছে। কিন্তু সে তুলনায় নারীর সার্বিক উন্নয়ন কিন্তু প্রায় পাতাল স্পর্শ করেই আছে। নারীর অধিকার, মানবাধিকার এবং সমানাধিকারের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ব্যবস্থা, ধর্মমুক্ত, সংস্কারমুক্ত সুস্থ জীবনের দাবি নিয়ে সংগ্রাম করার জন্য শক্তিশালী কোনও নারী আন্দোলন নেই এ দেশে। কী রকম হবে তবে সেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যদি অর্ধেক জনসংখ্যাই বঞ্চিত থাকে নিজেদের অধিকার থেকে! সেই উন্নয়ন সত্যিকার উন্নয়ন নয়, যে উন্নয়ন নিয়ে গৌরব করা যায়। সৌদি আরব এবং সুইডেন, দুটো দেশই ধনী দেশ। তফাত কিন্তু ভয়াবহ। গণতন্ত্রে, বাক স্বাধীনতায়, মানবাধিকারে সুইডেন ১০০ পেলে সৌদি আরব পাবে ০। একটি সভ্য, অন্যটি নিশ্চিতই অসভ্য।

নারীকে কেউ স্বাধীনতা হাতে দিয়ে বলবে না ‘নাও’। নারীকে লড়াই করে নিজের স্বাধীনতা নিজেকে নিতে হবে। নারী নিজেই জানে না কী থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তো নারীর মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা দাসীর জাত। কী করে মুক্তি পাবে নারী! তবু আমি কান পেতে রই। কান পেতে রই দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরে ঘুমিয়ে থাকা নারীর জেগে ওঠার শব্দ শুনবো বলে।

আমার গৌরব, আমি স্বেচ্ছাচারী

আকাশ ভাঙা বৃষ্টি আর বজ্রপাত। এর মধ্যেই সেদিন বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। কী, বৃষ্টিতে ভিজবো।

কেন ভিজবে?

ইচ্ছে করেছে।

ইচ্ছে?

হ্যাঁ ইচ্ছে।

লোকে কী ভাববে বলো!

কী ভাববে?

ভাববে মাথা খারাপ।

ভাবুক।

বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে তো!

কী অসুখ?

সর্দি জ্বর।

করুক।

এই বয়সে এসব মানায় না।

কোন বয়সে এসব মানায়?

ষোলো সতেরো বছর বয়স হলে ঠিক হতো।

অনেকের চোখে তাও ঠিক নয়। কে বানিয়েছে কোন বয়সে কী করা উচিত কী উচিত নয়, তার লিস্ট?

সোসাইটি।

সোসাইটির জন্য আমরা, নাকি আমাদের জন্য সোসাইটি? মানুষই নিয়ম তৈরি করে। মানুষই নিয়ম ভাঙে। কোনও নিয়মই দীর্ঘকাল বিরাজ করে না।

আমাদের কথোপকথন এরপর আরও অনেক এগিয়ে শেষে স্বেচ্ছাচারে গিয়ে থেমেছে। স্বেচ্ছাচার শব্দের অর্থ যদি নিজের খেয়ালখুশিতে করা কাজ (সংসদ বাংলা অভিধান) হয় তবে অবশ্যই আমি স্বেচ্ছাচারী। একশ ভাগ। এ আমার জীবন। আমি সিদ্ধান্ত নেব আমার জীবনে আমি কী করবো না করবো। অন্যে কেন নেবে? জীবন যার যার তার তার। নিজের জীবনে কার কী করার ইচ্ছে, তা মানুষের নিজেরই জানা উচিত। যার এখনও নিজস্ব ইচ্ছে গড়ে ওঠেনি, তাকে আমি প্রাপ্তবয়স্ক বলি না। যে

এখনও নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী চলে না বা চলতে ভয় পায়, তাকে আমি সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষও মনে করি না।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কারও যদি ইচ্ছে করে কাউকে খুন করতে, তবে? কারও যদি ইচ্ছে করে কাউকে ধর্ষণ করতে, তবে? আমার ব্যক্তিগত মত, যে স্বেচ্ছাচার অন্যের ক্ষতি করে, সেই স্বেচ্ছাচারে আমি বিশ্বাসী নই। এখন ক্ষতিরও রকম ফের আছে। কেউ যদি বলে 'তুমি ওই ধর্মের নিন্দা করতে পারো না, কারণ তোমার নিন্দা আমার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে,' তবে?

কারো শরীরে আঘাত দেওয়ার অর্থ যদি অন্যের ক্ষতি করা হয়ে থাকে, তবে মনে আঘাত দেওয়ার অর্থ কেন অন্যের ক্ষতি করা হবে না! এ ক্ষেত্রে আমার মত হচ্ছে যে মানুষের মনে নানা রকম কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতা বাসা বেঁধে থাকে, এসব দূর করা উচিত। দূর করার দায়িত্ব সচেতন মানুষের। এখন আরেকটি প্রশ্ন উঠতে পারে, আমি কেন নিজেকে সচেতন মনে করছি, এবং একজন মৌলবাদীকে করছি না? করছি না, এর পেছনে কিন্তু আমার একশ যুক্তি আছে। মৌলবাদীও তার নিজের যুক্তি খাড়া করতে পারে। কিন্তু যে বিচারবুদ্ধি আমার আছে, যে মূল্যবোধ আমার গড়ে উঠেছে, তাতে আমি মৌলবাদীদের যুক্তিকে অবৈজ্ঞানিক এবং অযৌক্তিক বলে খণ্ডন করে নিজের মতে স্থির থাকতে পারি। আমি জ্ঞানত কারও শরীরে আঘাত করি না। কোনও সৎ মানুষের আর্থিক ক্ষতির কারণ হই না। আমার স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে আমি কোনও অনুতাপ করি না। আজ অবধি অনুতাপ করতে হয় নি। সমাজের অনেক টাবু আমি ভেঙেছি। লোকে বলেছে স্বেচ্ছাচার, আমি বলেছি স্বাধীনতা। আমার বিবেকের কাছে আমি পরিষ্কার। আমি যা করছি, আমার দৃষ্টিতে কোনও অন্যায় করছি না। নিজের কাছে সৎ থাকা, নিজের কাছে নিরপরাধ থাকার মূল্য অনেক।

যখন কিশোরী ছিলাম, পায়ে পায়ে নিষেধাজ্ঞা। ঘরবার হবি না। খেলাধুলা করবি না। সিনেমা থিয়েটারে যাবি না। ছাদে উঠবি না। গাছে চড়বি না। কোনও ছেলে ছোকরার দিকে তাকাবি না। কারও সঙ্গে প্রেম করবি না। আমি কিন্তু সবই করেছি। করেছি, কারণ আমার ইচ্ছে হয়েছে করতে। নিষেধ ছিল বলে যে ইচ্ছে হয়েছে তা নয়। বাবা তো আমাকে আরও অনেক কিছুই নিষেধ করতেন, যেমন পুকুরে নাববি না, আমি পুকুরে নাবিনি, কারণ আমি সাঁতার জানি না, আর এ কারণে আমার আশঙ্কা হত সাঁতার না জেনে পুকুরে নামলে আনন্দ তো হবেই না বরং অসাবধানে ডুবে মরতে পারি। বাবা বলতেন, ছাদের রেলিংএ চড়বি না। আমি চড়িনি। কারণ আমার মনে হতো রেলিং যেহেতু সরু ছিল, পা পিছলে নিচে পড়লেই সব্বনাশ। যে কোনও কাজ করতে গিয়ে অন্য কেউ কী বললো না বললো তা না দেখে বরং নিজে কী বলছি, নিজে কী যুক্তি দিচ্ছি সেটি দেখি। নিজের ইচ্ছের সামনে আমি অত্যন্ত সততা নিয়ে দাঁড়াই। মেয়েদের পক্ষে, যাদের ইচ্ছের দাম এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কখনও দেয় না, নিজের ইচ্ছেকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ নয়। কিন্তু আমি কোনও কারণ দেখিনি প্রতিষ্ঠিত না করার। নিজের কাছে নিজের ভীতু, হেরে যাওয়া, নত মস্তক, নতজানু রূপ আমার সইবে না আমি জানি।

আমার লড়াই সত্যের জন্য, সাম্যের জন্য, সুন্দরের জন্য। এই লড়াই করতে

গেলে স্বেচ্ছাচারী আমাকে হতেই হবে। না হয়ে এই লড়াই করা যায় না। ব্যক্তিগত জীবনেও মাথা উঁচু করে থাকতে চাইলে স্বেচ্ছাচারী হতে হবে। অন্যের ইচ্ছেয় যদি চলি, তবে তো আমি পরনির্ভর। অন্যের দেওয়া বুদ্ধিতে, চিন্তায় যদি চলি, তবে মানসিক ভাবে আমি নিশ্চয়ই পঙ্গু। অন্যের দেওয়া করুণায় আমার যদি জীবন যাপন করতে হয়, তবে আমি আর যাই হোক, স্বনির্ভর নই। স্বেচ্ছাচারের আনন্দ সেখানে নেই। মুক্ত চিন্তা নেই, মুক্তবুদ্ধি নেই, কেবলই যন্ত্রের মতো চালিত হবো। ভাবলে আমার শ্বাসকষ্ট হয়। এরকম দুঃসহ জীবন থাকার চেয়ে না থাকা ভালো।

পুরুষেরা চিরকালই স্বেচ্ছাচার করে আসছে। সমাজটা তাদেরই অধীনে। স্বেচ্ছাচার দরকার নারীর। নারীর ইচ্ছের ঘরে নারীকে যে তালা দিতে হয়, তালা দিয়ে এই সমাজে তথাকথিত ভালো মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে, বুদ্ধি-আছে মেয়ে, ভদ্র মেয়ে, নম্র মেয়ে সাজতে হয় — সেই তালার চাবি নারী এখন তার আঁচল থেকে বার করুক। তালা খুলে নিজের ইচ্ছেগুলোকে পাখির মতো উড়িয়ে দিক আকাশ জুড়ে। নারী স্বেচ্ছাচারী হোক সর্বত্র। না হলে তারা বুঝবে না স্বাধীনতা মানে কী। না হলে তারা দেখবে না জীবনের সৌন্দর্য।

স্বাধীনতা মানে কী, জানি আমি। স্বাধীনতার প্রয়োজন আমি অনুভব করি প্রতিটি মুহূর্তে। আমি একা থাকি, কী দোকা থাকি, কী হাজার মানুষের ভিড়ে থাকি, আমার স্বাধীনতা আমি কাউকে দান করি না বা কোথাও হারিয়ে ফেলি না। স্বাধীনতা এবং অধিকারের কথা লিখি আমি, যা লিখি তা বিশ্বাস করি। যা বিশ্বাস করি, তা যাপন করি। মানসিকভাবে আমি সবল, অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর, এবং নৈতিকভাবে স্বাধীন মানুষ। এটা পুরুষের সয় না। পুরুষেরা নারীর এত ক্ষমতা পছন্দ করে না। তারা নারীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে, পায়ের তলায় নিয়ে পিষতে চায়। পিষতে না দিলে নারী ভালো নয়। পিষতে না দিলে নারী মন্দ। পিষতে না দিলে নারী স্বেচ্ছাচারী। অনেকে মনে করে স্বেচ্ছাচারী মানে বুঝি যে কোনও পুরুষের সঙ্গে যখন তখন শুয়ে পড়া, যৌন সম্পর্ক করা। স্বেচ্ছাচার মানে একেবারেই তা নয়। পুরুষের সঙ্গে না শোয়াটাকে আমি স্বেচ্ছাচার বলে মনে করি। পুরুষের সঙ্গে নারী যেন শোয়, পুরুষ ডাকলেই নারী যেন যেখানেই থাকুক, দৌড়ে চলে যায় তার কাছে, সাধারণত এরকমই নিয়ম। নারী যদি তার ইচ্ছে না হলে না শোয়, সেই নারী নিশ্চয়ই তবে স্বেচ্ছাচারী। এই স্বেচ্ছাচারী নারীকে পুরুষেরা পছন্দ করবে কেন! পুরুষের সুখভোগের জন্য, পুরুষের দেহের মনের তৃপ্তির জন্য, তার বিকৃতি, তার বিলাস মেটাতে নিজেকে যে নারী বিলিয়ে না দেয়, তাকে শুধু স্বেচ্ছাচারী বলে নয়, বেশ্যা বলেও অপমান করার জন্য পুরুষ প্রস্তুত।

আমার যা ইচ্ছে হয় আমি তাই করি। কারও ধ্বংস ঘটিয়ে করি না কিছু। স্বেচ্ছাচারী বলে জীবনের অর্থ এবং মূল্য দুটোই আমি ভালো অনুধাবণ করতে পারি। স্বেচ্ছাচারী না হলে, অন্যের ইচ্ছের যূপকাষ্ঠে বলি হলে, আমার বোঝার সাধ্য ছিল না আমি কে, আমি কেন। মানুষ যদি নিজেকেই চিনতে না পারলো, চিনবে তবে কাকে! আজ যদি স্বেচ্ছাচারী না হতাম আমি, হয়তো এই লেখাটি, যে লেখাটি লিখছি, তার একটি বাক্যও আমি লিখতে পারতাম না।

বাঙালি নারীর সেকাল একাল

অধিকাংশ বাঙালি-হিন্দু, এমনকী যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করেছে, রাজনীতি অর্থনীতির জ্ঞানও যাদের বেশ প্রখর, মনে করে যে বাঙালি বলতে বাঙালি-হিন্দু বোঝায়। বাঙালি-মুসলমান, বাঙালি-খ্রিস্টান, বাঙালি-বৌদ্ধ, বাঙালি-নাস্তিকও যে 'বাঙালি' তা তারা জানে না। বাঙালি হিন্দুর এই অজ্ঞানতা দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। পূর্ববাংলা বা বাংলাদেশের বাঙালিদের 'বাংলাদেশি' বলে ডাকার চল এ দেশে খুব। বাংলাদেশি গরু, বাংলাদেশি আইন হতে পারে, কিন্তু মানুষ কী করে বাংলাদেশি হয়! বাঙালি জাতি তো একাত্তরে বাংলাদেশ নামের একটি দেশ জন্ম নেওয়ার সময় জন্ম নেয়নি। বাঙালি তার দীর্ঘশতাব্দীর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে বাঙালিই আছে, দেশের নাম শুধু রাজনৈতিক কারণে বারবার বদলে যাচ্ছে। সে বদলে যাওয়ার দায় জাতি নেবে কেন! যে ধর্মবাদীরা সমৃদ্ধ এবং সেকুলার বাঙালি-সংস্কৃতিকে বিনাশ করে ইসলামী-সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দেশের সর্বনাশ করতে চেয়েছিল, তারা সংবিধান বদলে ফেলেছে বাঙালি-জাতীয়তাবাদের জায়গায় বাংলাদেশি-জাতীয়তাবাদ ঢুকিয়ে। এই তারাই একই উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিদেয় করে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করেছে।

বাঙালি-মুসলমানের সংখ্যা বাঙালি-হিন্দুর চেয়ে বেশি, সুতরাং বাঙালি-মুসলমানের সংস্কৃতিই শেষ অবধি বাঙালি-সংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার বেশি সম্ভাবনা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাঙালি-মুসলমানের সংস্কৃতি অবাঙালি-মুসলমানের সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। এবং অনেক মিল থাকলেও বাঙালি-হিন্দুর সংস্কৃতির সঙ্গেও এর তফাৎ আছে। বাঙালি-মুসলমানের ভাষা ও সংস্কৃতি ঐতিহাসিক কারণে নানা বিদেশি ধর্ম-সংস্কৃতি ও ভাষার প্রভাবে সমৃদ্ধতর।

বাঙালি নারী হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইসলাম যে কোনও ধর্মে বিশ্বাসী হতে পারে, অবিশ্বাসীও হতে পারে। বাঙালি নারী কেমন আছে বাংলায়, কেমন তাদের দিন রাত্তির— এই প্রশ্নটি যখন নিজের কাছে করি আমি, বড় বেদনায় নুয়ে আসি। যে-সমাজে ধর্ম জাঁকিয়ে বসা, সে সমাজে কোনও নারী কি মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে? ধর্ম জাঁকিয়ে বসলে পুরুষতন্ত্র জাঁকিয়ে বসে। ধর্ম এবং পুরুষতন্ত্রের যেখানে জয়জয়কার, সেখানে নারীর পরিচয় দাসী বা যৌনবস্তু বা সন্তান-উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। বাঙালি নারী এই পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকে, বেঁচে ছিল। অনেকে

পরিবর্তনের কথা বলে। গ্রামগুলো মফস্বল হচ্ছে, মফস্বলগুলো শহর, শহরগুলো নগর। নগরে উঁচু উঁচু দালান। ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। যে বাঙালি-নারীর ঘরবার হওয়া, লেখাপড়া করা নিষিদ্ধ ছিল এই সেদিন, সে আজ ইস্কুল কলেজ পাশ করছে, বিশ্ববিদ্যালয় ডিঙোচ্ছে, চাকরি বাকরি করছে, অর্থ উপার্জন করছে। শহর নগরের শিক্ষিত এলোকায় বাস করলে মনে হয় পরিবর্তন বুঝি আকাশ-সমান। কিন্তু সুবিধে পাওয়া নারী ক'জন সংখ্যায়? আশি ভাগ নারী এখনও জানে না কী করে লিখতে পড়তে হয়। দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করা মানুষের অধিকাংশই নারী। নারীরা ভুগছে, কেবল ধর্ম ও পুরুষতন্ত্র তাদের চাবুক মারছে না, দারিদ্র্যও তাদের রক্তাক্ত করছে। কিন্তু যে নারীরা মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত? তারা কি সুখে আছে? না। আসলে নারীর কোনও শ্রেণী নেই, জাত নেই। যে শ্রেণীতেই তাদের বাস, যে বর্ণেই তারা চিহ্নিত, তারা নির্যাতিত। নির্যাতনের কায়দা ভিন্ন, ধরন একই।

যারা লেখাপড়া জানে, যারা শিক্ষিত, তারা কি নিজের অধিকার নিয়ে বেঁচে আছে? তারা কি আদৌ স্বাধীন? না। আসলে নারী শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক, নির্যাতিতই। নির্যাতিত, কারণ তারা নারী। নির্যাতিত, কারণ ধর্ম পুরুষতন্ত্র সংস্কৃতি সমাজ সবই নারীবিরোধী। শিক্ষিত মেয়েরা পুরুষতন্ত্রের নিয়মকানুন যত নির্ভুলভাবে শিখতে পারে, অশিক্ষিত মেয়েরা তত পারে না। শিক্ষিত মেয়েরাও স্বামীর আদেশ নির্দেশ মতো চলছে। স্বামী তাকে অনুমতি না দিলে সে চাকরি করতে পারছে না। আর, যে মেয়েরা চাকরি বা ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করছে, তারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করছে বটে, কিন্তু স্বনির্ভর হতে পারছে না। এখনও পচা পুরোনো সংস্কৃতি নারীকে পুরুষের অধীন করে রাখছে। এখনও নারীকে পরনির্ভর করে রাখার পুরুষতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র এক তুড়িতে হুররে।

সংস্কৃতি, সে যদি মানবতার বিপক্ষে যায়, সে যদি সমতার সামনে বেয়াদপের মতো দাঁড়ায়, তাকে উড়িয়ে না দিয়ে পুড়িয়ে না দিয়ে লালন করার কী অর্থ? সংস্কৃতি যদি বহমান নদী না হয়ে বদ্ধ জলাশয় হয়, ওতে সাঁতার আমরা কাটবো কেন? বাঙালি সংস্কৃতির সংস্কার না হওয়া-তক, একে বৈষম্যহীন না করা-তক এই সংস্কৃতি নিয়ে গৌরব করার কিছু নেই। বিশেষ করে নারীর তো নেইই।

সভ্য হতে গিয়ে দেশকে বাধ্য হতে হয়েছে নারীবিরোধী কিছু প্রথার বিলুপ্তি ঘটাতে। কিন্তু অধিকাংশ পুরুষ এবং নারীর মানসিকতা এখনও ভয়াবহরকম পুরুষতান্ত্রিক। নারীর অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হলে সমাজে নারী পুরুষের প্রচলিত প্রভু দাসীর ভূমিকা বদলের প্রয়োজন প্রচণ্ড। শিশুবয়স থেকে যেমন এই শিক্ষাটি নেওয়া জরুরি, যে, নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকারে কোনও তফাৎ নেই, একই সঙ্গে সমাজে নারী পুরুষের সমানাধিকারের চর্চাও দেখা জরুরি। পড়ে বা শুনে যত না মানুষ শেখে, দেখে তার চেয়ে বেশি শেখে।

নারীর অবস্থার উন্নতি যদি সত্যিকার হত, তবে এখনও কনে দেখা, এখনও পণ প্রথা টিকে থাকতো না। মেয়েশিশু হত্যা হত না, যেমন হচ্ছে। কেউ কেউ বলে

মেয়েরা নির্যাতিত যদি হয়েই থাকে, গ্রামে হচ্ছে, শহরে নয়। পশ্চিমবঙ্গে মেয়েভ্রুণহত্যা সবচেয়ে বেশি কিন্তু হচ্ছে কলকাতা শহরে। এই শহরে সবার নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে দাঁতাল হাসি হাসছে বীভৎস বেশ্যালয়। যেন পুরুষেরা প্রতিনিয়ত ওখানে ভিড় করতে পারে নারীকে কুৎসিতভাবে অপমান করার জন্য, নারীর মান সম্মান নিশ্চিহ্ন করার জন্য, নারীর অধিকারকে পায়ে পেষার জন্য। নারীপাচার, নারীহত্যা, ধর্ষণ, গণধর্ষণ কিছুই এখন আর অবাক করা ঘটনা নয়। এগুলো গ্রামের চেয়ে বেশি ঘটে শহরে।

বাঙালি নারীর যে ছবিটি মানুষের মনে গাঁথা, সেটি শাড়ি পরা। বয়স বেশি হলে আটপৌরে সাদা শাড়ি, আঁচলে চাবির গোছা, আর কম হলে কুচি কেটে রঙিন রঙিন শাড়ি। হিন্দু হলে কপালে টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর। না হলে যেমন আছে, তেমন। হাতে চুড়ি, কানে দুল। নাকে নথ অথবা নথ নয়। বাঙালি নারী কেমন চরিত্রের হবে, তা যুগে যুগে পুরুষেরা বলে দিয়ে গেছে। লজ্জাবতী, মায়াবতী, নম্র, নত। বাঙালি নারীকে কখনও স্বাধীনচেতা, স্বকীয়, স্বেচ্ছাচারী হিসেবে মানায় না। বাঙালি নারী দেহমন ঢেলে সংসারের কাজে উদয়াস্ত পরিশ্রম করবে। আবার মাঝে মাঝে বীণা বা তানপুরা বা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করবে। শীতলপাটিতে আধশোয়া হয়ে দুপুরবেলা কবিতা লিখবে, নয়ত ঘরসংসারের গপ্প করবে। দরজায় দাঁড়িয়ে অস্থির অপেক্ষা করবে, স্বামীর। বাড়ি ফিরলে নিজের রান্না করা খাবার আদর করে পাতে তুলে তুলে খাওয়াবে। হাতপাখায় হাওয়া করবে। নিজের খাওয়া সবার পিছে, সবার নিচে সবহারাদের মাঝে । ধম্মকম্ম করা, মুখ বুজে সবার সব অত্যাচার সওয়া, মমতায় হৃদয় উপচে রাখা, জগতের সবার মঙ্গল কামনা করা, অন্যের সেবায় নিজের জীবনটি বিসর্জন দেওয়া—এই না হলে বাঙালি নারী! বাঙালি নারী মানে সুচিত্রা সেন, শাবানা। যামিনী রায়, কামরুল হাসান।

এই চিত্র-চরিত্র তৈরি করা। এ ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে অনেক নারী। তারা যা খুশি তাই পরে, যা খুশি তাই করে। পোশাকে প্রচুর পশ্চিমী ঢং, ভাষা চৌকশ, গায়ে গতরে তরঙ্গ, বাঁধ না মানা, বাধা না মানা। তারা দেখতে নতুন। শুনতে নতুন। কিন্তু তাদের সঙ্গে অনেকদূর চললে দেখা যায় একটি সীমানায় এসে তারা পৌঁছোচ্ছে, সীমানার বাইরে এক পা-ও ফেলছে না। সংস্কারের একটি অদৃশ্য সুতো তারা শক্ত করে হাতে ধরে রাখে, সুতোয় টান পড়লে পিছু হটে। পিছু হটে, বিয়ে করে, স্বামী সেবা করে, সন্তান উৎপাদন করে, জীবন উৎসর্গ করে আর মুখ বুজে সব সয়। শুরুতে এদের আধুনিক বলে মনে হলেও আধুনিক নয়। শুরুতে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, কিন্তু যৌবনে এসে দাদি নানি ঠাকুরমা দিদিমার আদর্শ মেনে নিয়ে ওদের মতোই ওদের বৃত্তে আবর্তিত হতে শুরু করে। আধুনিকতার সত্যিকার অর্থ বুঝতে অসুবিধে হলে বুঝি এই হয়।

পুরুষাঙ্গ না থাকার অপরাধে জীবনভর যাদের নির্যাতিত হতে হয়, প্রাপ্য স্বাধীনতা আর অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়, দরিদ্র হয়ে, পরমুখাপেক্ষী হয়ে, আশ্রিতা হয়ে,

বোঝা হয়ে, বেঁচে থাকার দুর্বিষহ যন্ত্রণা সইতে বাধ্য হতে হয়, পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে যাদের কোনও নিরাপত্তা নেই, সেই নারীদের আবার জাত কী, সমাজ কী, দেশ কী! বাংলা নিয়ে বাঙালি নিয়ে পুরুষ না হয় গৌরব করতে পারে, নারীর গৌরবের কিছু নেই।

বাঙালি-নারীর ত্যাগের ওপর দাঁড়িয়ে বাঙালি-পুরুষ নিজের আখের গুছিয়ে নেয়। নারীর কিছু গোছানো হয় না। শূন্য জীবন শূন্যই পড়ে থাকে। যে স্বামী আর সংসারের জন্য জীবন বিলিয়ে দেওয়া, সেও কোনও সুখ দেয় না। কব্জিতে জুঁইফুলের মালা জড়িয়ে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে বাবুরা সন্ধেবেলায় বাইজিবাড়ি যেত। এখন ঘোড়ার গাড়ি নেই, বাইজিবাড়ি নেই। কিন্তু স্ত্রীকে অবজ্ঞা-অপমান, অন্য-নারীসঙ্গ, বহুগামিতা সবই বহাল তবিয়তে আছে। পুরুষ তার বহুগামিতা গায়ের জোরে, ধর্মের জোরে আজও খাটিয়ে যাচ্ছে। শাস্ত্রমতে যত ইচ্ছে তত বিয়ে করতে পারতো পুরুষ, করতোও। একাধিক বিয়ে এখন বাঙালি-হিন্দুর জন্য নিষিদ্ধ বটে, বাঙালি-মুসলমানের জন্য নয়, তারা এখনও চার বিয়ের আরাম ভোগ করছে, মানসিক শারীরিক অত্যাচারে মেয়েদের অতিষ্ঠ করছে। তবে যে ধর্মের যে জাতের পুরুষই হোক, বহুগামিতা তারা মনে করে যে তাদের জন্য বৈধ। আর নারীর জন্য? বেশ্যা হলেই বৈধ, নয়তো নয়। বাঙালি নারীর যৌনতা নিয়ে কথা বলা বারণ, স্বামী নপুংসক হলেও সে স্বামীকে ত্যাগ করা বারণ, সম্পত্তির দাবি করা বারণ, উচ্চাকাংক্ষী হওয়া বারণ, নিজের সুখ আর স্বাধীনতার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া বারণ। বারণের শেষ নেই। রাগ করা, রুখে ওঠা, ছিঁড়ে ফেলা, ভেঙে ফেলা, সবই বারণ।

বারণ সত্ত্বেও যারা ভাঙে, যারা দাবি জানায়, নিজের অধিকারের কথা জোর গলায় বলে, ছিনিয়ে নেয়, কেড়ে নেয়, পেছনে তাকায় না, লোকের থুথু ঘৃণাকে মোটেও পরোয়া করে না, বৈষম্যের প্রতিবাদ করে, অঘটন ঘটায়, তারা চিরাচরিত বাঙালি নারীর শ্বাসরুদ্ধকর জীবনের ছক থেকে বেরিয়ে আসা মেয়ে। তারা বাঙালি নারীর ওই ঘোমটা পরা সিঁদুর পরা পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়া চেহারাটি ছুড়ে দিয়ে নতুন চেহারা আনছে। তারা সংখ্যায় খুব কম। কিন্তু তারা যদি নারীর নিত্য নিষ্পেষণ থেকে নারীকে বাঁচায়, তাবৎ নারীকে সচেতন করে তোলে, নারী যেন ঘোমটা খুলে সিঁদুর মুছে বলে ওঠে, ‘পুরুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক থাকলেও আমাদের পরিচয় পুরুষের মা বোন কন্যা বা দিদিমা ঠাকুমা জেঠিমা কাকিমা নয়, আমরা পৃথক অস্তিত্ব, আমরা পুরুষের বা পুরুষ শাসিত সমাজের সম্পত্তি নই, আমরা মানুষ। আমরা মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচি, আমাদের স্বাধীনতার পথে ধর্ম, সংস্কৃতি, রীতি, আইন কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ালে সেই বাধা আমরা পায়ে মাড়িয়ে যাই’ — তবেই না পুরুষতন্ত্র-অংকিত নতমুখী-সেবাদাসী-বাঙালি-নারী মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠবে। বাঙালি নারীর নতুন সংজ্ঞা তৈরি হবে, প্রতিবাদী, বুদ্ধিমতী, সমতায় বিশ্বাসী, সবল, সচেতন, সাহসী, দৃঢ়, দুর্বিনীত । বাঙালি হয়ে তখন গৌরব হবে আমার।

আমার প্রেমিকেরা

প্রেম শব্দটি আমার শৈশব কৈশোরে নিষিদ্ধ একটি শব্দ ছিল। সবে প্রেম করার বয়সে পড়লাম, কিশোর যুবকরা আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকায়, আমারও ইচ্ছে করে ওদের দেখতে, তখন প্রেম নিষিদ্ধ। আর যা কিছুই করি, প্রেম যেন না করি। অথচ সিনেমা দেখছি, প্রেম। থিয়েটার দেখছি, প্রেম। গল্প উপন্যাস পড়ছি, প্রেম। গান শুনছি, প্রেম। সবখানে প্রেম কিন্তু জীবনে প্রেম চলবে না। যে যত প্রেমহীন জীবন কাটাবে, সে তত ভালো। এভাবে এই পরিবেশে বড় হয়েছি আমি। নিষিদ্ধ জিনিস বলেই বোধহয় আগ্রহ জাগতো প্রেমে। প্রেম করছি বলে বাবার মার খেতে হত অনেক। বাবা চাবুক দিয়ে পেটাতেন, ঘরবন্দি করতেন, ভাত বন্ধ করতেন, দিনরাত 'ছাত্রাণাম অধ্যয়নং তপঃ' বলা বাবা এমনকী আমার ইস্কুল কলেজও বন্ধ করে দিতেন।

কিশোরবয়সে দুএকটি ছেলেকে আমার বেশ লাগতো। দূর থেকে একটু দেখা, আর মাঝে মাঝে ভালোবাসি-চিরকুট জীবন ভরিয়ে রাখতো। প্রেম কী করে করতে হয় শিখেছি ছোটদার কাছ থেকে। ছোটদা আমার চেয়ে আট বছরের বড়। পাড়ার এক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতো। সেই মেয়েকে লেখা ছোটদার প্রেমের চিঠিগুলো আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। ছোটদা বাড়ির বাইরে বেরোলেই তার টিনের ট্রাঙ্ক খুলে চিঠি বার করতাম। টিনের ট্রাঙ্কে পুরোনো খবরের কাগজ পেতে ছোটদা তার নানান জিনিস রাখতো, চিঠিগুলো থাকতো সেই পুরোনো খবরের কাগজের তলায়। প্রতিদিনের চিঠি ওখানে জমা হয়ে থাকতো, ছোটদা সুযোগ সুবিধে পেলে মেয়ের জানালায় গিয়ে কেউ যেন না দেখে চিঠি চালান করতো। প্রেম পরে ছোটদা আরেকজনের সঙ্গে করেছে, ওকেও ওরকম চিঠি লিখতো। কত যে সে ভালোবাসে ডলি পালকে বা গীতা মিত্রকে, তার অসাধারণ বর্ণনা থাকতো চিঠিতে।ওসব চিঠি পড়েই প্রেম কী জিনিস, বুকের কাঁপন কী জিনিস, নির্ঘুম রাত কী জিনিস আমি জেনেছি। ওই সময়েই বড়দার তোশকের তলায় রাখা বড়দের পত্রিকা 'কামনা' পড়ে যৌনতায় আমার হাতে খড়ি।

ওই কিশোরবয়সেই আমার লেখালেখি শুরু হয়ে যায় পত্রিকায়। শিল্প সাহিত্য সিনেমা সবকিছুর মিশেল পত্রিকাগুলো খুব জনপ্রিয় ছিল তখন। তখন পত্রমিতালির রমরমা অবস্থা। আমি যেই না কিছু লিখি পত্রিকায়, অমনি পত্রমিতালির আমন্ত্রণ

জানিয়ে আমার ঠিকানায় দুশ চিঠি। সবই তাজা তাজা যুবকদের। অনেকে ছবি পাঠাতো। যাদের ছবি বা হাতের লেখা বা চিঠির ভাষা পছন্দ হত তাদের উত্তর লিখতাম, কেউ দুদিনেই বন্ধু হত, কেউ নিমেষে বড় ভাই হয়ে উঠত, রাজ্যির উপদেশ বর্ষণ করতো। দূরের দূরের শহরে অচেনা যুবকদের কাছে চিঠি লিখতে লিখতেই একদিন প্রেমের চিঠি লিখতে শুরু করি। এক কবির কাছে। তখন আমি নিজেই ছোট একটি কবিতা-পত্রিকার সম্পাদক এবং প্রকাশক। বয়স সতেরো। কবি যেহেতু প্রেম নিবেদন করেছে, আমাকেও সে প্রেমে সাড়া দিতে হবে, ব্যাপারটি এমন। মাথায় ছোটদার প্রেমের চিঠিগুলো আর সন্ধে হলেই শিস দিয়ে পাশের বাড়ির জানালায় ভেসে ওঠা মেয়ের দিকে তার তাকানো। কবিকে আমি তখনও দেখিনি, কবির বয়স কত, বাড়ি কোথায়, কী পড়ে কী করে কিছুই জানি না, আর কথাচ্ছলে 'জীবন' চাইলো সে, অমনি আমিও বলে বসলাম, 'এ আর এমন কী, নাও।'

কবির প্রেমে সাতসমুদ্র সাঁতার কাটা শেষ হলে কবির সঙ্গে দেখা হয়, প্রথম দেখা। চোখ তুলে তাকাতে পারিনি লজ্জায়। ভাববাচ্যে দুতিনটে বাক্য উচ্চারণ করে দৌড়ে বাড়ি ফিরেছি। পছন্দ হয়নি কবির দৈর্ঘ্য প্রস্থ। দাড়িগোঁফ। কিন্তু না হলেও মাথায় তো 'প্রেম' ব্যাপারটি, যার প্রতি তীব্র আমার আকর্ষণ। আমি তখন তন্বী সুন্দরী, আমি তখন কবিতা লিখি, মেডিক্যালের প্রথম বর্ষ। কবির কবিতা আমি ভালোবাসি। আর ভীষণভাবে ভালোবাসি প্রেম। ওই প্রেম আর কবিতার কাছে পরাজিত হয় কবির বাইরের রূপ। হলে কী হবে, লজ্জাবতী নারী তো চোখে চোখ রাখে না। পাঁচ বছর সময় লেগেছে প্রেমিককে তুমি বলে সম্বোধন করতে। শুয়েছি বিয়ে করারও কয়েক বছর পর। বিয়ে করেছি গোপনে, নোটারি পাবলিকের কাগজে। বাড়ির কেউ জানে না। বাবা জানলে খুন করবেন, এটা অনুমান করেছিলাম বলেই গোপন রেখেছিলাম বিয়ের খবর। আমি ডাক্তারি পড়ছি, আর আমার প্রেমিক এক উদাস বাউণ্ডুলে, পথে পথে ঘোরে আর আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। কবি আর আমি দুজন দু'শহরে। রাত জেগে জেগে কবির কাছে চিঠি লিখি। কবির চিঠি আসে প্রতিদিন, চিঠিগুলো বারবার পড়ি। চিঠি তো নয়, যেন কবিতা। হলুদ রঙের খামে সেসব চিঠি। খাম হাতে নিতেই বুকের ভেতর কী রকম যেন করতো। সেই 'কীরকম করা'টি ঠিক কী রকম, তা আজও আমি বুঝিয়ে বলতে পারি না। চিঠিগুলো না পড়ে অনেকক্ষণ হাতে রাখতাম, চিঠি থেকে কী যেন কী উঠে এসে আমাকে শীতল করতো। জল-পতনের শব্দ টের পেতাম। ঝেঁপে কোথাও বৃষ্টি নামতো! অপেক্ষার প্রহর একদিন ফুরোয়। একদিন আমি আমার স্বজন বন্ধুদের কাঁদিয়ে ভাসিয়ে কবির হাত ধরে বেরিয়ে যাই। ছোটদাও ঠিক এরকম করেছিল, গীতা মিত্রর জন্য বাড়িঘর সব ছেড়েছিল। সংসারে ছোটদা যা যা করেছে প্রেমে পড়ে, আমিও ঠিক তাই তাই। ছোটদার ওই টিনের ট্রাঙ্কে লুকোনো চিঠিগুলোর মধ্যেই এমন তীব্র প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত ছিল যে সে মহীরূহ হয়ে ছোটদাকে যেমন আঁকড়েছিল, একইরকম আমাকেও। কিন্তু আষ্টেপৃষ্টে আমাকে এমনই বেঁধেছিল ওই প্রেম যে আমি দেখতে পাইনি প্রেমিক আসলে ভালো আমাকে বাসে না, যেখানে সেখানে রমণী পেলেই রমণ

করে আর ক্রমাগতই আমাকে মিথ্যে বলে। তার কাছে প্রেমিকার এবং গণিকার শরীরে কোনও পার্থক্য নেই। সে শুধু প্রথামতো একটি স্ত্রী চায়, স্ত্রীর সেবা চায়, আর রাতে রাতে বিনে পয়সার নিশ্চিত সম্ভোগ চায়। প্রেমিকের শরীরে যৌন ব্যাধি, যে ব্যাধিতে আমাকে সংক্রামিত করতে সে সামান্যও দ্বিধা করে না। না, সে প্রেমিক ছিল না, ছিল শুধুই পুরুষ। যে কোনও পুরুষ। আমিই কেবল বধির বোকা বালিকা প্রেম প্রেম বলে উন্মাদ হয়েছিলাম।

প্রেম এরপর দুপুরের ঝিরঝিরে হাওয়ার মতো জীবনে পরশ বুলিয়ে যায়। পালকের মতো সামান্য ছোঁয়া। কেউ একদিন মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল, কেউ একদিন হাত ধরে হাঁটলো, কেউ একদিন শুধু কানে কানে একটি গান শুনিয়ে গেল। তারপর দীর্ঘ দীর্ঘ সময় জুড়ে উতল যৌবন জুড়ে একা থাকা। যে একা থাকা নিজের প্রতি আমার আত্মবিশ্বাস, আমার শ্রদ্ধা সহস্রগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাকে দৃঢ় করেছে আরও, দুর্বিনেয় করেছে। স্বনির্ভর একজন চিকিৎসক-লেখক একা বাস করছি। নারীর স্বাধীনতার জন্য আগুন আগুন লেখা লিখছি। দেশ উত্তাল। কিন্তু হৃদয়ের দুয়ার হঠাৎ হাট করে খুলে যায় কোনও ফাগুন হাওয়ায়। চোখের সামনে আশ্চর্য সুন্দর এক যুবক দেখি একদিন। যুবকের দীর্ঘাঙ্গ, যুবকের চুল চোখ নাক ঠোঁট চিবুক আমাকে টানে, ফিরে ফিরে দেখি যুবককে। একদিন তো এত অপলক তাকিয়ে ছিলাম, যে, লজ্জায় যুবক বারবার চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল। চোখে আমার মুগ্ধতা, আমার মুগ্ধতার একশ তীর গিয়ে তার গায়ে কি বিঁধছিল না! একদিন কমলার রসের সঙ্গে কয়েকফোঁটা ভদকা পান করে মাতাল হলাম। আর যেই না টলোমলো পা, যুবক তার হাত দিল বাড়িয়ে। সেই স্পর্শ আমাকে আরও বেশি মাতাল করলো, আমার প্রতি অঙ্গ তার প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদিল। সেই শুরু তীব্র তীক্ষ্ণ দুর্দমনীয় প্রেমের। সেই প্রথম কোনও বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক হল আমার। না, আমার কোনও উপায় ছিল না তাকে না ভালোবেসে। সারা শহর তাকে নিয়ে ঘুরছি। রাস্তায় হাত ধরে হাঁটছি। বন্ধুদের আড্ডায় আমি, সঙ্গে সে। বাড়িভর্তি স্বজন আত্মীয়, যুবককে নিয়ে আমি নিভৃত নির্জন ঘরে। হ্যাঁ, যুবকের সঙ্গে আমার প্রেম, তাকে নিয়ে আমি মগ্ন হব, মত্ত হব। কার কী বলার আছে! না, কারওর নেই। আমার স্বাধীনতাকে এত তীব্র করে উপভোগ আগে আর করিনি। আমার সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব, আমার অধিকারবোধ, আমার মনুষ্যত্ব, মানবতা, আমার প্রাণময়তার কাছে যুবক বড় ম্লান। যুবকের সঙ্গে প্রেম এবং নিশ্চিত পৃথকবাস আমাকে প্রশান্তি দিয়েছে প্রচুর। আমার জীবন যাপনে, আমার লেখায়, রেখায়, আমার নান্দনিক যা ইচ্ছে তাই-এ প্রেমিকের অবাধ প্রবেশ নেই, তার নাককানমাথা গলিয়ে দেবার নেই। কিন্তু যখন প্রেম জাগছে, আমি তাকে চুমু খাচ্ছি, পালঙ্কে শুইয়ে গায়ে তার প্রেমের পালক বুলোচ্ছি, স্রোতে নামিয়ে ভিজিয়ে ভাসিয়ে একাকার করছি, তুমুল তুফানে হারাচ্ছি। তাকে প্রেমিকে নির্মাণ করি আমার ত্যাগে নয়, বিসর্জনে নয়, প্রেমে। প্রেমিক আমাকে ছাড়া বাঁচবে না, এমন। জগতে তার আমি ছাড়া কেউ নেই, তখন এমন। আর সেসময়ই আমার লেখা, আমার নীতি আদর্শ, সমতার জন্য আমার লড়াইএর বিপরীতে জমা হচ্ছে লোক। শঠবাদ, পুরুষবাদ,

মৌলবাদ আমার ফাঁসি চেয়ে মিছিল করছে, আমার রক্ত নিতে ধেয়ে আসছে, সেদিন একদিন প্রাণ বাঁচাতে পালাচ্ছি আমি, রাতের চাদর মুড়ে দৌড়োচ্ছি। তখন প্রেমিককে খুঁজি, কোথায় সে? না সে নেই। নিরাপদ দূরত্বে সে তার বিবাহিত জীবন যাপন করছে। বিশ্বাস ধ্বসে পড়ে প্রবল ভূমিকম্পে ন-তলা দালানের মতো।

এরপর উত্তর ইওরোপের শীতার্ত নির্বাসন জীবন। একাকীত্বের সুঁই বিঁধছে আমার সর্বাঙ্গে। বছরের পর বছর উড়ে যাচ্ছে উদাসী হাওয়ায়। এক দেশ থেকে আরেক দেশ। খ্যাতির মধ্যে খাবি খাচ্ছি। কিন্তু হৃদয়ে খরা। শরীর শ্যাওলা পড়া। ওই শ্যাওলা পড়া শরীর এক নির্জন দুঃসহ রাতে পুরুষের স্পর্শে কাঁপলো ভীষণ। সামান্য ঘনিষ্ঠতায় আমার একত্রবাস শুরু। কিন্তু কদিনেই আমি বুঝি আমি পুরুষ চাই না, আমি প্রেম চাই। প্রেম পেতে পেতে বছর গড়ালো। ফরাসি এক যুবক, বয়সে বছর ছয়েকের ছোট। উতল প্রেমে দুজন ভাসলাম। তখন আমি প্যারিসবাসী, তখন আমি প্রেমের শহর, আমি তিরিশের শেষদিক। ফরাসি প্রেমিক তুলুজ শহর থেকে ছুটিছাটায় ছুটে ছুটে প্যারিস আসে। সেইন নদীর পাড়কে আমরা চুমু খেতে খেতে স্নিগ্ধ করি। বিমানে, গাড়িতে, বাসে, নৌকোয়, বারে রেস্তোরাঁয়, পথে ঘাটে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করে গভীর গহন চুমু খেয়ে যাচ্ছি। না কাউকে দেখাতে নয়। কেউ যে আছে আমাদের চারপাশে তা তো ভুলে যাই। আমরা তো জগত ভুলে ছিলাম। প্রেম এমনই। অন্ধ করে রাখে। বাঙালি পুরুষের কাছ থেকে প্রেমের যে পাঠ নিয়েছিলাম, তা ফরাসি প্রেমিক প্রমাণ করে দেয় যে, নির্ভুল নয়। সারা শরীর যে প্রেমে, যে শ্রদ্ধায় স্পর্শ করে প্রেমিক, দেখে মুগ্ধ হই। না, প্রেম যে এত সুন্দর, এত যে সমতার, এত গৌরবের, আগে জানিনি। তার চুম্বন, তার আলিঙ্গন, তার পূর্বরাগ আমাকে প্রেমের অন্য ভুবন চেনায়। যে ভুবনের ত্রিসীমানায় কোনও বাঙালি পুরুষ আমাকে নেয়নি আগে। যৌনতা যে একটি অসামান্য শিল্প, এর আগে আমি শিখিনি। আমার নির্জনতা চুরচুর করে ভেঙে ফরাসি প্রেমিক সত্যি আমাকে একটি আকাশ দিয়েছিল। আমাকে শিখিয়েছিল সত্যিকারের শরীরী-প্রেম। কিন্তু মুশকিল হল, প্রেমিক আমাকে চায়। তার একার করে চায়। চায় আমি তার সঙ্গে একত্রবাস করি। প্যাশনপূর্ণ প্রেম তার, প্রচণ্ড প্রেম। আমাকে না পেলে সে আত্মহত্যা করবে। তার জীবনের কোনও আর অর্থ রইল না। না, আমি বলে দিই, প্যারিস ছেড়ে কেবল তার সঙ্গে বাস করার জন্য তুলুজে যাবো না। তুমি বরং চলে এসো প্যারিস। অথবা এভাবেই হবে প্রেম পৃথকবাসে। প্রেমিক তা মানে না। মনে করে আমি তাকে তুচ্ছ করছি। অভিযোগ করে সে আমার টয়বয়, অন্য কিছু নয়। আকুল হয়ে কাঁদে। তুমি তো বিখ্যাত, তুমি কেন আমার মতো অখ্যাত কাউকে ভালোবাসবে! ভালোবাসা কি খ্যাত অখ্যাত দেখে হয়! কে শোনে আমার কথা! প্রেমিক কাঁদে ঠিকই, কিন্তু পরক্ষণেই দাঁতে দাঁত চেপে আমাকেই শুয়োরের বাচ্চা বলে। পুরুষের আদেশ না মানলে পুরুষ ছিঁড়ে কামড়ে খেতে পারে। প্রেমেও তত নয়, নিয়ন্ত্রণে যত সুখ পুরুষের। একদিকে তার ঈর্ষা, হীনম্মন্যতা আর অন্যদিকে আমার দৃঢ়তা আমাদের

সম্পর্ককে এক টানে বিচ্ছেদের পাড়ে দাঁড় করিয়ে দিল। প্রেমের জন্য জীবন উৎসর্গ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশাল একটি পৃথিবী আমার সামনে, কোনও ক্ষুদ্র গণ্ডিতে শখ করে বাঁধা পড়বো, না হয় না তা। আর প্রেম প্যাশন যৌনতার যাবতীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিল্প বাদ দিলে পুব-পশ্চিমের সব পুরুষই একটি মানসিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তারা বুঝি নারীর চেয়ে বেশি কিছু, বড় কিছু। এই মিথ্যের সঙ্গে আপোস করবো কেন আমি?

আবার কয়েক বছরের নৈঃশব্দ। পুরুষহীন জীবন। লেখায় পড়ায়, দর্শনে শিল্পে, বন্ধুত্বে, ভ্রমণে বুঁদ হয়ে থাকা। একসময় সুদূর ইওরোপের বাস থেকে মাঝে মধ্যেই এই বাংলায় আসা যাওয়া শুরু হয়। প্রিয় শহর, প্রিয় মানুষ। ভালোবাসায় ভরে থাকে মন। যেহেতু হৃদয়ের দুয়ার খোলাই থাকে, ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ে এক বাঙালি পুরুষ। এ প্রেম সেই কিশোরবয়সের প্রেমের মতো। না ছুঁয়ে, না শুয়ে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন আমি রিসার্চ করছি। মন কী আর বসে ওতে। বাংলা তখন হৃদয়, বাঙালি তখন স্বপ্ন। বয়সে কুড়ি বছর বড়, অথচ তাকে তুই তোকারি প্রেমিক করে ফেলি কদিনেই। প্রেম ইমেইলে, ফোনে। প্রতিদিন কেমব্রিজ কলকাতা, কলকাতা কেমব্রিজ। প্রতিদিন সুপ্রভাত, প্রতিদিন শুভরাত। প্রেম কবিতার শব্দে অক্ষরে। প্রেমের তোড়ে জীবন ভেসে যায়। আর যেদিন প্রেমিকের সঙ্গে মিলবো বলে ছুটে আসি, সারা শরীর কাঁপছে মিলন লাগি, প্রেমিক এসে চুমুর নামে ঠোঁট কামড়ালো, আদরের নামে বুক খামচালো। তারপর গালে চিমটি কেটে টা-টা বলে চলে গেল, ওটুকুই তার প্রেম। আমি হাঁ হয়ে রইলাম! ফরাসি প্রেমিক পালকের মতো স্পর্শ করতো শরীর, আর এ কেমন স্পর্শ করা! যে সমাজে যৌনসামগ্রী ছাড়া মেয়েদের অন্য কিছু ভাবা হয় না, সেখানে এমন হিংস্রতাই তো স্বাভাবিক। তারপরও প্রেম বাধ মানে না, আকুল হই প্রেমিকের জন্য। না, দিন রাতের পাগল করা প্রেমে সে নেই। সে সন্ধেয় বা বিকেলে একটুখানির তরে দেখতে আসে, শহরের সংস্কৃতিতে পরকীয়া প্রেমের এমনই নাকি নিয়ম। প্রেমকে আমি চিরকালই প্রেম বলে মানি বলে বড় বিস্মিত হই পর আপনের শহুরে সংজ্ঞায় আর ব্যাখ্যায়। সবচেয়ে স্তম্ভিত হই দেখে যে, এতকাল প্রেমের জলে আমাকে আকণ্ঠ ডুবিয়ে রেখে আমার প্রেমিক-পুরুষ অক্ষমাযোগ্য অপরাধ করতে এতটুকু দ্বিধা করেনি একটি সত্য লুকিয়ে, যে, সে উত্থানরহিত।

সে বন্ধু হয়ে রইল। কিন্তু চল্লিশ ছোঁয়া শরীরে তো মুহূর্মুহু বান ডাকছে। আমার কুড়ির, আমার তিরিশের শরীরেও বুঝি এত তীব্র তৃষ্ণা ছিল না। আবারও প্রেমের উতল হাওয়া আমাকে ভিজিয়ে ভাসিয়ে এক কবির মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। রক্ষণশীল শহরটির সংস্কার গুঁড়ো করে দিয়ে কবিকে নিয়ে যেমন ইচ্ছে উড়ি ঘুরি। কবি আমার সকাল দুপুর বিকেল। কবি আমার সন্ধে, আমার রাত। কবিকে প্রেম বুঝিয়ে বত্রিশ কলা শিখিয়ে যখন পরম প্রেমিক করে তুলেছি, দেখি কবির সারা শরীরে যৌনরোগের দাগ। জগত আমার লাটিমের মতো ঘোরে । হাতুড়ি পিটিয়ে আমাকে যেন কে ইস্পাত করতে চায়, পারে না। কবি আনন্দ আমাকে দেয় ঠিকই,

যন্ত্রণা দেয় ত্রিগুণ। সেই প্রথম-জীবনের মতো কাঁদি আমি। না, কবি প্রেম জানে না। আমার কষ্টের দিকে ফিরে তাকানোর হৃদয় তার নেই। আমি এমনই রক্তাক্ত তখন, যে, এক শীত শীত রাতে হাতে উষ্ণ হাত রাখে এক পুরুষ, আর নিমেষে নদী হয়ে উঠি। অন্ধকারে সে স্পর্শ আমাকে ভীষণ স্রোতার্ত করে। বুঝি, ভালোবাসি। অদ্ভুত এই পুরুষ অবোধ বালকের মতো আমাকে কামগন্ধহীন প্রেমে জড়িয়ে রাখতে চায়। কেন চায়, কী চায়, কিছু তার বুঝি না। আমি কেন ঘন কুয়াশায় হাঁটবো তার সঙ্গে, যখন মেঘ সরিয়ে রোদ্দুর আনবো বলে পণ করেছি!

পুরুষদের আমি অকাতরে দিয়েছি । সে প্রতারক হোক, প্রেমিক হোক, বুঝে বা না বুঝে অকৃত্রিম প্রেম দিয়েছি। যখন মাঝে মাঝেই রাতের হুহু হাওয়া আমার নির্জন জীবনকে খেলাচ্ছলে ছুঁয়ে যায়, বড় একা লাগে। লেখালেখির একটি জীবন আছে আমার, সে জীবনটিতে চূড়ান্ত ব্যস্ততা, লক্ষ মানুষের আনাগোনা। আরেকটি জীবন একান্তই ব্যক্তিগত। এই জীবন, জীবনের শুরু থেকে, আমি একরকম একাই যাপন করছি। হঠাৎ হঠাৎ হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো কেউ আসে, নিঃশব্দে চলেও যায়। হাতে গোনা ক'জন পুরুষকে আমি প্রেমিক নামে ডাকি, কিন্তু সম্বিৎ ফিরে পেলে এমন নয় যে স্বগোতক্তি করি না এই বলে, যে, আমার প্রেমিক হওয়ার যোগ্য আদৌ তারা নয়। প্রেমিকেরা অনেকে অনেক কারণে আমার সান্নিধ্য চেয়েছে। কেউ আমাকে ভালোবেসে আমাকে চায়নি। কেউ নামের জন্য, কেউ বিত্তের জন্য, কেউ যশখ্যাতির জন্য, কেউ শরীরের জন্য, কেউ হৃদয়ের জন্য। কেবল ভয়ংকর চাই চাই দেখেছি চারদিকে। আমার নিজের চাওয়া হেলায় ফেলায় তুলোর মতো উড়ে গেছে উদাস হাওয়ায়।

তারা ঠগ। প্রতারক। হিপোক্রেট। ভীতু। ভণ্ড। তারা প্রেমিক ছিল কি একজনও? আজ বেলায় এসে, দুখের দিনগুলোকেও যে সুখের দিন ভেবে সুখ পেতাম, টের পাই। হৃদয় নিংড়ে প্রেম দিয়েছি, যাদের দিয়েছি, বুঝি তারা পুরুষ ছিল সবাই, প্রেমিক ছিল না।

রেখে ঢেকে আর নয়, জাত যাক, সে তো দুবেলাই যায়
তবু এই সত্য মানি, আমি ছাড়া কেউ নেই আমাকে বাঁচায়

ভার্জিনিয়া উলফ লিখেছিলেন খুব জরুরি একটি বই, 'অ্যা রুম অফ ওয়ানস য়োন।' উনিশ'শ উনত্রিশ সালে। বাপের বাড়ি স্বামীর বাড়ি ভাইয়ের বাড়ি মামার বাড়ি ছেলের বাড়ি ইত্যাদি নানা রকম বাড়িতে মেয়েদের বাস। মেয়েদের নিজের বাড়ি নেই, অন্যের বাড়িতে তাদের বাস করতে হয়। মেয়েদের টাকা পয়সা নেই, নিজের রুচি মতো জীবনযাপন নেই, প্রাইভেসি নেই। একেবারে নিজের, একার, অন্য কারও বিরক্ত করা নেই, নাক গলানো নেই, এমন ঘরের প্রয়োজন মেয়েদের প্রচণ্ড, এ কথা ভার্জিনিয়া উলফ সেই কত আগে বলেছেন। আজ না হয় পশ্চিমে মেয়েরা একা বাস করার সুযোগ এবং পরিবেশ পাচ্ছে। মেয়েরা স্বনির্ভর এখন আগের চেয়েও অনেক, সংস্কারের ভূত অনেকটাই সমাজ থেকে সরেছে। কিন্তু পুবের হাল বড় করুণ। পুবের মেয়েদের এখনও পিতৃতন্ত্র, ধর্ম আর সাতশ' রকম সংস্কারের যাঁতাকলে পিষে মারা হচ্ছে। সমাজ-সংস্কারকরা মেয়েদের শিক্ষার এমনকী স্বনির্ভরতারও ব্যবস্থা করেছেন, তাই বলে কি অবস্থা কিছু পাল্টেছে! ক'জন মেয়ে আজ নিজের ঘরে বা নিজের বাড়িতে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে, একা এবং সম্পূর্ণই একা জীবন যাপন করছে! নিজের উপার্জনে নিজের বাড়ি, নিজের সংসার, নিজের উড়ে বেড়ানো ঘুরে বেড়ানো, নিজের যা ইচ্ছে তাই, নিজের স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার ক'জন মেয়ের আছে! কেউ কেউ যারা যাপন করতে যায় এমন জীবন, তাদের কিন্তু ঝাঁক ঝাঁক পুরুষ অহর্নিশি পরামর্শ এবং উপদেশ বর্ষণ করে চলে। সুতরাং একা থাকার আনন্দ শেষ পর্যন্ত মেয়েরা সত্যিকার উপভোগ করতে পারে না।

এক যুগেরও বেশি সময় আমি একা থাকছি। আমার একা থাকাটা কিন্তু ঘটনাক্রমে একা থাকা নয়। একা থাকার স্বপ্ন ছিল আমার। এই স্বপ্ন আমি সত্য করেছি। কম ঝড় যায়নি আমার ওপর। আমি একা থাকবো, আজ থেকে কোনও পুরুষের সঙ্গে আমি বাস করবো না, এই সিদ্ধান্তটি নেবার পর শহর ঘুরে বাড়ি খুঁজছি ভাড়া নেবার জন্য, বাড়ি কী আর মেলে ! সব বাড়িওয়ালাই আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়েছিল। তারা প্রথমে আঁতকে ওঠে আমাকে দেখে, 'একা মেয়েমানুষ' এসেছে বাড়ি ভাড়া নিতে! আমি ডাক্তার। শহরের বড় হাসপাতালে চাকরি করছি। ভাড়া

মেটানোর ক্ষমতা আমার আছে জানার পরও কোনও লোকই আমাকে বাড়ি ভাড়া দিতে চায়নি। কারণ আমার সঙ্গে কোনও পুরুষ-অভিভাবক নেই। বাবা নেই, দাদা নেই, স্বামী নেই। আরও অনেক ঘুরে, আরও অনেক পরিশ্রমের পর আমি একটি বাড়ি পেয়েছিলাম। বাড়িওয়ালার হাতে পায়ে ধরতে হয়েছে পুরুষ ছাড়া আমাকে থাকতে দেবার জন্য। বাড়িওয়ালা শেষ অবধি নিমরাজি মতো হল, বললো, ঠিক আছে পুরুষ না থাকলেও চলবে, কিন্তু একা থাকা আমার চলবে না, কাউকে না কাউকে সঙ্গে থাকতেই হবে। থাকতেই হবে, কারণ আমি 'মেয়েমানুষ'। মেয়েমানুষ হল শরীর। লোভের শরীর। শরীর ছাড়া তারা আর কিছু নয়। এই শরীরের দিকে লোভ করবে পুরুষেরা। পুরুষ-পাহারা না থাকলে মেয়েমানুষের কুমারীত্ব ঘুচে যাবে, সতীত্বের বারোটা বাজবে। ঘিনঘিনে মাছি এসে বসবে উঠোনে পড়ে থাকা আধখাওয়া আনারসের গায়ে। সংসারে কে চায় একলা মেয়েমানুষ! ভয় লজ্জা দুটোই কিলবিলিয়ে ওঠে মেয়েমানুষের নাম শুনলে। মেয়েদের একা থাকতে নেই। 'ভদ্রমেয়েরা' থাকে না একা। 'অভদ্ররা' থাকে, বেশ্যারা একা থাকে। আমি নামি হাসপাতালের ব্যস্ত ডাক্তার। কিন্তু একা থাকি বলে পাড়ার লোকেরা আমার দিকে বেশ্যার দিকে যেমন ছোট চোখে তাকিয়ে শয়তানি-হাসি হাসে, তেমন হাসে।

মাকে নিয়ে এসেছিলাম আমার বাড়িতে। একটি মেয়েমানুষ যা, দুটো মেয়েমানুষও তা। সে বাড়িতে খুব বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি আমার। পাড়াপড়শির নাক সিঁটকানিতে বাড়িওয়ালা আমাকে একদিন তাড়ালো। একা মেয়েকে কেউ আশ্রয় দেয় না, প্রাণের বন্ধুও তখন দূরে সরে থাকে। মাসের পর মাস আমাকে হোটেলে বাস করতে হয়েছে, 'একা থাকবো' এই দৃঢ়তা ছিল বলেই পেরেছি। তখন দুর্গম কোনও অরণ্য ঘুরঘুট্টি কালো রাতেও পার হয়ে যেতে পারি এমন। বরফ-জলের সমুদ্র সাঁতরে পার হই এমন। সমাজের অসভ্য নিয়মগুলো আমাকে বারবার ভেঙে চৌচির করতে চেয়েছে, আমাকে মুচড়ে দুমড়ে, নিংড়ে নিঃস্ব করতে চেয়েছে। তারপরও আমি নিজেকে অনড় রেখেছি, ভয়ংকর এই নারী বিদ্বেষী সমাজে তাবৎ পুরুষকে অস্বীকার করে একটি মেয়ের একা থাকা যে কী ঝুঁকিপূর্ণ তা আমি নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছি। ওভাবে আরও ভুগে, আরও কিল চড় খেয়ে, নিজের জন্য 'ভদ্রপাড়ায়' একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আর কোনও ঝঞ্ঝাট, বিদ্রূপ, আর কোনও তামাশার শিকার আমাকে হতে হবে না ভেবেছিলাম। কিন্তু নিজের কেনা বাড়িতেও সমস্যা শুরু হল। শুরু হল যখন আমি প্রেম করতে শুরু করেছি এক যুবকের সঙ্গে। কে এই যুবক, কী সম্পর্ক? আমার উত্তর, ও আমার প্রেমিক। প্রেমিক শব্দটি যেন শব্দ নয়, বোমা। প্রেমিক নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, মাঝে মাঝে প্রেমিক আমার বাড়িতে রাত কাটাচ্ছে, এটি কারও সহ্য হত না। আসলে আমি একা থাকতাম বলেই পাড়াপড়শির চোখ আমার ওপর একটু বেশি পরিমাণে ছিল। না, আমি কারও শ্লেষে, স্লোগানে, কারও আদেশে বিক্ষোভে হাঁটু ভাঙিনি। নিজের যা ভালো লাগে, তা দ্বিধাহীন করে গেছি। মেরুদণ্ড সোজা। টানটান। মাথা উঁচু। কারও আমি খাই না পড়ি না, আমি যা-ই করি, যার সঙ্গেই শুই, তাতে কার বাপের কী!

খুব বেশি পুরুষ না দেখলেও যথেষ্ট দেখেছি। একটিই কি যথেষ্ট নয়! একটি যথেষ্ট নয় বলে শখ করে দুটি দেখতে গিয়েছিলাম। দেখি জিনিস একই। হাতে গোনা ক'টা দিন প্রেম প্রেম। দুজনে দুজনার। তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না, না পেলে আত্মহত্যা ইত্যাদি। পরে যে কে সেই। বাপ ঠাকুরদা বেরিয়ে আসে মুখোশ ছিঁড়ে, ফেটে স্বরূপ বেরোয়। একসঙ্গে বাস করার আগে নারী পুরুষের সমানাধিকারে দুহাজার ভাগ বিশ্বাস, নারীর স্বাধীনতায় উনি বিশ্বের এক নম্বর সমর্থক, আর যেই না একত্রবাস শুরু, অমনি উনি শুয়ে বসে আরাম করবেন আর অর্ডার করবেন, বাঘের দুধ চাই, জিরাফের মাথা চাই। সব জোগাতে হবে, কারণ পুরুষ উনি, দুউরুর মাঝখানে তিন বা চারইঞ্চি একটি বস্তু আছে ওনার। ওনার নিজের জন্য ওনার অনেক 'চাওয়া', তার চেয়ে বেশি আমার জন্য ওনার 'না চাওয়া'। উনি চাননা উনি ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে একটি বাঁধা সময়ের বেশি কথা বলি, ওনার অনুমতি ছাড়া আমি কোথাও যাই বা কিছু করি। আমাকে ওনার মুঠোর মধ্যে যে করেই হোক নিয়ে চমৎকার একটি জীবন উনি যাপন করতে চান। ওনার স্যাঁতসেঁতে মুঠোর মধ্যে পড়ে যে আমার শ্বাসকষ্ট হয়, তা উনি ঠিক ধরতে পারেন না, পারেন না ওনার ওই তিন বা চারইঞ্চি বস্তুর কারণে। ওই ক্ষুদ্র বস্তুটি মানুষের বোধবুদ্ধি ভয়ংকরভাবে ভোঁতা করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট কিনা।

যতদিন মস্তিষ্ক কাজ করে, ততদিন আমি একা থাকবো। বদ্ধ উন্মাদ না হলে পুরুষের সঙ্গে কোনও মেয়ে বাস করে! জেনে শুনে পুরুষের পুতুল সাজতে কারও কারও সাধ জাগে, জন্ম থেকে তাদের গড়েই তোলা হয়েছে অমন করে। আমাকেও গড়া হয়েছিল অমন করেই। কিন্তু এক সময় আমি ঘুরে দাঁড়িয়েছি। না আমি পুতুল হব না, পণ্য হব না। তাহলে হব কী? মানুষ হব। আমি 'আমি' হব। এই সংকল্পটি আমার সর্বত্র, সর্বাঙ্গে। পুরুষকে আমার বাড়িতে বাস করতে দিই না বলে আমি যে পুরুষের সঙ্গে প্রেম করতে চাই না তা নয়। প্রেম ছাড়া আমি দুদণ্ড বাঁচি না। যেহেতু অসমকামী আমি, সুদর্শন পুরুষের প্রতি তীব্র আকর্ষণ আমি রোধ করতে পারি না। সুদর্শন যদি বিদ্যায় বুদ্ধিতে হৃদয়ে প্রতিভায় কৌতুকে কৌতূহলে অসাধারণ হয়, তবে তো প্রেমে না পড়ে আমার উপায় নেই। আমার প্রেম দিন রাতের প্রেম। এখানকার পুরুষেরা যেমন প্রেম বলতে এক দুঘন্টার প্রেম বোঝে, সুযোগ সুবিধে বুঝে বউকে লুকিয়ে বাড়ির বাইরে কোনও মেয়ের ঠোঁট কামড়ে, বুক খামচে, 'মেয়ের ওপর ফেলে আসা'কে প্রেম বোঝে, আমি তা বুঝি না। প্রেম বলতে প্রচণ্ড প্যাশন বুঝি। প্রেমিককে চাই সবচেয়ে বড় বন্ধু হিসেবে, যাকে জীবনের সব কষ্ট সুখ, দিন রাতের সবকিছু অবলীলায় বলা যায়। যে মিথ্যুক নয়, ঠগ নয়, প্রবঞ্চক নয়, লুম্পেন নয়। যার জন্য তৃষ্ণা কখনও মেটে না, যাকে পেলে জগত ভুলে যাই আবার যাকে নিয়েই জগত খুঁজে পাই। যে সঙ্গে থাকে, পাশে থাকে। যার সঙ্গে মুহূর্মুহূ সাত-আকাশে শীর্ষানন্দে উড়ে বেড়াই।

পাশে থাকা মানে কিন্তু এই নয় যে তার সঙ্গে প্রতিরাতে আমার বিছানা ভাগ করতে হবে বা তার সঙ্গে এক ছাদের তলায় থাকতে হবে। হৃদয়ে যে থাকে, সে

যোজন দূরে থাকলেও হৃদয়ে থাকে। তার সঙ্গে যখন আমার ইচ্ছে হবে, শরীর বিনিময় করবো। আমার বাড়িতে, অথবা তার, অথবা অন্য কোথাও। কিন্তু রাত্তির বারোটার মধ্যেই আমার বাড়ি থেকে তাকে বেরোতে হবে। তাকে অসম্মান করে বের করে দিচ্ছি না। ভালোবেসে চুমু খেতে খেতেই তাকে দরজা দেখিয়ে দিচ্ছি। কখনও রাতও কাটাতে পারে একসঙ্গে তবে আমার বাড়ির অতিথি হয়ে, সদস্য হয়ে নয়। এ আমার সিদ্ধান্ত, প্রেমিকের সঙ্গে ততদিন আমি একত্রবাস করবো না যতদিন না প্রেমিকের মাথা থেকে পুরুষতন্ত্রের শেষ কণাটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়। বিয়েতে আমি বিশ্বাস করি না। লিভ টুগেদার বা একত্রবাসে বিশ্বাস অনেককাল করেছি, এখন তাও করি না। কারণ একত্রবাসে পুরুষের স্বরূপ অল্প কিছুদিনেই এমন বিকট আকারে বেরিয়ে আসে যে পুরুষটি নিজেকে স্বামী ভাবতে শুরু করে, এবং স্বামীরা যে ধরনের শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার মেয়েদের করে, ঠিক তাই তাই করতে শুরু করে দেয়। এই ঘোর পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একত্রবাসের বদলে আমি তাই গভীরভাবে পৃথকবাসে বিশ্বাসী। পশ্চিমের পুরুষের বেলায়ও আমার আদর্শ একই। পুব পশ্চিমের পুরুষের চেহারা শুরুতে একটু হেরফের থাকতে পারে, কিন্তু পুরুষ মূলত একই। ভেতরের মশলাটা এক।

একা থাকার আনন্দ আমি জানি। একা থাকলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে, নিজের ওপর শ্রদ্ধা বাড়ে। একা থাকলে মনের জোর বাড়ে, নিজে কী এবং কে, সে সম্পর্কে ধারণা গাঢ় হয়। একা থাকলে অন্যকে তুষ্ট তৃপ্ত করে তোলার দাস-দায়িত্ব থাকে না ঘাড়ে। স্বাধীনতার সত্যিকার অর্থ অনুধাবন করা যায়। একা থাকলে জীবনকে আদ্যোপান্ত উপভোগ করা যায়। জীবন তো মানুষের একটিই এবং সব কিছুর পর, সব কোলাহলের শেষে মানুষ তো আসলে একাই।

আমি জাত গোত্র সম্প্রদায় ইত্যাদিতে বিশ্বাস করি না। যারা মানুষকে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে, তারাই তো সাম্প্রদায়িক। লিঙ্গ-ধর্ম-গোত্র-বর্ণ-জাত-সম্প্রদায় নির্বিশেষে আমি মানুষকে মানুষ বলে বিচার করি।

অসভ্যতা

কদিন পর পর আজগুবি আর উদ্ভট সব কাণ্ড ঘটায় মুসলমান উগ্রপন্থীরা । সকলে হাঁ হয়ে দেখে এসব। বোমা মেরে এটা সেটা উড়িয়ে দেওয়া, ত্রাস সৃষ্টি করা — এসব তো আছেই, এসব হয়তো যে কোনও সন্ত্রাসী দলই করে বা করতে পারে, ধর্ম তাদের যা-ই হোক না কেন। কিন্তু কদিন পর পরই মেয়েদের নিয়ে 'ছেলেখেলা' খেলে পুরো ভারতবাসীকে চমকে দেওয়ার কাজ ওরাই করছে। দেখে মনে হয় একরকম দায়িত্বই ওরা নিয়েছে এ-কাজের। আমি বলতে চাইছি না অমুসলমান মেয়েদের নিয়ে 'ছেলেখেলা' হয় না, বলছি না যে তারা অফুরন্ত স্বাধীনতা ভোগ করছে। মোটেও তা নয়। ভারতবর্ষের মেয়েরা সর্বত্রই কম বেশি দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি। তবে অমুসলমান মেয়েদের ওপর যে অসভ্যতা চলে, সেসব অসভ্যতার একটা সীমা আছে। কিন্তু মুসলমান মেয়ের ওপর অসভ্যতা প্রায়ই সীমা ছাড়িয়ে যায়। মেয়েরা যে কেবলই পুরুষের যৌনইচ্ছে মেটাবার খেলনা, কেবলই যে পুরুষের সুখভোগের বস্তু, কেবলই যে পুরুষের দাসী বা ক্রীতদাসী — তা এত তীব্র করে অন্য কেউ বোঝায় না, যত বোঝায় মুসলমান পুরুষেরা। শ্বশুর ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণ পুরুষমাত্রই হয় মনে মনে নয় শরীরে শরীরে করে — পুরুষাঙ্গে তাদের মুসলমানি বা খৎনা নামের ঘটনা ঘটুক বা না ঘটুক। কিন্তু তাই বলে ধর্ষককে স্বামী বলে মানতে হবে! এরকম ফতোয়া জগতের সেরা অসভ্যরাও কোনওকালে দিয়েছে বলে শুনিনি। মুসলমান-মৌলবাদীদের অসভ্যতার অবশ্য দেশকালপাত্র ভেদ নেই। ধর্ষক-শ্বশুর স্বামী বনে যাবে, নিজের স্বামী বনে যাবে নিজের ছেলে — এসব কি লোক হাসানো ছাড়া আর কিছু? যদি ঠাকুরদা ধর্ষক হয় তিন বছরের শিশুর? তবে কি শিশুটিকে হতে হবে ঠাকুরদার স্ত্রী? শিশুটির বাবা হবে শিশুটির ছেলে? শিশুটির মাকে হতে হবে শিশুটির পুত্রবধূ? এই তো মনে হচ্ছে ওদের বিচার!

এসব শুনলে গা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। গুড়িয়াকে নিয়েও 'ছেলেখেলা'

চলেছিল। 'এই স্বামীর সঙ্গে বাস করা চলবে না, ওই স্বামীর সঙ্গে বাস কর।' গুড়িয়ার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনও মূল্য কেউ দেয়নি। তা দেবে কেন! মেয়েরা তো মাংসপিণ্ড ছাড়া কিছু নয়, মেয়েদের তো 'মস্তিস্ক নেই, মগজ নেই, মাথা নেই'। তাদের আবার ইচ্ছে কী, অনিচ্ছে কী! ইমরানার বেলাতেও তাই। ইমরানার ইচ্ছে অনিচ্ছের ধার ধারার জন্য কেউ বসে নেই কোথাও। তাকে ধর্ষক-শ্বশুরের অবাধ কামের, পঞ্চায়েতের অশ্লীল অন্যায়ের আর মুসলিম ল বোর্ডের অবিশ্বাস্য অসভ্যতার শিকার হতে হয়। ধর্মতন্ত্রে এবং পুরুষতন্ত্রে বুঁদ হয়ে তাকে নিয়ে 'ছেলেখেলা' খেলেই চলেছে মানুষ। 'ছেলেখেলা' না বলে একে এখন 'পুরুষখেলা'ই বলা ভালো। ছেলেখেলা এত ভয়ঙ্কর হয় না, যত ভয়ঙ্কর হয় 'পুরুষখেলা'। 'ছেলেখেলা'য় উদ্দেশ্য এত কুৎসিত থাকে না, যত কুৎসিত থাকে পুরুষখেলায়। পুরুষ যখন খেলে, নারীকে চিরকালই পায়ের তলায় পিষে মারতে পারার ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য খেলে। 'আজ খেলে জিতে গেলাম, হিপ হিপ হুররে' — অমন 'ছেলেখেলা' হয়তো তারা ছেলেবয়সে খেলতো, পুরুষবয়সে আর খেলে না। পুরুষবয়সে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' করে। চিরকালই খেলতে পারার বন্দোবস্ত। নিজেদের চিরস্থায়ী আরামের আমোদের আয়েশের বন্দোবস্ত। পুরুষের হাতের মুঠোয় ধর্ম, হাতের মুঠোয় সমাজ, হাতের মুঠোয় রাজনীতি অর্থনীতি। এগুলো যেন সহজে পুরুষের মুঠোবন্দি হয়, তার জন্য নারী কম ত্যাগ, কম তিতিক্ষা এ যাবৎ করেনি। নারী যদি নিজেকে নিঃস্ব ক'রে পুরুষকে শক্তিমান, শৌর্যবান না করে, তবে সে আর নারী কিসে! এই বিশ্বাসে ভর করে পুরুষের সংজ্ঞা মেনে চমৎকার আদর্শ নারী হয়ে উঠেছে নারীকুল। এই নিঃস্ব রিক্ত নারীকে কথায় কথায় পুরুষেরা গুঁতো দিলে, লাথি দিলে, চেপে মারলে, টিপে মারলে, মুচড়ে মারলে, পুড়িয়ে মারলে, পুঁতে মারলে, ডুবিয়ে মারলে, কুপিয়ে মারলে কার কী বলার আছে? কিচ্ছু বলার নেই কারওর।

'ইমরানা তো আমাদের নয়, তাদের।' সুতরাং 'তারা' যা ইচ্ছে করে, তাই করবে ইমরানাকে। এমন কথা অমুসলমানদের অনেকেই উঠতে বসতে বলছে। প্রশ্ন হল, এই তারাটা কারা? তারাটা নাকি মুসলমানরা। এর মানে হচ্ছে ইমরানা মুসলমানদের, সুতরাং মুসলমানি বিধিব্যবস্থার শিকার তাকে হতেই হবে। মুসলমান না হয়ে সে হিন্দু বা খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ বা জৈন বা ইহুদি বা নাস্তিক হলে তাকে শিকার হতে হত না। ভারতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বরাদ্দ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মভিত্তিক আইন। এসব আইনের সংস্কার হয়েছে আজ অনেককাল। যেমন, হিন্দু পুরুষের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, হিন্দু নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে আর বঞ্চিত নয়। কিন্তু মুসলমানদের মাথার ওপর সপ্তম শতাব্দীর আইন, যেমন ছিল তেমনই আছে, সংস্কারের কিছুই হয়নি এতকাল, আর ভারতবর্ষের সব মুসলমানকে মাথা পেতে বরণ করতে হচ্ছে এই পচা পুরোনো আইন, এই আইন তারা পছন্দ করুক বা না করুক। প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোয় কিন্তু শরিয়তি আইনের প্রচুর সংস্কার হয়েছে, ওখানে পুরুষেরা 'তালাক তালাক

তালাক' উচ্চারণ করলেই তালাক হয় না, ওখানে পুরুষের একসঙ্গে চার স্ত্রী রাখার খায়েশ হলেই তা পূরণ হয় না। ইসলামি রাষ্ট্রেও শরিয়তি আইনের সংস্কার হচ্ছে। সংস্কারের বালাই নেই কেবল ভারতেই। আজ ইমরানাকে ইসলামি আইনের কবল থেকে বাঁচতে দেওয়ানি বা ফৌজদারি আইনের আশ্রয় নিতে হয়। ইসলামি আইনে বা শরিয়তি আইনে ধর্ষক শ্বশুরের শাস্তি নেই। শাস্তি তো নেই-ই, বরং উপঢৌকনের ব্যবস্থা আছে। ধর্ষিতাকে উপঢৌকন হিসেবে ধর্ষকের লিঙ্গে নিবেদন করা হয়। ধর্ষক যেন দিবানিশি নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় ধর্ষণ করে যেতে পারে ধর্ষিতাকে। ভারতীয় আইনে ইমরানারা বিচার পায় ঠিকই, কিন্তু ধর্মীয় আইনেই আবার অবিচার জোটে। এক আইনে মেয়েদের বাঁচানো হয়, আরেক আইনে মারা হয়। কিন্তু, সভ্য আইনের পাশাপাশি অসভ্য আইন বহাল রাখার যুক্তি কী? সমতার পেছনে অসাম্যকে লেলিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য কী? পরস্পরবিরোধী দুটো আইনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য দোলনা দুলিয়ে কারও কি আদৌ কোনও লাভ হচ্ছে? লাভ হয়তো কিছু বদ পুরুষের হচ্ছে, মেয়েদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে মজা করে মজা দেখার লাভ। কিন্তু ক্ষতি তো হচ্ছে তাবৎ মেয়েদের! অর্ধেক জনসংখ্যার। অযুত সম্ভাবনার। তার চেয়ে একটি আইনই থাকুক, যে আইনে অপরাধীর শাস্তি হয় আর নিরপরাধী মুক্তি পায়! না, এটিতে অনেকের আপত্তি। আপত্তি কিছু জঙ্গি সন্ত্রাসী মুসলমানের আর লোকনীতির (পলিটিক্সের) লোকের। 'মুসলমানরা যেহেতু চাইছে শরিয়তি আইন — তা তাদের দিতে হবে।' কেন চাইছে, কী শিক্ষা থেকে চাইছে, কী বিদ্যা থেকে চাইছে, এই আইন কারও কোনও ক্ষতি করছে কী না তা খতিয়ে দেখার কেউ নেই। এই আইন কি শিক্ষিত বিবেকবান মুসলমানরা চাইছে? এই আইন কি মুসলমানরা চাইতো যদি তারা বিজ্ঞান-শিক্ষায় সত্যিকার শিক্ষিত হত? 'মুসলিম পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন' মানুষের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করছে কি না, নারীর সমানাধিকারকে মানছে কী না, গণতন্ত্রের সব শর্ত পূরণ করছে কি না— তা দেখছেটা কে শুনি? কে দেখছে যে ধর্মীয় আইনের প্রথম এবং প্রধান এবং একমাত্র ভিকটিম হচ্ছে মেয়েরা। মেয়েরা এবং মেয়েরাই।

'তারা আলাদা আমরা আলাদা।' 'মুসলমানরা যদি নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়তে চায়, তাতে আমাদের কী! আমরা বাঁচলেই তো হলো।' এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন বাক্য বুদ্ধিজীবীরাও উচ্চারণ করেন। তবে মুসলমানরা না বাঁচলে তাঁরাও যে বাঁচবেন না, এ কথা বারবারই তাঁরা ভুলে যান। বাঁচতে হলে একসঙ্গেই সবাইকে বাঁচতে হয়। মুসলমানরা শক্ত শক্ত কোদাল শাবল নিয়ে নিজেদের কবর সত্যি সত্যি খুঁড়ছে। যারা খুঁড়ছে তাদের খুব কম সংখ্যক জানে যে তারা খুঁড়ছে। বোধবুদ্ধিহীন বাকিরা জানে যে এ তাদের বেহেস্তে যাবার সুড়ঙ্গপথ। সবচেয়ে আফশোসের ব্যাপার এই, যে, এই বেঁচে যাওয়া আমরা জানি না যে ওটা আমাদেরও সুড়ঙ্গপথ, তবে বেহেস্তে যাবার নয়, নরকে যাবার। কোদাল শাবল নিয়ে আজ নিজেদের কবর যারা খুঁড়ছে, তারা কিন্তু সবসময় নিজেদের কবরই খুঁড়বে না, অন্যদের কবরও খুঁড়বে। কবরে পা পিছলে পড়বে যাদের

জন্য কবর নয়, যারা সেইফসাইডে, তারাও। মাটি তো এক। না কি? আসলে এক দেশের, এক রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে আলাদা আলাদা কানুন চালু করলে মানুষ চিরকাল আলাদাই থেকে যায়। সেগ্রেগেটেড। বিচ্ছিন্ন। তারা কিছুতেই একাত্ম হতে পারে না। সৌহার্দের বন্ধন সৃষ্টি হয় না। যতদিন না আমাদের আর তাদের একত্রবাস হচ্ছে, ততদিন তাদেরকে অচেনা গ্রহের অচেনা জীব বলেই আমাদের মনে হবে। না হওয়ার কোনও কারণ নেই। মূল জনস্রোত থেকে পিছিয়ে পড়া কোনও সংখ্যালঘুর জন্য মুক্তচিন্তায় পারদর্শি হওয়া দুঃসহ। আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগতে তারা বাধ্য হয়। ভুগতে ভুগতে একদিন ধর্মকেই আঁকড়ে ধরে নিজের পরিচয় হিসেবে। ধীরে ধীরে তারা ধর্মবাদী হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে অসহিষ্ণু অচেতন মৌলবাদী।

বিজেপি বলছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কথা। 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে যাদের খ্যাতি আছে, তারা রাগ করেছে শুনে। বিজেপির বিরুদ্ধশিবির বলেই তাদের উল্টোকথা বলতে হবে, স্বরচিত এই নিয়ম মেনে বলছে তারা — 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি মানি না'। এটি মানার দু হাজার কারণ থাকলেও বলছে মানি না। না মানার কী কী কারণ? একটিই কারণ। বিজেপি মানছে। বিজেপি মানছে বলে অন্য দলের তা মানা যাবে না। বিজেপি যদি বলে সূর্য পূর্বদিকে ওঠে, তাহলে কি বিরুদ্ধশিবিরকে বলতে হবে যে সূর্য পূর্বদিকে ওঠে না, ওঠে পশ্চিমদিকে? অনেকে মনে করে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি মানে মুসলমানদের বুঝি 'হিন্দু আইন' মানতে হবে। হিন্দু আইনের কথা এখানে হচ্ছে না, অন্য কোনও ধর্মভিত্তিক কোনও আইনের কথাও হচ্ছে না, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বলতে যা বোঝায় তা হল সমানাধিকারের ভিত্তিতে রচিত বিধি, যে বিধিতে ধর্মের ধ-ও নেই, নারী ও পুরুষের সমান অধিকার যে বিধি নিশ্চিত করে। একটি সভ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য এই ধর্মগন্ধহীন নিষ্কলুষ বিধি নিতান্তই অপরিহার্য। মানবাধিকারের সুবিধে কিছু মানুষকে দেওয়ার, এবং কিছু মানুষকে সেই সুবিধে থেকে বঞ্চিত করার আইন বহাল থাকে যে রাষ্ট্রে, সেই রাষ্ট্রকে আর যাই বলা যাক, গণতান্ত্রিক বলা যায় না। যে কোনও ধর্মীয় আইনই যে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, এবং নারীর অধিকারের পরিপন্থী তা যে কোনও সুস্থ মানুষেরই বোঝার কথা।

ইমরানাকে যতদিন 'তাদের মেয়ে' হিসেবে দেখা হবে, যতদিন 'আমাদের মেয়ে' হিসেবে হবে না, যতদিন সে ভারতের মেয়ে না হবে, ততদিন ইমরানাদের দিকে আঙুল তুলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় দেখবে এবং দেখাবে। ইমরানার দুর্ভোগকে কখনও তারা নিজেদের দুর্ভোগ বলে অনুভব করবে না। অনুভব করবে না বলেই তারা রা-শব্দ করবে না, বা চিল্লিয়ে প্রতিবাদ করবে না। 'মুসলিম-বিরোধী' দুর্নাম কামাতে হয় কী না এই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকবে। বর্বরতাকে মেনে নিলেই অসাম্প্রদায়িক বা সেকুলার হিসেবে দিব্যি 'নাম' হয়। সহজে নাম হওয়ার এটি একটি পন্থা বটে। চোখ কান নাক মাথা বুঁজে থেকে 'নাম' করে নেওয়া। নাম না হয় হল, কিন্তু দেশটির কী হয়? দেশের প্রায় পনেরো কোটি মানুষ যদি অন্ধকারে পড়ে থাকে, যদি অশিক্ষা

কুশিক্ষা অন্ধত্ব আর দারিদ্র ছাড়া আর কিছু তাদের সামনে না থাকে! তাদের মধ্যে তো খুব স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে ঠগ জোচ্চোর বদমাশ ধর্ষক সন্ত্রাসী খুনী এবং আরও হরেক রকম উপদ্রব। দূরদর্শী আছে কেউ? কোনও লোকনীতিক? ইমরানাদের বাঁচাবার জন্য না হলেও অন্তত দেশটিকে বাঁচাবার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মমুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা, শরিয়তি আইনের পরিবর্তে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রণয়ন করা, অন্ধকারের পরিবর্তে আলো ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা যতদিন না লোকনীতিকরা অনুধাবন করতে পারছেন ততদিন ভারতের ভবিষ্যত নিয়ে ভয় দূর হওয়ার নয়। কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন দিয়ে দেশকে সভ্য করা যায় না। গেলে সৌদি আরবে মানবাধিকার, নারীর অধিকার আর গণতন্ত্র বিরাজ করতে পারতো।

ভারতে কিন্তু জনহিতকর কাজের অভাব নেই। 'একে বাঁচাও ওকে রক্ষা করো' আন্দোলন লেগেই আছে বছরভর। নানা রকম আইনও আছে নানা জিনিস রক্ষা করার। কিন্তু চরম দুর্দশা থেকে লাঞ্ছনা থেকে অপমান থেকে মৃত্যু থেকে মুসলমান মেয়েদের রক্ষা করার কোনও আন্দোলন বা কোনও আইন এই ভারতবর্ষে নেই। আট কোটি মুসলমান মেয়ের চেয়ে একটি কৃষ্ণসার হরিণের মূল্য এ দেশে বেশি। কৃষ্ণসার হরিণকে বাঁচাবার আইন আছে, আট কোটি মেয়েকে বাঁচাবার কোনও আইন নেই।

একটি শিশু যখন জন্ম নেয়, তার কোনও ধর্ম থাকে না। তাকে বাবা মার ধর্মভুক্ত হতে বাধ্য করা হয়। বুদ্ধি হবার পর তার কোনও অধিকার থাকে না নিজের জন্য কোনও ধর্ম অথবা ধর্মহীনতাকে পছন্দ করার। শাহবানু, ইমরানা, লতিফুন্নেসা, গুড়িয়ারা কি মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে দোষ করেছে? কেন তাদের রাষ্ট্র তাদের নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করবে, কেন তারা বঞ্চিত হবে গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবাধিকার, সমানাধিকার, বাক স্বাধীনতা, এবং প্রাপ্য নিরাপত্তা থেকে? কী অপরাধ তাদের? আজ শিকলে, বোরখায়, আধাঁরে, পাঁকে বন্দি এইসব মেয়ে। লক্ষ কোটি মেয়ে। এরা 'তারা' নয়, এরা 'আমরা', এরা স্বাতী, সরস্বতী, এরা দ্রৌপদি, এরা পার্বতী, এরা শ্বেতা, মহাশ্বেতা। এক মেয়ে যখন বন্দি, আমি বিশ্বাস করি তখন সব মেয়েই বন্দি। মেয়েদের বন্দি করা হচ্ছে এই সমাজে, এই দেশে, আর এই দেশেরই এই সমাজেরই মানুষ হয়ে নিজেদের মুক্ত ভাবে যে মেয়েরা, ধিক তাদের। কোনও মেয়েই মুক্ত নয়, যখন সব মেয়ে মুক্ত নয়। এই বোধটি আর কবে মেয়েদের মনে উদয় হবে! অবশ্য উদয় হলেই বা করার কী আছে? মেয়েরা তো ছোট বড় মাঝারি নানান রকম খাঁচায় বন্দি। কারই বা কী করার আছে কঠিন কঠোর পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে! চিৎকার করা যায়। চিৎকার করে কিছু হোক বা না হোক, চিৎকার তো অন্তত হয়। এটিই মেয়েরা যদি সবাই মিলে করতে পারতো! নিজেদেরকে অযথা সুখী এবং স্বাধীন মনে না করে। নিরাপদে এবং নিরুপদ্রবে আছে বলে ভুল না করে!

ভারত আজ উদাহরণ হতে পারতো সত্যিকার গণতন্ত্রের। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে ভারতের উদাহরণ মেনে গণতান্ত্রিক হতে পারতো আরও। শুধু

প্রতিবেশীই বা বলি কেন, মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মরাষ্ট্রগুলোও শিক্ষা নিতে পারতো। আজ এত বড় একটি রাষ্ট্র ভারত, ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক শক্তি ও অতুল সম্ভাবনা, দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে । এই ভারত দায় নিতে পারতো সভ্যতার। দায় যদি বড়রা না নেয়, তবে নেবে কে?

আসছে নভেম্বরে কলকাতা শহরে হতে চলেছে ধর্মমুক্ত মানববাদী মঞ্চের কনভেনশন। কনভেনশনে 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চাই' বলে দাবি উঠবে। এই মঞ্চের সকলের জন্ম মুসলিম পরিবারে। গিয়াসউদ্দিন, সুলতানা ওয়াজেদা, মোজাফফর হোসেন, সুলেখা বেগম, জাহানারা খাতুন, ফাতেমা রহমান, গোলাম ইয়াজদানি, মহব্বত হোসেন এরকম অনেকে। সরকার কি কিছু জঙ্গিকে মুসলমানের প্রতিনিধি না ভেবে এই শিক্ষিত সচেতন বিবেকবান যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক, মানববাদে এবং মানবাধিকারে, গণতন্ত্রে এবং সেকুলারিজমে বিশ্বাসী মানুষদের মুসলমানের প্রতিনিধি ভাবতে পারেন না? পারলে চিত্র বদলে যায়। একটি বৈষম্যহীন আগামির স্বপ্ন আমরা দেখতে পারি। মঞ্চের আরও দাবি 'মানবাধিকার, নারীর অধিকার, ধর্মমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্মীয় সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ'— এসব প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগও নির্বিঘ্নে নেওয়া যেতে পারে।

খুব বেশি তো দাবি নয়, অতি সামান্যই দাবি, সামান্য একটু সভ্য হওয়ার দাবি। রাষ্ট্রকে, আইনকে, সমাজকে সামান্য সভ্য করার দাবি। দাবিটি তো অযৌক্তিক নয়। দাবিটি তো ন্যায্য। এই দাবিকে যারা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চায়, তারা কি সত্যিই বৈষম্যহীন বিদ্বেষহীন সমাজ চায়? তারা কি আদৌ দেশের এতটুকু ভালো চায়?

মঙ্গল কামনা

১. ভাইদের মঙ্গল কামনা করার জন্য কলকাতায় শুরু হয়েছে ভাইফোঁটার আয়োজন। আমাকে ক'জন আবদার করেছিল ভাইফোঁটা দেবার জন্য। আমি সেই ভাইদের বললাম, 'আপনারা বোনফোঁটার ব্যবস্থা করুন। বোনদের মঙ্গল কামনা করে তাদের কপালে ফোঁটা পরান। আপনাদের মঙ্গল তো অনেক হলো। এবার বোনের মঙ্গলের জন্য কিছু করুন। নিয়ম পাল্টান।'

ভাইরা আকাশ থেকে পড়ল। এমন অলক্ষুণে কথা তারা ইহজীবনে শোনেনি।

২. আমি কোনও ইদ পুজো বড়দিন এসব করি না। যেহেতু ধর্ম আমি মানি না। কিন্তু এসএমএস পেলাম খুব, 'শুভ বিজয়া', 'শুভ দীপাবলি'। সবচেয়ে বেশি পেয়েছি 'ইদ মোবারক'। এর কারণ কী, এই, যে, আমি মুসলমান পরিবারে জন্মেছি? মুসলমান পরিবারে জন্মেছি বলেই যে আমাকে মুসলমান হতে হবে তার কোনও মানে নেই। আমি আপাদমস্তক নাস্তিক। কারও নাস্তিকতাকে সম্মান জানানোর রীতি এ সমাজে নেই। কোনও না কোনও ধর্মের গর্তে মানুষকে ফেলার অভ্যেসই মানুষের। আমাকে 'তোমাদের ইদ, তোমাদের রোজা, তোমাদের শবেবরাত' বলে কথা বলতে শুনি তাদেরই, যারা আমার নাস্তিকতার আদ্যোপান্ত জানে। আসলে, ভেজাল জিনিসে এত বেশি অভ্যেস মানুষের, যে খাঁটি দেখলে ঠিক বোঝে না যে জিনিসটি ভেজাল নয়। আমি নাস্তিকতার কথা বলি বলেই যে আমি ভেতরে ভেতরে মুসলমান নই, তা তাদের ঠিক বিশ্বাস হয় না। জীবনে যা আমি বিশ্বাস করি, তা আমি যাপন করি — এ কথা আমি শত বলেও কাউকে বোঝাতে পারি না। সম্ভবত সত্যিকার নাস্তিক দেখার অভিজ্ঞতা কারওর নেই। অথবা এ যুগে নিজেকে নাস্তিক হিসেবে পরিচয় দিয়েও ঘন্টা বাজলেই 'এ তো আর ধর্মীয় নয়, এ নিতান্তই সামাজিক উৎসব' বলে ইদ পুজো বড়দিনে ঝাঁপিয়ে পড়ার লোক তো কম নেই। তাই ধন্দে পড়ে হয়তো অনেকে। অথবা কোনও দ্বিধা নয়, মস্তিষ্কে শুধু এই জিনিসটুকু কাজ করে না যে ধর্ম এবং ধর্মসংক্রান্ত সবরকম উৎসব থেকে সে সামাজিক হোক অসামাজিক হোক নিজেকে মুক্ত করা সম্ভব।

৩. আমার বাড়িতে যে বাঙালি পুরুষই দুপুরের বা রাতের খাবার খেয়েছে, গায়ে

গতরে যত সে বলশালী হোক, দেখেছি দুর্বল। নিজের থালা তারা নিজে নিয়ে নিতে পারে না। কেউ ভাত তরকারি বেড়ে দেবে এই আশায় শূন্য থালা সামনে নিয়ে বসে থেকেছে। নিজের হাতে ভাত তরকারি নিজের থালায় নিতে হবে, কেউ এখানে কাউকে তুলে দেবে না — এই ঘোষণা দেবার পর সব পুরুষই দেখি চেষ্টা করেছে বাটি থেকে নিজ নিজ থালায় খাবার নেবার। কিন্তু পারেনি কেউ। হয় চামচ পড়ে গেছে হাত থেকে। নয়তো খাবার পড়ে গেছে টেবিলে। নয়ত বাটি কাত হয়ে গেছে, অথবা উপুড় হয়ে পড়েছে টেবিল থেকে মেঝেয়। এই দুর্ঘটনাগুলো মেয়েদের বেলায় ঘটে না, ঘটে শুধু পুরুষের বেলায়। কেন, এই রহস্য একদিন আমি ভেদ করি। বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, বাড়ির মেয়েরা বাড়ির পুরুষদের খাওয়ান। টেবিলে পুরুষদের খেতে দিয়ে নিজেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিবেশন করেন। নিজেরা খান না। পুরুষেরা, বাচ্চারা এবং অতিথিরা খেয়ে ওঠার পর তারা খান। পুরুষের ঘাড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের সেবাদাসী, কিছু তাদের দরকার হয় কী না দেখার জন্য। পুরুষেরা, যারা নারী-স্বাধীনতায় অবিশ্বাসী এবং ঘোরতর বিশ্বাসী — মহানন্দে দণ্ডায়মান সেবাদাসী পাশে নিয়ে খেয়ে দেয়ে ঢেঁকুর তোলেন।

সেই যে বলা হত, স্বামীর আগে স্ত্রী খেয়ে নিলে স্বামীর অমঙ্গল হয়। এখনও সম্ভবত একই বিশ্বাস কাজ করে — যত ছুতোই একসঙ্গে বসে না খাবার পক্ষে দেওয়া হোক না কেন।

৪. কলকাতায় কারও বাড়িতে যখনই যাই নেমন্তন্নে, দেখি মেয়েরা একজায়গায় জড়ো হয়ে গপ্প করছে, পুরুষরা আরেক জায়গায়। একদিন তো মুখ ফসকে আমার বেরিয়েই গেল, 'কী ব্যাপার, এখানে সবাই সমকামী না কি?' যথাসম্ভব দুদলকে এক করাবার চেষ্টা করি। কিন্তু বেশিক্ষণ তা স্থায়ী হয় না। পুরুষের আড্ডা আর মেয়েদের আড্ডার বিষয়গুলো আলাদা। পরস্পরের বিষয় নিয়ে কেউ খুব একটা উৎসাহী নয়। লক্ষ করেছি, মেয়েদের বিষয় শাড়ি কাপড়, বাচ্চা কাচ্চা, রান্না বান্না, স্বামী সংসার, বড়জোর গান বাজনা। পুরুষের বিষয়, রাজনীতি, অর্থনীতি, যৌনতা, টাকা পয়সা। এই বিষয়গুলো পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল। বিবর্তন কত কিছুতে ঘটছে। নারী পুরুষের গপ্পের বিষয় কেবল এক থেকে গেছে। গপ্পের বিষয় এক হবেই বা না কেন! পুরুষতন্ত্র যে একইরকম ভাবে জাঁকিয়ে বসা। বিবর্তন তো ডালে ডালে পাতায় পাতায় ঘটছে, গোড়ায় ঘটছে না।

৫. মেয়েদের কিছু না কিছুতে বদনাম না হলে চলে না। বদনাম বিহীন কোনও মেয়েকে দেখার সৌভাগ্য আজও আমার হয়নি। পুরুষদেরও বদনাম হয়। ওগুলোকে অবশ্য বদনামের চেয়ে নাম বলেই আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন, 'ও ছেলে অনেক মেয়েকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। ও ছেলে অনেকগুলো মেয়ের সঙ্গে করছে। বউটউকে কেয়ার করে না। ওর কাজের মেয়েটার তো হেভি ফিগার, ডেইলি করে। ও ছেলে তো ভালো খসিয়ে নিতে পেরেছে। ও তো ভালো টানতে পারে। সকাল

থেকে মদ শুরু করে, বাহ, রাত্তিরেও চালিয়ে নিয়ে যায়। গাঁজা ফাজা ওর কাছে কিচ্ছু না।'

ভাবা যায়, কোনও মেয়ে সম্পর্কে এমন মন্তব্য, এবং এসবের নাম 'নাম'?

৬. আমার আবার দুরকমের বদনাম। প্রথম বদনাম হচ্ছে, আমি পুরুষবিদ্বেষী, পুরুষদের দুচোক্ষে দেখতে পারি না। আবার দ্বিতীয় বদনাম হচ্ছে, আমি নারীবিদ্বেষী, কোনও মেয়েকেই দুচোক্ষে দেখতে পারি না।

তৃতীয় বদনাম নিয়ে এখন আশংকা করছি। সেটি সম্ভবত হবে হিজড়েদের নিয়ে। আমি হিজড়ে বিদ্বেষী, হিজড়েদের দুচোক্ষে দেখতে পারি না।

বদনাম নিয়ে মাথা না ঘামাতে ঘামাতে ইদানীং লক্ষ করছি আমি নাম নিয়েও আর মাথা ঘামাচ্ছি না। এটি বোধহয় একদিক থেকে ভালোই হলো।

৭. ভারতের অনেক শহরে মেয়েদের মোটর সাইকেল চালাতে খুব দেখা যায়। কিন্তু কলকাতায় এর চল নেই। এ শহরে মোটর সাইকেল চালায় পুরুষেরা। চালকদের মাথায় হেলমেট শোভা পায়। চালকের সামনে পিছনে যদি পুরুষ-আরোহী থাকে, তাদের মাথায়ও হেলমেট থাকে। থাকে না শুধু মেয়েদের মাথায়। চালকের পেছনে দুপা জড়ো করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসা মেয়েরা দিব্যি খোলা মাথায় খালি মাথায় চলছে। সামনে স্বামী-দেবতা বা প্রেমিক-দেবতা সর্বোপরি পুরুষ-দেবতা সুরক্ষিত। দুর্ঘটনা ঘটলে স্বামীটি বাঁচবে, আর মাথার সিঁদুর নিয়ে স্ত্রীটি সঙ্গে যাবে। নিজের মাথা কেটে পরের যাত্রা শুভ করতে বা নিজের জীবনটি বলি দিয়ে পরের জীবনটি বলিষ্ঠ করতে নারীর জুড়ি নেই।

এতদিনে সভ্য আইন

নারীনিগ্রহ ছিল সকালে ঘুম থেকে ওঠার মতো, উঠে পেচ্ছাব করার মতো, দাঁত মাজার মতো, চা খাওয়ার মতো। নারীনিগ্রহ ছিল পাড়ার দোকান থেকে হাফ প্যাক সিগারেট কেনার মতো, প্রতিদিনকার বাসে চড়ার মতো, আপিস যাওয়ার মতো। ছিল লাঞ্চের পর একটু ঝিমিয়ে নেওয়ার মতো। ছিল রকের আড্ডার মতো, তালুতে খৈনি ডলে দু চিমটি মুখে দেওয়ার মতো। ছিল সন্ধ্যের দু পেগের মতো। টিভিতে ক্রিকেট দেখার মতো। রাতে খেয়ে দেয়ে ঢেঁকুর তুলে কুঁচকি চুলকোতে চুলকোতে বিছানায় যাওয়ার মতো। নারীনিগ্রহ ছিল এমনই নিরীহ, এমনই নগণ্য। এমনই নিত্যনৈমিত্তিক, এমনই নরমাল।

হঠাৎ করে কিসের মধ্যে কী? কী আবার, পান্তা ভাতে ঘি!

কী, গঞ্জে আইনবাবু এয়েচেন। আইনবাবু এখন চোখ রাঙিয়ে মানুষকে শাসাচ্ছেন, দুষ্টুমি করবি তো মরবি। এই দুষ্টের দেশে বলা নেই কওয়া নেই লালচক্ষুর ছড়ি ঘোরানো! আইনবাবুকে দেখে পুং-জনতা ত্রিশূল হাতে বেরিয়ে পড়েছে, লিঙ্গের আগায় লাল পতাকা ঝুলিয়ে যৌন-অনশনে নেমে গেছে। আইনবাবুকে গঞ্জ থেকে না খেদিয়ে কেউ অন্ন মুখে দেবে না। হিংসের হিশহিশ শব্দ চারদিকে। সভ্যভব্য দেখতে লোকেরা তো নাক কুঁচকে বলেই যাচ্ছে, ‘আইন করে কিসসু হবে না, যে আইনের প্রয়োগ কস্মিন কালেও হবে না, সেই আইন প্রণয়ন করে আইনকেই হাসির বস্তু বানানো হলো।’ কোনও কোনও পুরুষ আবার দাঁত খিঁচিয়ে বলছে, ‘আইন তো নয়, যেন ফতোয়া।’ কেউ বলছে,আধুনিক সমাজে যত কম বাধানিষেধ জারি করা যায়, ততই মঙ্গল। সমাজ চলবে তার অভ্যন্তরীণ সংশোধনের তাগিদে। বাইরের হুকুমে নয়।

এই পচা পুরোনো সংস্কারে ঠাসা সমাজকে আধুনিক সমাজ বলে দাবি করার এবং এ নিয়ে গর্ব করার লোকের অভাব নেই এ শহরে। তাজ্জব হয়ে যাই ভাবলে, যে, ধর্মান্ধ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কী করে কবে আধুনিক হল! মেয়েদের এখনও ‘দেখতে আসে’ পুরুষেরা। বিয়ে করে পুরুষের বাড়িতে নিয়ে যায় মেয়েকে। বিয়ের পর মেয়েদের পরতে হয় শাঁখা সিঁদুর, পাল্টাতে হয় পদবী, কারও সম্পত্তি তারা, তা বোঝানোর জন্য। পুরুষকে কিন্তু কোনও বিবাহের চিহ্ন বহন করতে হয় না!

এই ‘আধুনিক’ সমাজেই স্ত্রীর ওপর শারীরিক মানসিক অর্থনৈতিক সব রকম অত্যাচারই চলে। কন্যাভ্রূণ হত্যা করা হয়, পুত্র-প্রসব না করলে গঞ্জনা সইতে হয়,

এই তথাকথিত আধুনিক সমাজেই স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা স্ত্রীকে দুঃসহ জীবন যাপন করতে হয়, কিন্তু বিপত্নীক পুরুষকে কোনও গ্লানি ভোগ করতে হয় না। এই আধুনিক সমাজে স্বামী স্ত্রী দুজনই ঘরের বাইরে যাচ্ছে চাকরি করতে বা ব্যবসা করতে, কিন্তু ঘরে ফিরে দাসীর কাজটা করতে হয় স্ত্রীকেই, স্বামী তখন স্বামীর মতোই, প্রভু। যত আধুনিক হচ্ছে সমাজ, তত পণ্য হচ্ছে মেয়েরা। পুরুষের শরীর এবং মন তৃপ্ত করার জন্য মাপ মতো শরীর তৈরি করতে হচ্ছে, সাজপোশাক পরতে হচ্ছে। এই আধুনিক সমাজেই তো ধর্ষণ, বধূহত্যা ও বধূনির্যাতন বহাল তবিয়তে বিরাজ করে। এই আধুনিক সমাজেই তো রং কালো বলে উপেক্ষা অবজ্ঞা পেতে পেতে গভীর হতাশায় ডুবে আত্মহত্যা করে মেয়েরা!

এই যদি হয় আধুনিকতার সংজ্ঞা! তবে বছর পেরোতে পেরোতে সূর্য তার জ্যোতি হারালেও, গ্রহগুলো এক এক করে কক্ষচ্যুত হলেও এই সমাজকে সত্যিকার আধুনিক করা দুরূহ হবে।

মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বড় কিছু ডিগ্রি নিলে, ছোট ছোট আঁটো পোশাক পরে বাইরে বেরোলে, ডিসকোথেকে গিয়ে নাচলে, আর মদ সিগারেট খেলে সমাজ আধুনিক হয় না। আধুনিকতার সংজ্ঞা এত সংকীর্ণ নয়।

না। এ সমাজ আধুনিক নয়। সমাজে অসাম্যের দুর্গন্ধ। সংসারে আপোস। এই আপোসের নীতি রীতির নাম আর যা কিছুই হোক, 'আধুনিকতা' নয়। এ নিতান্তই প্রভু এবং দাসীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

স্বামী দিনের পর দিন ধর্ষণ করছে স্ত্রীকে। এখন সেই ধর্ষণকে যদি ধর্ষণ বলে গণ্য করা হয়, কার তাতে আপত্তি থাকে? থাকে অগুনতি ধর্ষকদের। তারা এখন ফুঁসছে। 'কী হল কী, বউকেও কি করতে দেবে না নাকি? জোর করছি, হ্যাঁ নিজের বউকেই জোর করছি। রাস্তার মেয়েছেলেকে তো জোর করে কিছু করছি না। এ আমার বউ। আমার জিনিস। আমার মাল। আমার প্রপার্টি। আমার প্রপার্টিকে আমি যা ইচ্ছে তাই করবো। কার তাতে কী বলার আছে! সংসারের শান্তি নষ্ট করার আইন এনেছেন তেনারা!'

স্ত্রীরা পুরুষদের সম্পত্তি, এ কথা পুরুষ যেমন বিশ্বাস করে, পুরুষের সম্পত্তি নামক স্ত্রীরাও করে বা করতে বাধ্য হয়। বাধ্য হয় বলেই কোনও রকম যুক্তি ছাড়াই, কারণ ছাড়াই ঘরে ঘরে বিয়ে নামক জিনিসগুলো টিকে আছে। এখন সম্পত্তির আমি মালিক হলে যা ইচ্ছে তাই করবো, আর আমাকে নাকি যা ইচ্ছে তাই করতে দেবে না আইনবাবুরা। ভারতের সম্পত্তি আইন কী বলে? সেই আইন কি বলে না আমার সম্পত্তিতে আমার একচ্ছত্র অধিকার?

নারী যে পুরুষের সম্পত্তি নয়, সামাজিক সম্পর্ক থাকলেও— তা ক'জন জানে। যারা জানে, তারা ক'জন মানে? সমাজটা পুরুষতান্ত্রিক। একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে সমাজটা পুরুষতান্ত্রিক। সমাজের হর্তাকর্তা পুরুষ। এই সমাজে দুএকটা মেয়ে 'পৌরুষ' দেখালো, পৌরুষ দেখিয়ে পুরুষের ক্ষমতা ছটাকখানিক খর্ব করলো তার মানে এই নয় যে ভাইস ভার্সা, পুরুষরাও নারীর সম্পত্তিস্বরূপ!

'আইনের প্রয়োগ হবে না'— এই বলে আইনকে কটাক্ষ করা উচিত নয়। ঘোর অন্ধকার সমাজে আইনের সত্যিকার প্রয়োগ হতে হতে সময় লাগতে পারে। প্রথম প্রথম আড়ষ্টতা থাকবে আইনটিকে ব্যবহারের ব্যাপারে। লোকে ঘেন্না দেবে বলে মেয়েরা এগোবে না। মেয়েদের শাসানো হবে। মেয়েরা গুন্ডাদের ভয় পাবে। কিন্তু কোনও একদিন তো প্রয়োগ হবে, কোনও একদিন তো কিছু মেয়ে মাথা উঁচু করে বিচার চাইবে এই আইনের আওতায়। দেয়ালে পিঠ লেগে যাওয়া মেয়েরা তো পুরুষের রক্তচক্ষু তুচ্ছ করে সামনে এগিয়ে যাবে। এবং এই সাহসী মেয়েদের দেখে আরও মেয়ের সাহস হবে আইনের আশ্রয় নেওয়ার। শয়তানি করে বদ পুরুষেরা পার পেয়ে যাবে , তা হবে না, ওদের ছাই দিয়ে ধরতে হবে। ওই ছাই-টিই হল আইনটি। আইন দিয়ে না ধরলে পিছলে যাওয়ার আশংকা বেশি। এতকাল তো বদএর পক্ষে এবং তাদের পিছলে যাওয়ার পক্ষেই ছিল যাবতীয় আইন।

'আইন আইনের মতো পুস্তকে পড়ে থাকবে, প্রয়োগের নামগন্ধ থাকবে না' — এরকম যারা বলতে শুরু করেছিল, তাদের নস্যাৎ করে কিন্তু আইন প্রণয়নের পরদিনই তামিলনাড়ুর জোসেফ নামের এক লোক তার স্ত্রীকে পেটানোর দায়ে গ্রেফতার হয়েছে। কুড়িহাজার টাকা জরিমানা দিয়ে তবে তার মুক্তি। জোসেফরা এতকাল যে ভাবতো স্ত্রীকে যেমন ইচ্ছে মারবে পোড়াবে, তা আর হচ্ছে না। ভালোবাসা যদি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সৃষ্টি করতো তবে সেটিই হত আদর্শ সহাবস্থান। কিন্তু সেটি যদি না থাকে, তবে ভয়ই ভরসা। ভয় দেখিয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ জাতি ধার্মিক জাতি, নরকের ভয় আছে বলেই নরম থাকে, যতটাই থাকে।

ক্ষিধে পেলে, হিংসে পেলে, ক্রোধ জাগলে, রাগ উঠলে অন্যকে কামড়ানোর খামচানোর খুন করার উদ্রেক মানুষ নামক দ্বিপদী জীবের না হওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু নৈতিকতার শিক্ষা, ন্যায়-অন্যায়-বোধ জন্মের পর থেকে মানুষ অর্জন করতে থাকে বলে অনেক ইচ্ছেকে দমন করে। মেয়েদের বিরুদ্ধে করা কোনও অন্যায়কে অন্যায় বলে মনে না করার শিক্ষা পেয়ে যদি এই সমাজের পুরুষেরা বড় হয়ে থাকে, তবে তাদের নতুন করে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তো এভাবেই করতে হবে। এভাবে, আইন করে।

অন্যকে আঘাত দিও না, অন্যের ক্ষতি করো না, অন্যকে মেরো না — অন্যের নিরাপত্তার জন্য তো একশ একটা আইন আছে। সেই অন্যের মধ্যে নারীকে যুক্ত করার অভ্যেস কারওর নেই। মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য, মেয়েদের বাঁচাবার জন্য আইন থাকবে না কেন? বিশেষ করে সেই মেয়েদের, যে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে স্ত্রী, প্রেমিকা, মা, বোন, কন্যা ইত্যাদি সম্পর্কের দাবিতে বাস করতে বাধ্য হয়।

লিভ টুগেদার করা জুটি এবং বিয়ে করা জুটির জন্য একই আইন — এটিই বলে দেয় যে সভ্যতার পথে গুটিগুটি করে হাঁটছে সমাজ। কিন্তু প্রশ্ন হল, সব ধর্মাবলম্বীদের জন্যও তো আইনটি! আইনটির কোথাও লেখা নেই, এটি শুধু হিন্দুদের জন্য বা

খ্রিস্টানদের জন্য বা সাঁওতালদের জন্য। এর অর্থ, আইনটি সব ধর্মের, সব জাতের মানুষের জন্য। মুসলিমদের জন্যও। কিন্তু, মুসলিম পারসোনাল ল-র সঙ্গে এই আইনের যখন পদে পদে বিরোধ হবে, তখন কী হবে? কোন আইনকে তখন প্রাধান্য দেওয়া হবে? নারীকে নিগ্রহ করা যখন মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে অন্যায় নয়, কিন্তু পারিবারিক নিগ্রহ আইনে অন্যায় — তখন? জনতার আদালত কোন পক্ষে যাবে, অন্যায়ের পক্ষে নাকি অন্যায়ের বিপক্ষে?

পুরুষেরা খেপে উঠেছে, তবে গঞ্জ থেকে যত সহজে তারা তাড়াবে ভেবেছে আইনবাবুকে, তত সহজে তাড়ানোটা বুঝি হচ্ছে না। আইনের প্রয়োজনীয়তা শহর বন্দর গ্রামের সর্বত্র আনাচ কানাচ থেকে অনুভূত হচ্ছে। কেউ কেউ বলছে বাড়ির কর্তার বিরুদ্ধে এই আইন খাটালে পরিবারে ঝগড়াঝাঁটি, অশান্তি, ভুলবোঝাবোঝি, হিংসেহিংসি সব বাড়বে। ভাবটা এমন, এখন কোনও ঝগড়াঝাঁটি হিংসেহিংসি বলতে নেই। এখন বেশ ভালোবাসায় ভরে আছে সংসার।

এই নিগ্রহ আইনেই কিন্তু মেয়েদের সব সমস্যার সমাধান লেখা হয়ে যায়নি। বিয়ে-বিচ্ছেদের পর মেয়েকে খালি হাতে বেরিয়ে যেতে হয়, বড় জোর সঙ্গে পায় স্ত্রীধন। কিন্তু পঞ্চাশ পঞ্চাশ হিসেবে দাম্পত্যজীবনে অর্জিত সহায় সম্পদগুলোর ভাগবাটোয়ারা হয় না। ভাগ করে দেবার জন্য আইনবাবু কবে আসবেন? আইনবাবুর কিন্তু আরও কাজ বাকি, আরও অনেক কিছু সমান ভাগে ভাগ করার কাজ। উনি গঞ্জে যখন এসে বসেছেন, তখন যেন পুরুষগুলোর গালিগালাজে আর ত্রিশূলের গুঁতোয় বিদেয় হয়ে আবার মানবতার সব্বনাশ ডেকে না আনেন।

মহাশ্বেতা, মেধা, মমতা— মহাজগতের মহামানবীরা

নারীরা রাজনীতি জানেনা, অর্থনীতি বোঝে না, ক্রিকেট বোঝে না, নারীরা কঠিন কাজ পারে না। নারীরা পারেনা, নারীরা জানেনা, নারীরা বোঝেনা— সবসময় শুনছি। অথচ নারীরা বারবার প্রমাণ করেছে তারা জানে পারে বোঝে। শুধু তাই নয়, তারা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি জানে, পারে এবং বোঝে। তারপরও নারীবিদ্বেষী সমাজের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয় নারীকে। নারীর সব জানা পারা বোঝাকে গায়ের জোরে অস্বীকার করে পুরুষেরা গদিতে বসে আরাম করছে। নারীদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে পুরুষের আরাম আয়েশের সব আয়োজন করতে। নারী থাকবে নেপথ্যে, পর্দার আড়ালে। সবার পিছে সবার নিচে সবহারাদের মাঝে। কিছু নারী কিন্তু পুরুষের বেঁধে দেওয়া নিয়ম ভেঙে সামনে চলে আসে। তারা দেখিয়ে দিতে পারে যে সংকটকালে তারাই সহায়। মমতা, মহাশ্বেতা আর মেধা— এই তিন নারী, তাঁদের যা কিছুই হোক না কেন রাজনৈতিক আদর্শ, যা কিছু ভুল ভ্রান্তি তাঁরা জীবনে করুন না কেন, মানুষের দুঃসময়ে তাঁরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, ঝুঁকি নিয়েছেন যে কোনও দুর্ঘটনার, আপোস করেননি কোনও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে। এই মুহূর্তে এর চেয়ে বড় কোনও ঘটনা নেই। এর চেয়ে বড় কোনও সত্য নেই। এর চেয়ে বড় কোনও মানবতা নেই।

নারী পথ থেকে পাথর সরিয়ে দেয়। পুরুষ এসে সে পথে রাজার মতো হাঁটে। পুরুষ গিয়ে মসনদে বসে রাজ্য শাসন করে। পুরুষেরা অরাজকতা করলে, বিশৃঙ্খলা করলে, পুরুষেরা যুদ্ধ করলে, মানুষ-হত্যা করলে শান্তির পতাকা হাতে এগিয়ে আসে নারী। নারীই ঘরে ঘরে চোর,ডাকাত, মাতাল, লুম্পেন, খুনী পুরুষের মুখোমুখি হচ্ছে, তাদের সামলাচ্ছে, তাদের বদলাচ্ছে, তাদের মানুষ করছে। নিজেরা অসুখ নিয়ে অন্যকে সুখ দিচ্ছে। নারীর এই চরিত্রকে মনে হতে পারে নারী কেবল সেবার জন্য আর দেবার জন্য জন্ম নিয়েছে। তা কিন্তু নয়, যুদ্ধ নারীও করতে পারে, করে। নারীও চাইলে কুৎসিত কদাকার হতে পারে, স্বৈরাচারী শাসক হতে পারে। ইতিহাসে তার নজীর আছে। নারী মানেই যে শান্তির প্রতীক, তা নয়। নারীরা কম ধ্বংস, কম নির্মমতা, কম খুন জানে না।

ঘরে বাইরে শান্তি রক্ষা করছে নারী। অথচ এই নারীকে জগতের সব ধর্মই বলেছে নারী নরকের দ্বার। এই নারীকে অনাদরে, অবহেলায়, অসুখে, অশান্তিতে রাখছে

পুরুষ এবং পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা। নারীকে দূরে সরিয়ে রাখছে রাজনীতি। ক'জন নারী আজ মন্ত্রী? ক'জন নারী সংসদ সদস্য? পলিটব্যুরোয় ক'জন নারী? ক'জন নারী প্রশাসন চালায়? ক'জন নারী অ্যাকাডেমির উঁচুপদে? অবশ্য নারীশিক্ষাই বা শুরু হয়েছে কবে থেকে আর! গোটা সমাজ তো এই সেদিন অবধি নারীশিক্ষার বিরুদ্ধেই ছিল। অবশ্য এখনও কি নারীশিক্ষাবিরোধী মানুষ নেই! খুব আছে। এখনও কি ভাবা হয় না যে ছেলেদের ইস্কুলে পাঠানো উচিত, মেয়েদের নয়। মেয়েদের রান্নাবান্না কাজকম্ম শিখে বিয়ে হয়ে যাওয়াই ভালো। যদি ইস্কুলে পাঠানোই হয় মেয়েদের, সে কি আর সত্যিকার শিক্ষিত হওয়ার জন্য? বিয়ের বাজারে মেয়ের দর বাড়ানোর জন্য ছাড়া আর কী! শহুরে লোকেরা তো মনে করে শহরে বুঝি মেয়েরা খুব শিক্ষিত। হায় শিক্ষা! ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করার পরও কি খুব বেশি মানুষ জানে যে নারী ও পুরুষ উভয়ে মানুষ এবং তাদের অধিকার সমান? শিক্ষিত শহুরে মেয়েরা তো বাচ্চাকে ইস্কুলে ঢুকিয়ে ইস্কুলের দরজার কাছে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকে। সারাদিন পর বাচ্চা কী শিখে বেরোয়? বছর গেলে অংক বিজ্ঞান ইতিহাস ভূগোলের পাশাপাশি কি এই শিক্ষা কোনওদিন তারা অর্জন করে যে নারী পুরুষ উভয়ের স্বাধীনতা এবং অধিকার সমান? আর যে মেয়েরা দশটা পাঁচটা আপিস করছে? তারাও কি জানে? পুরুষ কর্তার সব আদেশ নির্দেশ তারা মাথা নত করে পালন করছে। বসতে বললে বসতে হয়, শুতে বললে শুতে। নিজের যোগ্যতার মূল্য নেই, দক্ষতার দাম নেই, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে পয়সা উপার্জন করতেও মেয়েদের দেওয়া হয় না। কেবল তো বাইরে নয়, ঘরেও ওই একই অবস্থা। কেবল পরিশ্রম করলেই চলবে না, বিসর্জনও দিতে হবে। মান, সম্মান, ব্যক্তিত্ব — যা কিছুই মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখায় — সবকিছুরই বিসর্জন। বিসর্জন দিতে চায় না এমন নারীকে ভালো বলার রেওয়াজ এই সমাজে নেই। তাই বিসর্জন দিয়েই তাদের ভালোর খাতায় নাম লেখাতে হয়। ভালোর খাতায় নাম লেখানোয় আর বেশ্যার খাতায় নাম লেখানোয়, আমার বিশ্বাস, তেমন কোনও পার্থক্য নেই।

নারীরা পারে না এমন কিছু নেই। অশান্তি করতে চাইলে করতে পারে, শান্তি চাইলে শান্তি পারে। ভালোবাসা যেমন পারে, ঘৃণাও তেমন পারে। এই পৃথিবীতে যতবার পুরুষেরা পচন ধরিয়েছে, ততবারই নারী এসে পচন সারিয়েছে। ততবারই ফসল ফলিয়েছে। সৌহার্দে স্নেহে সিক্ত হয়েছে সব। এই নারীকেই নেপথ্যে রেখে পুরুষ কৃতিত্ব নিয়েছে। নারীই রচনা করে, আর পুরুষেরা সমৃদ্ধ হয় নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে। নারীর জন্য এরকম কি কিছু শব্দ আছে? ভগ্নিত্ব? না নেই। এর চলও নেই, চর্চাও নেই। নারীদের তো আলাদা করে দেওয়া হয়। মা থেকে, বোন থেকে, বন্ধু থেকে। নারীর সঙ্গে নারীর যোগ সংযোগ বারবারই নষ্ট করে দেওয়া হয়। ইতিহাসের শুরু থেকেই নারী-বন্ধন নানা ধর্মে পড়ে, তন্ত্রে পড়ে, মন্ত্রে পড়ে নষ্ট হয়েছে। নারীকে পুরুষেরা বাঁধে, কিন্তু নারীর সঙ্গে নারীর বন্ধনের কোনও যো নেই। নারী যে নিজের প্রাপ্য অধিকার না পেলে আওয়াজ ওঠাবে, এক আওয়াজ শুনে একশ আওয়াজ, হাজার আওয়াজ ফাটবে তার জন্য, তার উপায় নেই। নারীর কোনও

শক্তিশালী সংগঠন নেই। যা আছে তা ওই মধ্যবয়সী গৃহবধূ অথবা প্রায়-গৃহবধূদের দল, মাসে বা বছরে মিলিত হয়ে গুনগুনিয়ে গান গায়, আর নিজেদের স্বাধীনতার প্রসার দেখে নিজেরাই মুগ্ধ হয় বা মূর্চ্ছা যায়।

পুরুষেরা সুন্দরী নারীর সংজ্ঞা তৈরি করেছে, সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী নারীরা উন্মাদের মতো সাজে, নিজেকে সুন্দরী হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে, না হলে মান থাকে না, সমাজে দাম থাকে না। স্বনির্ভর নারী যে ক'টা টাকা উপার্জন করে, তার বেশির ভাগ চলে যায় সাজগোজের পেছনে। নিজের জন্য যে সময় তার জোটে, তার অধিকাংশই যায় অনুসন্ধানে, কী পরলে বা না পরলে লোকে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। পুরুষেরা ভালো একটি কাজ দিয়েছে বটে নারীকে ব্যস্ত থাকার জন্য। রান্নাবান্না সন্তান-পালন ঘরসংসার ছাড়াও বড় একটি কাজ। এহেন ব্যস্ত নারীর যেন সময় না থাকে রাজনীতি বোঝার বা অর্থনীতি বোঝার। এমনকী ওই ক্রিকেট বোঝার সামান্য সময়ও যেন কেউ না পায়। নিজের অধিকারের অ-ও বোঝার তো প্রশ্নই ওঠে না। এত প্রতিবন্ধকতা, এত বাধা। ষড়যন্ত্রের শত জাল। নারীকে পিষে নিশ্চিহ্ন করার সব আয়োজন মজুত। তারপরও নারীকেই দেখি মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে। এই নারীবিদ্বেষী সমাজেই জন্ম নেয় মহাশ্বেতা, মেধা আর মমতার মতো নির্ভীক নারী।

আমরা তো আশা করতে পারি আরও মহাশ্বেতার, আর মেধার! নারীর তো মেধা আছে মেধা হওয়ার! মমতা আছে মমতা হওয়ার। শক্তি আছে মহাশ্বেতা হওয়ার। তবে নারী কেন পিছিয়ে থাকে, নারী কেন গৃহবধূ হয়ে থাকে! নারী কেন শুধু সন্তানের মা হয়ে বসে থাকে! নারী কেন নির্জীব, নির্বুদ্ধি, নিষ্প্রভ, নিঃসাড়, নিস্তেজ, নিস্পৃহ, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চুপ, আর নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে! নারী তো আগুন হতে জানে। তবে আগুন কেন সে জ্বালায় না! যে আগুনে এই সমাজের যাবতীয় বৈষম্য পুড়ে খাক হয়ে যেতে পারে!

দুঃসময়কে সুসময়ের কাছে নিয়ে যেতে নারীই হাত বাড়িয়েছে। এই হাতে শত সহস্র নারী রাখুক তাদের মশলাপেশা চালধোয়া হাত, এই হাতে সুঁইসুতোর হাত, শিশুপালনের হাত, এই হাতে কলমপেষার হাত, এই হাতে হাতুড়ি বাটালির হাত, কাস্তে কোদালের হাত, এই হাতে সকল নারীর হাত।

অসম্ভব তেজ ও দৃঢ়তা

যে মেয়েরা মাথা নুয়ে মুখ বুজে জীবন কাটাতো, সেই মেয়েরা, সেই সিঙ্গুরের মেয়েরা আজ পুলিশের মার খাচ্ছে। যে মেয়েরা ঘরের বাইরে বেরোয়নি কোনওদিন, কলিকাত্তার বাত্তি দেখেনি, আজ অনশন করছে। পুরুষও করছে অনশন। সিঙ্গুর থেকে ঘুরে এসে এক বন্ধু বলল, 'পুরুষেরা যারা অনশন করছে, তারা তাদের সরকার বিরোধিতার পরিণতির কথা ভেবে ভয়ে এবং দুশ্চিন্তায় বিবর্ণ। কিন্তু অনশন করা মেয়েদের মধ্যে অসম্ভব তেজ ও দৃঢ়তা। মেয়েরা বলছে, মরলে মরবো। এত দৃঢ়তা, এত তেজ!' কোথায় পেল মেয়েরা এত মনের জোর? কুড়ি থেকে সত্তর, সব বয়সী মেয়েদের জোর একইরকম। কেউ আপোস করবে না। পিছু হটবে না। দেখে ভালো লাগে। মনে পড়ে পশ্চিমের দেশগুলোয় ভোটের আন্দোলনের জন্য মেয়েদের পথে নামা! পথে পথে পুলিশের অত্যাচার সওয়া। এবং এক বিন্দু দমে না যাওয়া। মনে পড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশে দেশে মেয়েদের ভূমিকা। পুরুষেরা আপোস করছে। মেয়েরা করছে না। এই যে মেয়েদের আপোসহীন, সংকল্পে সিদ্ধান্তে অসংকুচিত চরিত্রের খবর আমরা পাচ্ছি, কোথায় যায় এই চরিত্রগুলো? চার দেয়ালের ভেতর যেই না ঢুকে গেল মেয়েরা, অমনি তাদের টুঁটি টিপে ধরা হয়। কণ্ঠরোধ করা হয়। পায়ে শেকল পরানো হয়। অসম্ভব তেজ আর দৃঢ়তা নিয়ে তারা ঘরে ঘরে পচে মরে। দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হলেই একমাত্র তাদের চোখে পড়ে। মিছিলের অগ্রভাগে মেয়েরা। ঘোমটা ফেলে বোরখা ছুড়ে বেরিয়ে আসা মেয়ে। ঘরে ঘরে কে বন্দি করছে মেয়েদের? কী নেই মেয়েদের যে শক্ত দেওয়ালটা ভাঙতে পারছে না! যদি কেউ কেড়েই নিয়ে থাকে হাতুড়ি, মেয়েরা কি পাল্টা কেড়ে নিতে পারে না? পারে না ভাঙার জন্য অন্য কোনও হাতুড়ি যোগাড় করতে? মেয়েদের এত সততা এবং সাহস, অনড় মন কোথায় হারায়? কে হত্যা করে তাদের? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি। জেনেও বেশির ভাগই মুখ বুজে থাকি। ভান করি না-জানার।

মনে প্রশ্ন জাগে, ছিনিয়ে নেওয়া সিঙ্গুরের কোনও জমি কি আদৌ মেয়েদের ছিল? নাকি ছিল মেয়েদের বাবার, মেয়েদের স্বামীর, মেয়েদের ভাইয়ের? মেয়েদের অধিকারে কিছু নেই, মেয়েদের মঙ্গলের জন্য কিছু নেই, কিন্তু মেয়েদের দ্বারাই সহায় সম্পত্তি সব রক্ষা হয়। রক্ষা মেয়েরাই করে। মেয়েরাই একএকসময় দেখি পরোয়া

করে না কোনও দুঃসময়ের, কোনও দুঃসহ দুর্দিনের। ঝুঁকি নিতে পারার ক্ষমতা গোটা পৃথিবীতে মেয়েদেরই বেশি। মেয়েরা তা প্রমাণ করেছে বহু বহু বার। ঝুঁকি নিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। কিন্তু তারপরও মেয়েদের দৃঢ়তাকে ঋজুতাকে ঘরে বাইরে সর্বত্র হত্যা করার আয়োজন করে নোংরা পুরুষতন্ত্র।

পুরুষেরা যুদ্ধ করে। যুদ্ধে জয়ী হয়ে পরাজিত সৈন্যের জিনিসপত্র লুঠ করে। ভিটেমাটি, ঘটিবাটি, বাড়ি, নারী। আদিকাল থেকে এরকমই নিয়ম পুরুষের। পুরুষ কখনও মেয়েদের আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। চিরকালই মেয়েরা পুরুষের নিজস্ব জিনিস। পুরুষেরা তাদের জিনিসগুলোকে যা ইচ্ছে তাই করে, করার অধিকার তাদের আছে বলেই মনে করে। যুদ্ধে মেয়েদের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। যুদ্ধে না অংশ নিয়েও তারা খুন হয়, ধর্ষিতা হয়, তারা উদ্বাস্তু হয়, অনাথ হয়, তারা নিঃসঙ্গ হয়, সর্বস্বান্ত হয়। যুদ্ধবাজ পুরুষের দুর্ভোগ তত হয় না, যত দুর্ভোগ পোহাতে হয় মেয়েদের। যুদ্ধে যুদ্ধে পুরুষের মৃত্যু হয়, আর যুদ্ধবাজ স্বামীর স্ত্রীরা পুত্রকন্যা নিয়ে যে দুর্ভোগ পোহায়, সেই দুর্ভোগ কে কোথায় আছে ভাগ করে!

আমি যুদ্ধবিরোধী মানুষ। পারমাণবিক বোমার মতো অমানবিক জিনিসে ছেয়ে যাচ্ছে বিশ্ব। মারণাস্ত্রের পেছনে যত অর্থ ব্যয় হয় তার অতি সামান্যই কমিয়ে দিলে আজ সারা বিশ্বের সব মানুষের খাদ্য শিক্ষা চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিন্তে হয়ে যায়। কিন্তু যুদ্ধবাজ পুরুষেরা তা করবে কেন! শান্তি শান্তি বলে কম চিৎকার তো হচ্ছে না। বিশ্বময় যত অশান্তিই পুরুষ করুক, শান্তি পুরস্কার পুরুষেরই জোটে। শান্তির জন্য তারা করেনা কিছুই। আজকাল অবশ্য শান্তি পুরস্কারও হয়ে গেছে পুঁজিবাদের পোষ্য। দরিদ্রকে ঠকিয়ে ঠেঙিয়ে নির্বিঘ্নে ধনসম্পদ গড়ে তুলতে পারলেও শান্তি পুরস্কার হস্তগত হয়। পুরুষেরা পছন্দ করে অস্ত্র, মারণাস্ত্র, পছন্দ করে যুদ্ধ। হিংসা। পছন্দ করে রক্তপাত।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডুয়াইট ডেভিড আইসেনহাউয়ারকে আমি পছন্দ না করতে পারি, কিন্তু তাঁর এই কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে মানি— 'প্রতিটি বন্দুক তৈরিতে, প্রতিটি যুদ্ধ ঘটাতে, প্রতিটি রকেট ওড়াতে, যে টাকার দরকার হয় তা তাদের কাছ থেকে চুরি করা যারা ক্ষুধার্ত, যাদের খাবার নেই, যারা ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে, যাদের কাপড় নেই।'

সেদিন রবীন্দ্রসদনে, নন্দন চত্বরে হাঁটছিলাম। রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে দেখি নৃত্যানুষ্ঠান। কয়েক হাজার দর্শক। আর খানিক দূরেই পাঁচ ছজন বসে আছে মানবাধিকার সংস্থার আয়োজনে সিঙ্গুরে পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদ সভায়। দেখে মন খারাপ হল খুব। নাচে গানে এত লোক, প্রতিবাদে নেই! মানবাধিকারে নেই! মানুষের জন্য কি মানুষ আর তবে কাঁদে না? পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, তারপরও বলবো, অন্তত এই সিঙ্গুর প্রসঙ্গে একজোট হয়েছে, কথা বলছে। সকলে শান্তি চায়। সকলে না হলেও অন্তত অধিকাংশ মানুষই চায়। দরিদ্রর ওপর অত্যাচার কে চায় অতি নিষ্ঠুর ছাড়া! আমার ভাবতে ভালো লাগে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সকলে সহৃদয়।

দুরকম যুদ্ধ আছে জগতে। একটি শোষকের, শোষিতের বিরুদ্ধে। আরেকটি

শোষিতের, শোষকের বিরুদ্ধে। আমি দ্বিতীয়টিকেই বরাবার সমর্থন করে এসেছি। তাই শত বিপদেও শোষিতের পক্ষে দাঁড়াই। শোষণ চাই না বলে দাঁড়াই। অধিকার চাই বলে, স্বাধীনতা চাই বলে দাঁড়াই। বৈষম্য চাই না, অনাচার চাই না। শান্তি চাই। যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি সহজ শান্তি সৃষ্টি করা। কিন্তু সহজ কাজটিই দেখা যায় করা হচ্ছে না। সহজ কাজেই জটিল কুটিল মানুষের আপত্তি। সহজ কাজেই অস্ত্রধারীদের আপত্তি। ক্ষমতা যাদের হাতে, শকুনে খেয়ে ফেলে তাদের চোখ, অক্ষমদের দিকে ফিরে তাকানোর মানবিক চোখ।

ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার বলেছিলেন অস্ত্রের জোরে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে কব্জা করা সহজ, কিন্তু একটি ছোট্ট গ্রামের মনকে নয়। 'ইট উড বি ইজিয়ার টু সাবজুগেট দ্য এন্টায়ার ইউনিভার্স থ্রো ফোর্স দেন দ্য মাইণ্ডস অব আ সিঙ্গল ভিলেজ।' ভলতেয়ারের এই কথাটি আমাকে সিঙ্গুরের মানুষের কথা আরও বেশি মনে করিয়ে দিচ্ছে। হয়তো সিঙ্গুরে টাটার কারখানা হবে। মানুষ ভুলেও যাবে সিঙ্গুরের মেয়েদের অনশনের কথা, ভুলে যাবে তাদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের কথা। কিন্তু ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট মনটি হয়তো চিরকালই মনে রাখবে তার মন খারাপের কথা। ইতিহাস যারা রচনা করবে ভবিষ্যতে, তাদের মনে হয়তো মোটেও দাগ কাটবে না এই মন খারাপের ঘটনা। তারা বাদ দেবে অসম্ভব তেজ ও দৃঢ়তা নিয়ে মেয়েদের সামনে এগিয়ে আসার ঘটনা, অনশন করা, প্রতিবাদে মুখর হওয়া, নিজের অধিকারের পক্ষে ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। ইতিহাস তো রচনা করে পুরুষ। নারীবিদ্বেষী এই সমাজের পুরুষেরা যারা শেখেনি মেয়েদের সম্মান করতে, তারা কি আর কোথাও মেয়েদের স্মরণ করবে, সম্মান দেবে! ইতিহাসের পাতা থেকে বিচ্যুত হবে মেয়েরা, বিস্মৃত হবে মেয়েরাই।

দেশপ্রেম দেখায় বড় বড় রাজনীতিবিদরা। দেশপ্রেম দেখায় বড় বড় বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু অসত্য মেনে নিতে এদের মতো পারদর্শীও বুঝি কেউ নয়। রুজভেল্ট নিজে প্রেসিডেন্ট হয়েও একদিন বলেছিলেন, 'ইট ইজ আনপেট্রিওটিক নট টু টেল দ্য ট্রুথ, হোয়েদার অ্যাবাউট দ্য প্রেসিডেন্ট অর এনিওয়ান এলস। তোমার দেশপ্রেম বলতে কিছু নেই যদি তুমি সত্য লুকিয়ে রাখো, সে সত্য যে কোনও মানুষ সম্পর্কে বা দেশের প্রেসিডেন্ট সম্পর্কেই হোক না কেন।' নাচ হচ্ছে। সরকারি কবিতা উৎসব হচ্ছে। যোগ দিচ্ছে উৎসবে অগুনতি কবি। কবিরা মহানন্দে মহাসুখে পড়ছে প্রেম বিরহের কবিতা। অথচ তার পাশ দিয়েই তখন যাচ্ছে সিঙ্গুর নিয়ে প্রতিবাদের মিছিল। বড় বড় কবিরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। কুলুপ খুললে আবার না কিছু ক্ষতি হয়ে যায়। তারা ওই সিঙ্গুরের অনশন রত মেয়েদের চেয়েও কি বেশি কিছু হারাবে? ওদের চেয়ে বেশি ক্ষতি কি শহুরে সম্ভ্রান্ত কবিকুলের কোনওদিন হবে?

ভলতেয়ার সেই কত আগে বলেছিলেন, 'ইট ইজ ডেনজারাস টু বি রাইট হোয়েন দ্য গভরমেন্ট ইজ রং।' আজও আমরা দেখি, প্রতিনিয়তই দেখি এর সত্যতা। জীবনের ঝুঁকি চারদিকে মেয়েরাই নিচ্ছে। অনশনে মেয়েদেরই মৃত্যু হবে। পুরুষ হয়তো অনশন ভাঙবে। মেয়েরা ভাঙবে না। এমন নিটোল নির্ভীক সৎ সাহসী মেয়েরা যদি রাজ্য বা রাষ্ট্র বা বিশ্ব চালাতো, পৃথিবী সুন্দর হত আরও।

মেয়েদের রাগ হোক, ক্রোধ হোক

এমন একটি দিন আছে, যে দিন ধর্ষণহীন? না এমন দিন নেই। ২০০০ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, প্রতি ঘন্টায় একটি অন্তত ধর্ষণ ঘটে ভারতবর্ষে।আসলে, ধর্ষণের এই সংখ্যাটি আরও ভয়াবহ হত, যদি ধর্ষিতারা মুখ খুলতো, বলতো যে তারা ধর্ষিতা হয়েছে। ধর্ষণ যে একটি অপরাধ তা বেশির ভাগ মানুষ জানে না। ধর্ষককে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত না করে ধর্ষিতাকে করা হয়। এর চেয়ে বড় লজ্জা একটি সমাজের জন্য আর কিছু নেই। পৃথিবীতে ধর্ষণই একমাত্র অপরাধ যেখানে আক্রান্তকে বা ভিকটিমকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

আমেরিকার নারীবাদী লেখিকা মেরিলিন ফ্রেঞ্চ লিখেছিলেন, 'প্রতিটি পুরুষই ধর্ষক, এবং তাদের এই একটিই চরিত্র। তারা আমাদের ধর্ষণ করে তাদের চোখ দিয়ে, তাদের তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে, তাদের আইন দিয়ে। অল ম্যান আর রেপিস্ট এণ্ড দ্যাটস অল দে আর। দে রেপ আস উইদ দেয়ার আইজ, দেয়ার লজ, অ্যান্ড দেয়ার কোডস।'

আর আমার প্রিয় আন্দ্রিয়া ডরকিনের কথা, 'যতদিন ধর্ষণ নামক জিনিস পৃথিবীতে আছে, ততদিন শান্তি অথবা সুবিচার অথবা সমতা অথবা স্বাধীনতা কিছুই থাকবে না। তুমি আর হতে পারবে না তা, যা তুমি হতে চাও, তুমি আর বাস করতে পারবে না সেই জগতে, যে জগতে তুমি বাস করতে চাও।'

আন্দ্রিয়া ডরকিন আরও বলেছেন, 'ধর্ষণ কোনও দুর্ঘটনা নয়, কোনও ভুল নয়। পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে যৌনতার সংজ্ঞা হল ধর্ষণ। যতদিন পর্যন্ত এই সংজ্ঞা বহাল থাকবে, ততদিন পর্যন্ত যৌনআক্রমণকারী হিসেবে পুরুষ এবং তার শিকার হিসেবে চিহ্নিত হবে নারী। এই সংস্কৃতিকে স্বাভাবিক যারা মনে করে, তারা ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিদিন ধর্ষণ চালিয়ে যায়।'

কেউ কেউ বলে, ধর্ষকদের ধর্ষদণ্ডটি কেটে ফেলা উচিত। এর ফলে দ্রুত বন্ধ হবে ধর্ষকদের ধর্ষণ। বন্ধ কি সত্যি হয়? ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হবার পরদিনই ধর্ষণ হয়নি এ রাজ্যে? হয়েছে। এর কারণ কি? ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠিন কঠিন আইন আছে, তারপরও কি ধর্ষণের কিছু মাত্র বন্ধ হয়েছে। যারা বলে যে মেয়েরা স্বল্প পোশাক পরে চলাফেরা করে বলেই পুরুষেরা তাদের ধর্ষণ করতে উৎসাহী হয় — সেই

মোটামাথাগুলো খুব ভালো জানে যে, বড় বড় লম্বা লম্বা এমনকী বোরখা পরা মেয়েরাও অহরহ ধর্ষিতা হচ্ছে। পোশাক কোনও ঘটনা নয়, ঘটনা এখানে পুরুষাঙ্গ। জন্মের পর থেকে পুরুষেরা শিখে এসেছে তারা জগত জয় করতে পারে তাদের দু'উরুর মাঝখানে ঝুলে থাকা দুই বা তিন ইঞ্চি কেজো বা অকেজো জিনিসটি দিয়ে। এই শিক্ষা ইস্কুল-কলেজে রাস্তাঘাটে চাকরিস্থলে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, আইনে কানুনে, শহরে বন্দরে, রাষ্ট্রে রাজ্যে সমাজে সংসারে সবখানেই পুরুষেরা পেয়ে যায়। ঘরে বাইরে যে শিক্ষা এবং যে শিক্ষার চর্চা পুরুষেরা হাজার বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছে ক'টা পুরুষের বুকের পাটা তা থেকে নিরস্ত হয়?

বাংলাদেশে কয়েক বছর আগে একটি ঘটনা ঘটেছিল। ইয়াসমিন নামের এক মেয়ে, পনেরো বছর বয়স, ঢাকা শহরের কোনও এক মধ্যবিত্তের বাড়িতে কাজ করতো। কিন্তু বাড়ির কর্তাটি ইয়াসমিনকে রাতে রাতে ধর্ষণ করতো। ইয়াসমিন একরাতে পালালো বাড়ি থেকে। যাচ্ছে সে বাপের বাড়ির দিকে। পথে পুলিশ ধরলো। 'কোথায় যাচ্ছিস'? 'বাপের বাড়ি'। 'বাড়ি তো অনেক দূর, চল তোকে পৌঁছে দিই, গাড়িতে ওঠ।' পুলিশের গাড়ি অন্ধকার নির্জনতায় থামলো। ওখানে সাত সাতটা পুলিশ ইয়াসমিনকে মনের আশ মিটিয়ে ধর্ষণ করে, ধর্ষণ শেষে গলা টিপে মেরে ফেলে রাখলো আবর্জনার স্তূপে। এলাকার লোকেরা পরদিন মিছিল বের করলো পুলিশের বিরুদ্ধে। সেই মিছিলে গুলি ছুঁড়লো পুলিশ, সাতজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হলো। পরদিন সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তি ছিল এরকম, 'ইয়াসমিন ছিল নষ্ট চরিত্রের মেয়ে, পুলিশ যা করেছে ঠিকই করেছে।' — এরকম ঘটনা কি শুধু বাংলাদেশেই ঘটে? অন্য কোথাও ঘটে না? আমরা সবাই জানি, ঘটে। রক্ষক সারাক্ষণই ভক্ষক হচ্ছে। হবে না কেন! নারী-ভক্ষণ তো কোনও অন্যায় নয়! কোথায় লেখা আছে অন্যায়! নারী তো ভোগ্য, ভোজ্য, ভক্ষণীয়। এ কথা সকলেই জানে, মানে। পুরোহিত থেকে শুরু করে পাঁচ বছরী পুত্র জানে যে পুরুষ সর্বশক্তিমান। এবং তাদের সর্বময় অধিকার যেমন খুশি নারীকে দলন করা, দমন করা, সর্বময় অধিকার যখন খুশি ধর্ষণ করা, জ্বালিয়ে মারা, পুড়িয়ে মারা।

এই জানা মানাটি যেদিন বন্ধ হবে, সেদিনই হয়তো চিরতরে দুঃসময়ের সরে যাবার সময় হবে। নারীকে সম্মান জানানোর রেওয়াজ এই সমাজে নেই। সম্মানের যে সংজ্ঞা পুরুষেরা তৈরি করেছে, তাতে অসম্মান ছাড়া নারীর অন্য কিছু হয় না।

বিখ্যাত নারীবাদী ম্যাগাজিন সিজ-এর সম্পাদক রবিন মরগ্যান বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন ধর্ষণ সম্পর্কে। তিনি দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন, 'যে যৌন সম্পর্কটির উদ্যোক্তা নারী নয়, নারীর সত্যিকার যৌনইচ্ছে থেকে যেটি ঘটে না, সেই যৌন সম্পর্কটি ঘটা মানেই ধর্ষণ ঘটা।'

পুরুষতান্ত্রিক পরিবেশে পুরুষের ইচ্ছেয়, পুরুষের আওতায় যে যৌনসম্পর্কটি ঘটে, তাতে বৈষম্য শুধু নয়, প্রকট ভাবে অকথ্য অত্যাচার না থাকার কোনও কারণ নেই। সর্বত্র যেখানে বৈষম্য এবং পুরুষাধিপত্য, সেখানে তা থাকবেই। বন্ধ ঘরে বীভৎসতা ঘটিয়ে নাম তার লাভ মেকিং দিলেই যেন সাতখুন মাফ।

রবিন মরগ্যান বলেন, ‘রেপ ইজ দ্য পারফেক্টেড অ্যাক্ট অব মেইল সেক্সুয়ালিটি ইন এ পেট্রিআর্কাল কালচার। ইট ইজ দ্য আলটিমেট মেটাফর ফর ডমিনেশন, ভায়োলেন্স, সাবজুগেশন অ্যান্ড পজেশনস।’

না, আমাদের নারীবাদীরা এমনভাবে বলেন না। কোনওকালেই বলেননি। পশ্চিমের নারীবাদীদের হাত থেকে খুব কম ধর্ষকই বেঁচে যেতে পারে। ওখানকার নারীরা বহুকাল সংগ্রাম করেছেন এই জঘন্য ঘৃণ্য নারীনির্যাতনের বিরুদ্ধে। কাউকে ছাড় দেননি।

আজ পশ্চিমের যে দেশগুলোয় নারীরা প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে বাঁচতে পারে, সেখানে প্রেমে, যৌনতায় নারীর উদ্যোগী এবং সক্রিয় হওয়া খুব স্বাভাবিক ঘটনা। নারীই পুরুষকে পছন্দ করে প্রেমের জন্য, নারীই পুরুষকে শারীরিকভাবে কামনা করে, সেই কামনার কথা প্রকাশ করে এবং যৌনক্রিয়ায় নারীই সক্রিয় হয় বেশি।

এ দেশে নারী যত নিষ্ক্রিয় হবে, পুরুষের যৌনসাধ তত হৈ রৈ করে বাড়বে। যৌন সম্পর্কের জন্য নিষ্ক্রিয় নারীকেই পছন্দ করে পুরুষ। নারীবাদীরা বলেন, যৌন অধিকার অর্জনের কোনও দরকার নেই নারীর। দরকার শিক্ষার আর স্বনির্ভরতার। নারীবাদ দেশি ব্র্যান্ড। বটে। শিক্ষা আর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করেও যে সারাজীবন নারী থেকে যায় পুরুষের যৌনদাসী, সে কি তাঁরা জানেন না, নাকি মানেন না? নাকি তলে তলে পুরুষতন্ত্রের গোড়ায় জল সার দিয়ে তাজা রাখেন তন্ত্রটি !

নারীরা এ দেশে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে না। নারীদের কোনও অহংকার থাকতে নেই। সেই কবে ভোটাধিকার আন্দোলনের নেত্রী এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটন বলেছিলেন, ‘উই আর, অ্যাজ এ সেক্স, ইনফিনিটলি সুপিরিয়র টু ম্যান।’ ক’টা মেয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে এ কথা বিশ্বাস করে এবং বলে?

আমরা নারীরা পুরুষের চেয়ে সবদিক থেকে বড়। এ কথা বললে পুরুষ যেমন কৌতুকরসে হেসে ওঠে, নারীও হাসে। কেবল লিঙ্গে নয়, বিবেকে বুদ্ধিতে, বিচক্ষণতায়, বিদ্রোহে, বিস্ফোরণে, বীক্ষণে নারী চিরকালই পুরুষের চেয়ে ঊর্ধ্বে। কিন্তু শক্তিকে শেকলে বন্দি করে রাখা হয়েছে আজ হাজার বছর। সোজা এতকালের শেকল ছেঁড়া?

আমি মনে করি পুরুষবিদ্বেষ হল একটি সম্মানজনক রাজনৈতিক আদর্শ, যে আদর্শে অত্যাচারিতের অধিকার আছে অত্যাচারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছুড়ে দেওয়া। — ক’জন বলে এমন কথা এদেশে? এখন তো লিবারেলিজমের যুগ। যত আপোস করো, তত ভালো। যত মেনে নাও, তত তুমি সহিষ্ণু, তত তুমি শান্তিকামী। চিরকাল যারা অশান্তি করে, অশান্তি যাদের রক্তে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে, তাদের সঙ্গে কি সত্যিকার কোনও শান্তি চুক্তি হয়, না, হতে পারে?

সেই কতকাল আগে মেরিলিন ফ্রেঞ্চ ‘দ্য উইমেনস রুম’ বইতে লিখেছেন, ‘পুরুষের প্রতি আমার অনুভূতি পুরুষ নিয়ে আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত। সত্যি

কথা বলতে কী, পুরুষের প্রতি আমার কোনও সহানুভূতি নেই। ডাখাও কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এক ইহুদি যেমন কোনও তরুণ নাৎসি সেনাকে পেটে গুলি খাওয়া অবস্থায় কাতরাতে দেখে নির্বিকার হেঁটে চলে যায়, তেমন করে আমি পুরুষ দেখি। আমি এমনকী প্রয়োজনও বোধ করি না কাঁধ শ্রাগের। আমি কেয়ার করি না। মানুষ হিসেবে লোকটি কী ছিল, কেমন ছিল, তার ইচ্ছে অনিচ্ছে এগুলো আমার কাছে কোনও বিষয় নয়।'

পুরুষকে তুচ্ছ করার শক্তি এবং সাহস এ সমাজে ক'জনের হয়? তুচ্ছ না করলে পুরুষতন্ত্রের কবল থেকে মুক্তি নেই কোনও নারীর। বিয়েকেও ত্যাগ করেছিল আমাদের লড়াকু পূর্বনারীরা। সাহস আছে কারও এমন কথা উচ্চারণ করার, 'যেহেতু বিয়ে মানে নারীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি করা, নারীবাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত বিবাহপ্রথার গায়ে জোরে লাথি মারা। বিবাহপ্রথাকে নির্মূল না করলে নারী স্বাধীনতা কখনই অর্জিত হবে না।'

'না না না আমরা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছি। আমরা এগিয়ে গেছি অনেক। আমরা আমাদের প্রাপ্য অধিকার পেয়ে গেছি কত আগে। যা বাকি আছে পাওয়ার, তার জন্য পুরুষকে সঙ্গে নিয়েই লড়াই করবো।' 'সচেতন' বলে বড়াই করা নারীরাই বলছেন এমন কথা। নারী-পুরুষ উভয়কেই নারীর অধিকারের জন্য লড়তে হবে — এই মত নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় সকলের। কিন্তু ধর্ষককে সঙ্গে নিয়ে সত্যি কি লড়াই করা যায়? দুই বা তিন ইঞ্চি জিনিসটি নিয়ে অহংকার এমন কোনও পুরুষ আছে করে না? যে পুরুষ নিজেদের নারীবাদী বলে, তারাও সময় সময় উরুসন্ধিতে হাত রেখে জিনিসটির উপস্থিতি পরখ করে নেয়। ধর্ষকের জাতকে বিশ্বাস করেছো কী মরেছো।

কী ব্যাপার, জাত নিয়ে কথা? হ্যাঁ জাত নিয়েই কথা। পুরুষেরা আলাদা জাত। তারা মনুষ্যজাত থেকে ভিন্ন। এমন কথা প্রচণ্ড রাগ করেও কেউ বলে না এ সমাজে। মেয়েদের রাগ টাগ কি একেবারেই গেল? রাগের মাথায় তো অনেক কিছু করছে মেয়েরা, রাগের মাথায় ধর্ষকের ধর্ষদণ্ড কেন কেউ কেটে নেড়িকুত্তা দিয়ে খাওয়াচ্ছে না? ক্রোধে রাগে কেন উচ্চারণ করছে না সত্য, যে সত্য মুখে এসে গেলেও মেয়েদের গিলে ফেলতে হয়! গিলে ফেলেছে হাজারবছর। এখনও?

এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষ — নারীর সমস্যার এ কি কোনও সমাধান?

রাজস্থানের কোর্টের রায় শুনে আমি নিজেই খানিকটা চমকে উঠেছিলাম। প্রচণ্ড নারী-বিরোধী ঐতিহ্য আর সনাতন সংস্কৃতি যেখানে রমরমা, কী করে রাজস্থানের মতো একটি রাজ্যে, যেখানে নারীর স্বাধীনতা অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় অনেক কম, ঘোষিত হয় এই রায়, যে, স্বামীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত মেয়ে প্রেমিকের সঙ্গে বসবাস করার অধিকার রাখে! অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনাটি ঘটেছে। মঞ্জু নামের মেয়ে এখন বাস করছে তার প্রেমিক সুরেশের সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে নয়। হাই কোর্টের দুজন বিচারক জিসি মিশ্র এবং কেসি শর্মা এই রায় দেন, যে, মেয়েদের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করার অধিকার থাকা কারওরই উচিত নয়।

বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির গায়ে এই রায় বড় একটি আঘাত বটে। কোনও প্রতিষ্ঠানই এতকাল এত মারমার কাটকাট চলেনি, বিবাহ যেমন চলেছে। কোনও প্রতিষ্ঠানে চিড় ধরে, ভাঙে, আবার হয়তো টিমটিম করে কিছুদিন জ্বলে, একসময় ধপ করে নিভে যায়। বিবাহের টিমটিম নেই, নিভে যাওয়া নেই। হিপি আমলে সেই ষাটের দশকে একবার লালবাতি জ্বলেছিল বটে, সেও পুবে নয়, পশ্চিমে। পশ্চিমের ছেলে মেয়েরা বিয়ে করা বন্ধ করেই দিয়েছিল। সেই লালবাতি আশির দশকে এসে সুবজ হতে শুরু করলো। রক্ষণশীলতা পা পা করে ইওরোপের দিকে দৈত্যের মতো এগোলো। পুবে তো দৈত্যদের বরাবরই জয়জয়কার।

এই পুবে, এই ভারতবর্ষে বসে কিনা আজ শুনছি আদালত বলছে, 'কোনও মেয়েকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কারও সঙ্গে বাস করার জন্য জোর করা উচিত নয়।' সময় যেন হঠাৎ করে একশ বছর এগিয়ে গেছে। আসলে তো কিছুই এগোয়নি। রায়টি বরং এই সমাজের চরিত্রের সঙ্গে বড্ড বেমানান। দেশের কোনও একটি আদালতে কোনও এক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিচারক হঠাৎ একটি চমৎকার রায় দিয়ে দিলেন, এই সমাজের কিছুর সঙ্গেই যে রায়টি মেলে না, তাতে নেচে ওঠার কিছু কি আছে? যে মঞ্জু আজ প্রেমিকের সঙ্গে বাস করছে, সেই মঞ্জু কি আদৌ একফোঁটা স্বস্তিতে আছে? তাকে লোকেরা অকথ্য ভাষায় দিন রাত্তির গালি গালাজ করছে না? সামনে পেলে পিটিয়ে তার লাশ ফেলে দেবে, হুমকি দিচ্ছে না? নষ্ট মেয়ে, খারাপ মেয়ে, অসতী, বেশ্যা এসব কি উঠতে বসতে বলছে না? আমরা খুব সহজে অনুমান করতে পারি,

যে, ভয়ংকর নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কুঁকড়ে আছে মঞ্জু। এ অবস্থায় সে নিশ্চয়ই সামান্যও উপভোগ করতে পারছে না তার প্রেমের জীবন। সুরেশের প্রেমও কি বেশিদিন টিকে থাকবে! অন্যের 'বিয়ে করা' বউকে ঘরে তোলার জন্য তাকে কি কম বিদ্রুপ সইতে হচ্ছে! পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন নিশ্চয়ই ছি ছি করছে। মানুষ আর কদিন বাস করতে পারে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, আর ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মধ্যে? মেয়েরা না হয় পারে, অভ্যেস আছে। সারাজীবন এসব সইতেই তাদের সারাজীবন শেখানো হয় । কিন্তু পুরুষ তো বুক ফুলিয়ে চলার জন্য যা দরকার সবই করবে। পুরুষ-সুরেশ অসুবিধে দেখলে প্রেমিকের খোলশ থেকে যে কোনও মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে। সুরেশ যদি ত্যাগ করে মঞ্জুকে? মঞ্জু তখন কার আশ্রয়ে যাবে? হয় স্বামী-পুরুষটির কাছে ফিরে যাবে, নয়তো অন্য কোনও নতুন প্রেমিক-পুরুষের আশ্রয়ে। এছাড়া আর কী!

নারীর সমস্যার এ কি সত্যিই কোনও সমাধান, যখন তাকে এক পুরুষের আশ্রয় থেকে আরেক পুরুষের আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হতে হয়? তার চেয়ে নারীর যদি কারও আশ্রয়ের প্রয়োজন না হত, নিজেই নিজের জন্য সে যথেষ্ট হত! কারও করুণার তোয়াক্কা না করে যদি সে বেঁচে থাকতে পারতো, নিজের আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে, দুর্বিনীত এবং দুঃসাহসী!

যে সমাজে একটি মেয়ের শিক্ষা , স্বাস্থ্য, সম্মান কিছুই জরুরি বিষয় নয়, মেয়ের ইচ্ছের কোনও মূল্য নেই, অন্যের ইচ্ছেয় বিশেষ করে পুরুষের ইচ্ছেয় জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যাপন করতে হয় একটি মেয়েকে, সেখানে কোনও একটি রাজ্যের আদালতের রায় একটি মেয়ের জীবনের কী এমনই-বা পরিবর্তন করতে পারে! সমাজ তো আছে আগের মতোই, আগের মতোই নারীবিদ্বেষী।

তলিয়ে দেখলে মঞ্জুর তার স্বামীর কাছে থাকা, বা প্রেমিকের কাছে থাকা — একই জিনিস। দুজায়গাতেই সে আশ্রিতা। দুজায়গাতেই তাকে নিঃশর্তভাবে নিবেদন করতে হবে তার সর্বস্ব। পুরুষদের ইচ্ছে হলে মঞ্জুকে লাথি দেবে, ইচ্ছে হলে চুমু। মঞ্জুর বর্তমান ভবিষ্যত সবই নির্ভর করবে পুরুষের চরিত্র আর মেজাজ মর্জির ওপর। একটি মেয়ের জীবনে এর চেয়ে নিরাপত্তহীনতা আর কী আছে? মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে বড় নিরাপত্তাহীনতাটির নাম 'পুরুষ'। পুরুষ যত ক্ষতি করতে পারে নারীর, পৃথিবীতে আর কেউ তত পারে না।

নারী যতদিন নিজের জন্য নিজের আশ্রয় না হয়, ততদিন নারী নিশ্চিতভাবেই নিরাপত্তাহীন। অনেকে, জানি খুব রুষ্ট হয়ে বলবে যে, সব পুরুষ তো মন্দ নয়, কত তো ভালো পুরুষ আছে। আছে, সে আমিও জানি। এই যে পুরুষের ভালোত্বের ওপর নারীকে নির্ভর করতে হবে, সেও তো এক অসহায়তা নারীর। পুরুষের ভালোত্ব যতদিন টিকে থাকে, ততদিন নারী নিরাপদ। মন্দ পুরুষ থেকে অমন্দ পুরুষে যাওয়া, সেই অমন্দ পুরুষ থেকে আরও অমন্দ পুরুষে, চরকির মতো পুরুষের দ্বারে দ্বারে কোলে কোলে ঘোরাই কি নারীর কম্ম? কেবল পুরুষের মন্দত্ব আর নির্মমতা নিষ্ঠুরতা অত্যাচার অনাচার থেকে নয়, পুরুষের ভালোত্ব, পুরুষের দান দক্ষিণা দয়া, পুরুষের করুণা কৃপা থেকে নিজেকে বাঁচানোও কিন্তু নারীর জন্য অত্যন্ত জরুরি। পুরুষের নিষ্ঠুরতার চেয়ে কম

নিষ্ঠুর নয় পুরুষের করুণা বা কৃপা। এগুলো নারীকে মুগ্ধ আর মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। নারী প্রতিবাদ করার ভাষা হারিয়ে ফেলে। বোবা বোকা বধির হয়ে পুরুষের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, আরও বেশি মেগালোম্যানিয়াক মনস্টার করে তোলে ওদের।

নারী কবে সহায় হবে নিজের! নারীর কবে আর প্রয়োজন পড়বে না কোনও পুরুষের কৃপার বা করুণার। সেই দিনের স্বপ্ন আমি দেখি। স্বপ্ন দেখি নারী পুরুষের সম্পর্ক বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পরস্পরের সঙ্গে শ্রদ্ধার যে সম্পর্ক, সে রকম।

মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ নেই বলেই শ্রেণী বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতার মতো কুৎসিত জিনিস দীর্ঘ দীর্ঘ বছর ধরে টিকে আছে। দিন যত যাচ্ছে, মানুষ যত শিক্ষিত হচ্ছে, বিজ্ঞানের উন্নততর সুবিধে যত গ্রহণ করছে, তত উবে যাওয়ার কথা তাবৎ বৈষম্য, কিন্তু হচ্ছে উল্টোটি। মানুষ যেন আরও বেশি ধর্মান্ধ হচ্ছে, আরও বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আরও বেশি সংকীর্ণ।

প্রাণীজগতে নারীই একমাত্র, যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে বাস করে তার অত্যাচারীদের সঙ্গে। আর কোন্ প্রাণী তার অত্যাচারীকে প্রেম দেয়, সেবা দেয় নারী যেমন দেয়? নারীর সবচেয়ে সমস্যা যে তারা বুঝতে পারে না এবং তাদের বুঝতে দেওয়া হয় না যে পুরুষ তাদের আশ্রয় হওয়ার অর্থ নারীর কোনও সমস্যার সমাধান হওয়া নয়। পুরুষ আজ হয়তো আশ্রয় দিল, কাল দেবে না। আজ ভালোবাসলো, কাল বাসবে না। আজ বলবে তুমি সুন্দর, কাল বলবে তুমি কুৎসিত। আর যাকেই বিশ্বাস কর নারী, পুরুষকে কোরো না।

কোনও পুরুষ যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়ও, তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে রাখার জন্য নারীকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়। বেশির ভাগ সময়ই সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েও কোনও কিছু অর্জন হয় না নারীর। সামান্য অনুকম্পাও জোটে না অনেকের। এবং এটিকে কারও মনে হয় না অন্যায়।

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষের অভাব বড় প্রকট। পুরুষরা রাজনীতিতে অর্থনীতিতে জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে বাণিজ্যে কর্তব্যে বিরাট বিরাট অবদান রাখছেন, সমাজে নমস্য তাঁরা, তাঁরাও কিন্তু ঘরে এসে স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, নয় অন্য নারীসঙ্গে মেতে স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, নয় স্ত্রীকে স্রেফ নিজের সেবাদাসী হিসেবে ব্যবহার করেন। কাকে তবে বিশ্বাস করা যায়! যদি নমস্যদেরই না যায়!

আসলে সত্যি কথা কী, বিশ্বাস জিনিসটি লটারির মতো। তুমি জানো না কাকে করা উচিত কাকে নয়। কে ঠকাবে, কে ঠকাবে না। নারীকে মানুষ হিসেবে যেহেতু পুরুষ শ্রদ্ধা করে না, তাই শেষে গিয়ে নারীকে ঠকতেই হয়। এবং এটিকে অতি স্বাভাবিক একটি ব্যাপার বলেই ভেবে নেওয়া হয়। কেউ অবাক হয় না। নারী যে এত ঠকে, এত মার খায়, তারপরও পুরুষকেই বিশ্বাস করে, পুরুষের কাছেই আশ্রয় চায়।

নারী যদি নিজেকে বিশ্বাস না করে, তবে চিরকালই যুক্তিহীন-বুদ্ধিহীনের মতো পুরুষকে বিশ্বাস করা ছাড়া আর তার উপায় কী আছে। নারী তার সারা জীবন তার নির্বুদ্ধিতার জন্য যত শাস্তিই পায়, সবচেয়ে বড় শাস্তি তার এটিই যে পুরুষকে বিশ্বাস করতে হয়।

মাথায় প্রবলেম না থাকলে সব নারীরই নারীবাদী হওয়ার কথা

১.

আজ থেকে সতেরো বছর আগে লিখেছিলাম বাংলা সংসদ অভিধানের কথা যে অভিধানে পুরুষ শব্দের অর্থ মানুষ কিন্তু নারী শব্দের অর্থে আর যা কিছুই থাকুক, মানুষ নেই। সতেরো বছর আগে অনেকে চোখ কপালে তুলেছিল। অনেকে অভিধান খুলে হতবাক বসে থেকেছে, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু কেউ কি বিশ্বাস করতে পারে যে এখনও অভিধানের ওই শব্দার্থ অপরিবর্তিত আছে?

২.

পুরুষ শব্দটিকে আমি নেতিবাচক একটি শব্দ বলে মনে করি। পুরুষতন্ত্র যদি নেতিবাচক হয়, তবে পুরুষ হবে না কেন? পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই যে হাজার হাজার বছর ধরে টিকে আছে — কই এই ব্যবস্থাকে ভাঙার জন্য চেষ্টা তো পুরুষেরা করেনি। পুরুষেরা চাইলেই এই তন্ত্রটিকে নির্মূল করতে পারতো। সাম্যের জন্য, সমতার জন্য তারা পুরুষতন্ত্রকে গুড়িয়ে উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করতে পারতো, করেনি। পুরুষ — এই শব্দটিকে আমি ব্যবহার করতে চাই, অবিবেচক, অনুদার, অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর, স্বার্থান্ধ, লোভী, লোলুপ, হীনমন্য, হিংসুক-এর সমার্থক শব্দ হিসেবে। তাদেরকে আমি পুরুষ বলে গালি দিতে চাই। সেই ছেলে এবং সেই মেয়েদেরও গালি দিতে চাই, যারা ওই চরিত্রের অধিকারী। গালি দিতে চাই এই বলে, 'ছি ছি ছি তুমি এত কুৎসিত, এত কৃপণ, এত পচা, এত পুরুষ কী করে হতে পারলে!'

৩.

পুরুষেরা এখনও কলকাতার শিক্ষিত, স্বনির্ভর মেয়েদের কর্তা। মেয়েরা পার্টিতে আসছে, মদ্যপান করছে, নাচছে, আর বলছে 'আমার কর্তা আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন। এত স্বাধীনতা খুব বেশি মেয়ে পায় না।'

কৃতজ্ঞতায় স্বনির্ভরের মুখ চিকচিক করে। মনে মনে বলি, স্বাধীনতা তোর জন্মগত অধিকার। তোর জিনিস তোর কাছে থাকবে। পুরুষ তা দেবার কে?

পুরুষেরা মাথায় উঠেছে নারীর। নারীও বেশ পুরুষদের তেলিয়ে লেলিয়ে মাথায় ওঠায় সাহায্য করেছে। নারীর মাথায় বসে পুরুষেরা মাথা খায় নারীর। কুটকুট করে

পোকার মতো খায়। পোকা হয়ে ঢুকে যায় ভেতরে। মস্তিষ্কের সর্বনাশ করে। নারী কেন নিজেদের মাথা থেকে জোর ঝাঁকানি দিয়ে পুরুষদের নামিয়ে দেয় না? বলতে পারে, 'পাশে থাকো, পিছনে থাকো, কিন্তু মাথায় ওঠো না।' বলে কি?

৪.

আমাকে অনেকে, এমনকী নারীরাও বলে, 'আপনাকে যে লোকেরা নারীবাদী বলে, আপনি প্রতিবাদ করেন না কেন?'

অবাক হয়ে বলি, 'প্রতিবাদ করবো কেন? আমি তো নারীবাদে বিশ্বাস করি।' শুনে মন খারাপ হয়ে যায় অনেকের। তাদের বলি, 'আমি মানববাদে বিশ্বাস করি বলেই নারীবাদে বিশ্বাস করি। নারীবাদী না হয়ে মানববাদী হওয়া যায় না। কী করে হব, মানবের ওপর নির্যাতন দেখে চুপ করে বসে থেকে মানববাদী হওয়া তো সম্ভব নয়।'

'নারীরা হয় ফেমিনিস্ট, নয় তারা ম্যাসোকিস্ট, নিজেকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায় — যে কোনও একটি', একজন নারীবাদী বলেছিলেন। আমারও তাই বিশ্বাস। ম্যাসোকিস্ট যদি তুমি না হতে চাও, তবে তুমি ফেমিনিস্ট হবে। হবেই। আমি পুরুষ এবং পুরুষ শাসিত সমাজ দ্বারা নিজেকে নির্যাতিত হতে, নিষ্পেষিত হতে, পিষে মারতে, পুড়িয়ে মারতে রাজি নই। সে কারণে আমি নারীবাদী।

নারীবাদী সে মানুষটিই, যে নারী এবং পুরুষ দুজনকে সম্পূর্ণ মানুষ বলে মনে করে এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা এবং সমানাধিকারে বিশ্বাস করে।

নারীবাদের মতো সহজ সরল সাধারণ জিনিসটি সম্পর্কে বেশির ভাগ মানুষের ধারণা নেই। নারী পুরুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতার পক্ষে থাকাই তো নারীবাদ। খুব কি কঠিন জিনিস এটি না বোঝার?

নারীবাদ বা ফেমিনিস্ট শব্দের ওপর রাগ বহু মানুষের, কেবল দক্ষিণের দেশগুলোয় নয়, উত্তরের দেশেও। ওসব দেশে ফেমিনিস্ট শব্দটি বদলে অন্য কোনও শব্দ, যে শব্দে কোনও কালিকালিমা নেই, ব্যবহারের প্রস্তাব এসেছিল কারও কারও কাছ থেকে। নতুন কোনও নাম দিলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে! না হবে না। নারীবাদ শব্দটি নিয়ে আসলে লোকের ভয় নয়, লোকের ভয় নারীবাদের অ্যাকশনে। একটি মেয়ে নিজেকে সে নারীবাদী বলুক না বলুক, তার অধিকার অর্জন করার জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে, এই ব্যাপারটি খুব ভয়ঙ্কর।

রেবেকা ওয়েস্ট, একজন ব্রিটিশ লেখক, বলেছিলেন, 'নারীবাদ কী, তা সত্যিকারভাবে আমার জানা নেই। আমি শুধু জানি যখনই আমি আমার ভেতরের আমিকে প্রকাশ করি, আর তা আমাকে পা মোছার পাপোশ বা বেশ্যা থেকে আলাদা করে, তখনই লোকে আমাকে নারীবাদী বলে ডাকে।'

লেখক ডেলভ স্পেনডার লিখেছিলেন, নারীবাদ কোনও যুদ্ধ করে না, বিরোধীপক্ষকে খুন করে না, কোনও কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নির্মাণ করে না, শত্রুকে না খাইয়ে মারে না, কোনও নিষ্ঠুরতা করে না। নারীবাদের দাবি শিক্ষার জন্য, ভোটের

জন্য, কাজ করার উন্নততর পরিবেশের জন্য, রাস্তাঘাটে নিরাপত্তার জন্য, সোশাল ওয়েলফেয়ারের জন্য, নারী শরণার্থীর জন্য, নারীবিরোধী আইন সংশোধনের জন্য..। কেউ যদি বলে 'আমি নারীবাদী নই', প্রশ্ন করি, 'হোয়াট ইজ ইওর প্রবলেম?'

মোদ্দা কথা, মাথায় প্রবলেম না থাকলে সব নারীরই নারীবাদী হওয়ার কথা।

নারীবাদের সংজ্ঞার শেষ নেই। নারীবাদ একটি রাজনৈতিক থিওরি এবং প্র্যাকটিস যা সকল নারীকে মুক্ত করার সংগ্রামের জন্য লিপ্ত। সকল নারী? হ্যাঁ, কালো বাদামি হলুদ ইত্যাদি রঙের নারী, খেটে খাওয়া নারী, দরিদ্র নারী, পঙ্গু নারী, সমকামী নারী, বৃদ্ধ নারী, শুধু তাই নয়, সাদা, ধনী, অসমকামী নারী।

নারীবাদের আরেকটি সরল সংজ্ঞা হল, নারীরা মানুষ এই কথাটা জোর দিয়ে বলা। 'ফেমিনিজম ইজ আ র‍্যাডিক্যাল নোশন দ্যাট উইমেন আর হিউমেন বীংস।'

এই সরল সংজ্ঞাটি তাদের কাছেই কঠিন মনে হয়, যারা নারীকে মানুষের সম্মান দিতে রাজি নয়।

৫.

নারীরা হচ্ছে অত্যাচারিত মানুষদের মধ্যে একমাত্র দল, যারা খুব ঘনিষ্টভাবে নিজেদের অত্যাচারকারীর সঙ্গে বাস করে। নারীবাদীরা যুগে যুগে অনেক কথা বলেছেন, ইতিহাসে যার খুব কমই উল্লেখ আছে। পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সব অঞ্চলের পুরুষেরা চরিত্রগতভাবে এক এবং অভিন্ন। নারীবাদীরা যে অঞ্চল থেকে যে কথাই বলুন, সব অঞ্চলের নারীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মেলে।

পুরুষেরা তাদের দুর্বলতার জন্য ক্ষমা চায়, নারীরা চায় তাদের সবলতার জন্য। পশ্চিমের নারীরা বলেছেন এ কথা। পুবের নারীরা কি জানে না তা!

পুরুষের জন্য সবল হওয়া স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। নারীর জন্য ঠিক উল্টোটি। নারীকে দুর্বল হওয়া মানায়, নারী সবল হলে এটা তার গুণ নয়, দোষ। এই হল সমাজ, যেখানে আমরা বাস করি। নারীকে বলা হয় পিসফুল আর প্যাসিভ। এটা নাকি নারীর জন্মগত। না, ওসব নারীর জন্মগত নয়। নারী সম্পূর্ণ মানুষ, এটিই কেবল নারীই জন্মগত, অন্য কিছু নয়।

নিজে আমি মানসিকভাবে খুব সবল, অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর, এবং নৈতিকভাবে স্বাধীন মানুষ। এটি এই ঘটনাটি পুরুষের কিছুতেই পছন্দ নয়। পুরুষ চায় নারীকে দুর্বলরূপে দেখতে। পুরুষ নারীকে হাতের মুঠোয় চেপে, পায়ের তলায় পিষে যে আনন্দ পায়, সে আনন্দ অন্য কিছুতে পায় না।

ব্যক্তিগত জীবনে পুরুষের আধিপত্য আমি বরদাস্ত করতে রাজি নই বলে একা থাকি। নারী যদি নিজেকে কষ্ট দিতে না চায়, তবে সে নারীবাদী। আর নারীবাদী হলে নিজের জন্য ঘর খুব জরুরি। সেই কতকাল আগে ১৯২৮ সালে ভার্জিনিয়া উলফ লিখেছিলেন খুব জরুরি একটি বই, 'এ রুম অফ ওয়ানস য়োন', নিজের জন্য একটি ঘর। নিজের জন্য ঘরের প্রয়োজন সব নারীর। পশ্চিমের নারীরা নিজের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। সমাজ এখন তাদের আর জুজুর ভয় দেখায় না। কিন্তু সমাজের

রক্তচোখ এই ভারতবর্ষের মেয়েদের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যে মেয়েরা সিঁটিয়ে আছে ভয়ে, এত ভয়ে যে নির্যাতনকারী পেষণকারী অসভ্য নির্লজ্জ নিষ্ঠুর পুরুষদের বিপক্ষে মুখ খুলতে পারে না। এদের সরিয়ে তো দিতেই পারে না নিজের চৌহদ্দি থেকে, বরং আদরে আহ্লাদে মাথায় তুলে রাখে, জীবনভর পোষে।

যেদিন থেকে আমি একা বাস করছি, সেদিন থেকে আমার জীবনের মূল্য আমি টের পেয়েছি। পুরুষের সঙ্গে বাস করলে টের পেতাম না। পুরুষের জীবনই প্রধান হয়ে উঠতো। এ সমাজে নারীর জীবন পুরুষের জীবনের তুলনায় মূল্যহীন, অর্থহীন। অত্যাচারীর সঙ্গে বাস করলে নারী তার জীবনের মূল্য অনুধাবন করার সুযোগ সময় কোনওটাই পাবে না। নারীকে তো দিনভর ব্যস্ত থাকতে হয় পুরুষ-সেবায়, পুরুষ-দেহতৃপ্তিতে, পুরুষ-মনোরঞ্জনে।

আমি কেন একা থাকি? এর উত্তরে আমি বলবো, কারণ আমি ম্যাসোকিস্ট নই। আমি ভুগতে চাই না। পুরুষ পায়ের তলায় আমাকে সুযোগ পেলেই পিষুক, চাই না। বাইরে পিষছে, পিষতে চাইছে। যেন ঘরে তা না হয়। কোনও সম্পর্কের ছুতোয় যেন তা না হয়। একত্রবাসের মতো তথাকথিক রোমান্টিক জীবনের ছুতোয় যেন না হয়।

লিজ উইনস্টেড, উত্তর আমেরিকার এক মেয়ে বলেছিল, 'I think, therefore I'm single.' এর পর কি আরও বুঝিয়ে বলার দরকার, কেন মেয়েদের একা থাকা প্রয়োজন? ঘটে বোধবুদ্ধি কিছু থাকলে নারী কি পুরুষের সঙ্গে বাস করে? ন্যাড়া কি বেলতলা যায়?

শেষ পর্যন্ত হেরে যেতে হল

ফরাসি প্যারাট্রুপার প্রশিক্ষককে আলিঙ্গন করার অপরাধে পাকিস্তানের পর্যটন মন্ত্রী নিলুফার বখতিয়ারের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছিল মৌলবাদী গোষ্ঠী। নিলুফার আশা করেছিলেন শাসক দল পিএমএল-কিউ তঁার পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু কেউই পাশে দাঁড়ায়নি। দল এবং সরকারের কাছে যে সমর্থন আশা করেছিলেন তা পাননি নিলুফার।

নিলুফারের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হবার পরদিনই ভারতের এক টিভি চ্যানেল এ নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আলোচনায় অংশ নেওয়া মানুষগুলো এক এক দেশে, এক এক অঞ্চলে। কিন্তু টেকনোলজি সবাইকে এক জায়গায় এনে জড়ো করেছিল। পাকিস্তানের আসমা জাহাঙ্গীর, মানবাধিকারের জন্য দীর্ঘকাল আন্দোলন করছেন, ফতোয়ার শিকার নিলুফার বখতিয়ার, এবং এদিকে ভারত থেকে আমি। আসমা জাহাঙ্গীর বলেছেন, 'প্রতিদিনই মেয়েদের বিরুদ্ধে এরকম ফতোয়া দেওয়া চলছে পাকিস্তানে, আজ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে হল বলেই মিডিয়া ফলাও করে প্রচার করছে এবং সে কারণেই চারদিকে হৈ চৈ।' নিলুফার বলেছিলেন, 'এ কিছু না, ছোট্ট একটি গোষ্ঠী ফতোয়া দিয়েছে, এদের কেউ চেনে না, এদের কথার কোনও দাম নেই। ফতোয়ার তো নেইই। সাধারণ মানুষ এদের ফুঁ মেরে উড়িয়ে দেবে। আমার সমর্থনে আমার দল আছে, সরকার আছে, জনগণ আছে। আমি যা করেছি তা আবারও করবো।'

সে আলোচনায় আমি কিন্তু বলেছিলাম, 'ছোট দল ভেবে এদের কিন্তু তুচ্ছ করা উচিত নয়। কারণ, ফতোয়ার পেছনে যে ভয়ংকর শক্তিটি কাজ করে, তা হল ধর্ম। যত ছোটলোকই ফতোয়া জারি করুক না কেন কোনও মেয়ের বিরুদ্ধে, ধর্মের সায় আছে বলেই সেই ফতোয়াকে সব ব্যাটাই সমর্থন করবে, পুরুষতন্ত্রের রাঘব বোয়ালেরা মহানন্দে মাথা নাড়বে। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার ব্যবস্থা না করলে, সমানাধিকারের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন না হলে, মৌলবাদী-উৎপাদনের নিমিত্ত মাদ্রাসা-শিক্ষা বন্ধ না হলে, নারীর শিক্ষা এবং স্বনির্ভরতার ব্যবস্থা না হলে, সর্বস্তরে নারীর ক্ষমতায়ন না হলে ফতোয়াবাজরা নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাবে। নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে, মানবাধিকার এবং

মানবতার জয় চাইলে ধর্মের ব্যবহার বন্ধ করতেই হবে। ধর্মকে মাথায় ওঠালে মৌলবাদও মাথায় উঠবে।'

আমি বলি, ফতোয়াবাজদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে। নিলুফার বলেন, 'এদের গ্রাহ্য করার কোনও মানে হয় না।' কণ্ঠে তাঁর ছিল প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। নিলুফার বিশ্বাস করেছিলেন, ক্ষুদ্র মৌলবাদী শক্তি হেরে যাবে, তিনিই এই যুদ্ধে জিতবেন। না জেতার কোনও তো কারণ নেই, কারণ তিনি তো কোনও অন্যায় করেননি। প্যারাসুট জাম্পিংএ সফল হয়ে প্রশিক্ষককে প্রথামতো আলিঙ্গন করেছেন। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। নিলুফার ভাবতেও তো পারেননি যে গ্রাহ্য আসলে মৌলবাদীদেরই করা হবে। গ্রাহ্য নিলুফারকেই করা হবে না। ক্রমাগত হুমকির মুখে পড়ে দলের, সরকারের, জনগণের কারও সমর্থন না পেয়ে নিলুফার বাধ্য হয়েছেন ইস্তফা দিতে। অথবা দলের বা সরকারি চাপেই তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। হেরে কে গেল? মৌলবাদীরা নাকি নিলুফার? নিলুফার হেরেছেন। অন্যায় না করেও তাকে শাস্তি পেতে হলো। নিলুফার ভেবেছিলেন, তিনি দেশের মন্ত্রী, সুতরাং তাঁর ক্ষমতা প্রচুর, কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি নারী, ভুলে গিয়েছিলেন নারী ক্ষমতাহীন। ভুলে গিয়েছিলেন যে পুরুষবাদী পুরুষের ভিড়ে তিনি কিছুই না, কিছুই না, কিছুই না। ক্ষমতা তাঁর ততটুকু, যতটুকু ক্ষমতাবান পুরুষেরা তাঁকে দিয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে এক তুড়িতে সে ক্ষমতা উঠিয়ে নিতে পারে তারা। নিলুফার ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি নারী, ভুলে গিয়েছিলেন যে কোনও যুদ্ধেই তাঁকে হেরে যেতে বাধ্য করা হবে, ভুলে গিয়েছিলেন এই জগতটা পুরুষের।

নারীরা এ কথা বারবার ভুলে যায়, বিশেষ করে কিছু সুযোগ সুবিধে পাওয়া নারী, জাতে ওঠা নারী, মসনদে ওঠা নারী। ভুলে যায় যে কোনও উচ্চতা থেকে তাদের খসিয়ে ফেলতে পারে পুরুষেরা। যে কোনও মুহূর্তে।

নিলুফার এখন মন্ত্রী নন আর। রাজা মন্ত্রী উজির নাজির সভাপতি সেনাপতি দলপতি রাষ্ট্রপতি এসব বড় বড় পদ পুরুষেরা পুরুষের জন্যই তৈরি করেছিল। মেয়েদের এই পদগুলো পাবার সুযোগ করে দিয়ে কিছু পুরুষ বোঝাতে চায় যে নারী ও পুরুষের অধিকার সমান। কিন্তু সমান যে একেবারেই নয়, তা চোখ কান খুব বেশি খোলা রাখার দরকার নেই, সামান্য রাখলেই বোধগম্য হয়।

মৌলবাদী ফতোয়াবাজরা কতটুকু শক্তিশালী হলে নিলুফারকে গদিচ্যুত করতে পারে, আমরা নিশ্চয়ই তা অনুমান করতে পারি। এবং মন্ত্রী হয়েও কোনও অন্যায় না করেও শুধু আত্মবিশ্বাস আর মনের জোর থাকার পরও কেবল নারী হওয়ার অপরাধে নিলুফারকে কীকরে গদিচ্যুত হতে হয়, তা আমরা কেবল অবলোকন করতে পারি। নিলুফারের দোষ কিন্তু কোনও পর-পুরুষকে স্পর্শ বা আলিঙ্গন করা নয়। নিলুফারের দোষ নিলুফার নারী। আজ সে নারী না হলে তাঁর কোনও স্পর্শ বা আলিঙ্গন দোষের হত না। নারী হয়ে জন্মেছেন বলেই তাকে ভুগতে হচ্ছে, আলিঙ্গন করেছেন বলে নয়। নারী হয়ে না জন্মালে দশ লক্ষ প্যারাট্রুপার প্রশিক্ষককে আলিঙ্গন করলেও কেউ ফতোয়া দিত না। নারী না হলে তাঁকে মন্ত্রীত্ব থেকে ইস্তফা দিতে হত না।

এসব আমরা দেখে আসছি অনেক বছর। আমাদের আর কোনও কি উপায় আছে কেবল প্রতিবাদ করা ছাড়া? আমাদের প্রতিবাদে কারও কিচ্ছু যায় আসে না। আজ হাজার বছর ধরে পুরুষতন্ত্রের প্রতিবাদ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা করে আসছে। তাতে কী হয়েছে? একটুও কি এই তন্ত্রে ফাটল ধরেছে? দুর্বল কিছু মানুষ সব সমাজে সব সময়ে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছে। ক্ষমতাবানরা করেনি। করলে আজ সারা বিশ্বে মেয়েদের ভুগতে হত না এই অপরাধে যে, তারা মেয়ে।

ধর্মও থাকবে, নারী স্বাধীনতাও থাকবে, এরকম যারা ভাবে তারা হয় ধর্ম কী তা জানে না, অথবা নারী স্বাধীনতার মানে জানে না। পুরুষতন্ত্র থাকবে, পুরুষ শাসিত সমাজ থাকবে, ক্ষমতা পুরুষের দখলে থাকবে, আবার নারী স্বাধীনতাও বজায় থাকবে, এসব আজগুবি কল্পনাও অনেকে করে। নিলুফারও করেছিলেন, এখন তিনি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন, যে, তাঁর অংকে ভুল হয়েছিল। তিনি বলছেন, ‘বিশ্বাস করুন আমাদের দুজনের কেউই আমাদের সংস্কৃতি বা সমাজকে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশে কিছুই করিনি। উড়োজাহাজ থেকে প্যারাসুট নিয়ে লাফ দেওয়া কোনও ধর্মবিরোধী বা কোনও দেশবিরোধী কাজ নয়।’ দেশবিরোধী কাজ নয় তা ঠিক, কিন্তু এটি ধর্মবিরোধী কাজ। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অভিভাবকহীন অবস্থায় নারীর ভ্রমণ করার কথা ধর্মের কোন গ্রন্থে লেখা আছে? নারীর তো ঘরবার হওয়াই নিষেধ, আর হলেও আপাদমস্তক আবৃত করতে হবে বোরখায়, নারীর তো পর-পুরুষের সামনে নিজের দৈহিক সৌন্দর্য প্রদর্শন করা নিষেধ। এই নিষেধ যে নারী না মানে, সে নারী ধর্মবিরোধী কাজ করে। নিলুফারকে অপরাধী বলবে অনেকে, কিন্তু কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের চোখে সে অপরাধী নয়।

এই পৃথিবীতে যেহেতু সবল এবং দুর্বল, ধনী এবং দরিদ্র, ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতাহীন প্রকটভাবে এবং প্রবলভাবে উপস্থিত, সেহেতু সম্ভবত স্বাভাবিক কারণেই খুব নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার চলে। এই অত্যাচারকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। নিরীহ পুরুষের ওপর যখন অত্যাচার চলে, শ্রেণী সংগ্রামে লিপ্ত, মানবাধিকারে জন্য লড়াই যারা করছে সকলে এগিয়ে আসে অত্যাচারিত পুরুষের পক্ষে দাঁড়াতে। কিন্তু নারীর ওপর যখন অত্যাচার চলে, তখন কিন্তু এত মানুষ এত পক্ষ এত দল এত সংগঠন এগিয়ে আসে না। নারীর ওপর অত্যাচার নারীর জন্মের পর থেকে দেখে অভ্যস্ত মানুষ। নিলুফারের মন্ত্রীত্ব নেই বলে কেউ খুব আহত হবে না। নারীর মন্ত্রীত্ব পাওয়াটা অথবা পুরুষের ওই পদ নারীর পাওয়াটাই অবাক করা ব্যাপার। নিলুফার এখন ‘পুরুষের পদ’ থেকে নেমে আসা, নারী হওয়ার অপরাধে যত শাস্তি আছে মাথা পেতে নেওয়ার অপেক্ষায় থাকা নারী। নিলুফার এখন যে কোনও সুফিয়া, শেফালি যে কোনও ঋদ্ধি, স্বাতী। মিডিয়া যাদের পেছনে দৌড়োবে না, তারা অভাবে অসুখে ধুকতে থাকলেও খবর নেবে না, পুরুষেরা প্রতিরাতে পেটালেও ফিরে তাকাবে না, তাদের নিরন্তর নিগ্রহ নির্যাতন থেকে কেউ তাদের বাঁচাবে না। কেবল ধর্ষিতা হলে,

কেবল অপঘাতে মৃত্যু হলেই দিকে দিকে খবর ছড়াবে। ঝাপিয়ে পড়বে মিডিয়া। নারীর ধর্ষিতা হওয়া বা অপঘাতে মৃত্যু হওয়া দুটোই যৌন সংবাদ। যৌন বস্তু হিসেবে নারীরা এ সমাজে চিহ্নিত। ধর্ষণের খবর ধর্ষক পুরুষদের গোপনে গোপনে উত্তেজিত করে। মৃত্যুর খবর, বিশেষ করে পুরুষ যখন নারীকে নির্মমভাবে হত্যা করে, সেটিকে খবর হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কী করে কুপিয়ে পুড়িয়ে নারীকে মারা হয়েছে, সেটির লোমহর্ষক বর্ণনাও অনেক পুরুষের জন্য সম্ভবত শিক্ষণীয় এবং আরামপ্রদ।

কোনও নারী যদি না ভুলে যায় যে সে নারী, কোনও নারী যদি না ভুলে যায় যে ধর্ম থেকে শুরু করে বিপদে আপদে তার যে বর্মটুকু আছে পরার, সেটিও নারীবিরোধী। তবেই সম্ভবত নারী তার সঠিক পথে পা ফেলতে পারবে। পুরুষের দয়া দাক্ষিণ্যে পুরুষের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে গর্বিত বোধ করার চেয়ে জোর লড়াই চালিয়ে যাবে ওই পদগুলোকে নারীর পদে রূপান্তরিত করার।

এ লড়াই কঠিন লড়াই। ধর্ম আর পুরুষতন্ত্র, পৃথিবীর বিশাল দুই শক্তির বিরুদ্ধে লড়ার চেয়ে কঠিন কাজ আর কী আছে! প্রতিটি নারীর সামনে আজ দুটো মারমুখো দৈত্য, হয় লড়াই করো নয় মরো। নারীরা আপোস করেও মরছে, লড়াই করতে গিয়েও মরছে। মরতেই যখন হবে, তখন শত্রুকে ছিঁড়ে কামড়ে মরাই ভালো।

কামড়ে খামচে মেয়েদের ‘আদর’ করছে পুরুষেরা

যে সমাজে পুরুষ নারীর কর্তা, নারীর প্রভু, নারীর নিয়ন্ত্রক, নারীর নিয়ন্তা, সেই সমাজে নারীর সঙ্গে পুরুষের যা-ই হোক, প্রেম হতে পারে না। ননীটা ছানাটা খেয়ে বড় হওয়া পুরুষ এঁটোটা কাঁটাটা খেয়ে বড় হওয়া নারীর সঙ্গে বড়জোর খুনসুটি করতে পারে, প্রেম নয়। নারীর প্রতি পুরুষের করুণা এবং পুরুষের প্রতি নারীর শ্রদ্ধাকে এ সমাজে প্রেম বলে বিবেচনা করা হয়। এই প্রেম হৃদয় এবং শরীর দুটোকেই ঢেলে দেয় তথাকথিত যোগ্য বা অযোগ্য পাত্রে। নারীর হৃদয় নিয়ে পুরুষ যা করে, তা অনেকেরই জানা। কিন্তু শরীর নিয়ে কী করে? নারীর প্রতি যেহেতু পুরুষের কোনও শ্রদ্ধা নেই, নারীর শরীরের প্রতিও নেই। নারীর শরীর পাওয়া পুরুষের জন্য বাঘের হরিণ পাওয়ার মতো। হরিণের জন্য কোনও শ্রদ্ধাবোধ বাঘের নেই। ছিঁড়ে খেতে বাঘের কোনও গ্লানি নেই। খিদে পেয়েছে, শিকার করেছে, খেয়েছে। খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে নিজের টেরিটরিতে ফিরে যাবে, ফের খিদে পেলে ঝাঁপিয়ে পড়বে নতুন কোনও হরিণ পেতে, না পেলে মোষ বা মানুষ।

পুরুষেরা কটকটি কামড়ানোর মতো নারীর ঠোঁট কামড়ালো, এর নাম দিয়ে দিল চুম্বন। যে নারী এভাবেই চুম্বনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে, সে তো চুম্বন বলতে তা-ই বোঝে, ধারালো দাঁতের কামড়, ঠোঁট ফুলে যাওয়া, ছিঁড়ে যাওয়া, রক্তাক্ত হওয়া। ঠোঁট কামড়ানোর পর পুরুষেরা নারীর বুক নিয়ে পড়ে। দলে পিষে সর্বনাশ করে। ক্ষণে ক্ষণে খামচে ধরে। নখে ছেঁড়ে, দাঁতে কাটে। নারীকে ভালোবাসলে, নারীর শরীরকেও ভালোবাসতে পারতো পুরুষ, ভালোবাসলে আঙুল নরম হত, দাঁত নখ লুকিয়ে থাকতো। পুরুষ নিজের আনন্দ ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। নারীর কিসে ভালো লাগবে, কিসে লাগবে না, তা জানার চেষ্টা তারা কোনওদিন করেনি। জানলেও গুরুত্ব দেয়নি, নারীর সুখ অসুখের তোয়াক্কা পুরুষ করেনি কখনও।
নারীও অনেক সময় জানে না, কী করলে তাদের ভালো লাগবে, কী করলে শরীরে সুখ হবে। নারীকে যেভাবে যা বোঝায় পুরুষ, নারী সেভাবেই বোঝে। তার কি আর আলাদা করে নিজের মাথা এবং হৃদয় খাটিয়ে কিছু বোঝার ক্ষমতা আছে? নেই। শরীরের সম্পর্কে পুরুষ হল ‘দ্য মাস্টার, মেগালোম্যানিয়াক ম্যাচো’, আর নারী তার ক্রীড়নক। পুরুষ সুপিরিয়র, নারী ইনফিরিয়র। পুরুষ অ্যাকটিভ। নারী প্যাসিভ।

নারী প্যাসিভ না হলে পুরুষের মুশকিল হয়। হরিণ নড়েচড়ে উঠলে বাঘের ভক্ষণে যেমন মুশকিল হয়, তেমন। জগতে পুরুষই রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, ধর্মে, অধর্মে, সমাজে, সংসারে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সংস্কৃতিতে মহান মস্তান হয়ে বসে আছে। এই নীতি রীতিগুলো পুরুষময় করে রাখার জন্য পুরুষেরা ভয়ংকররকম অ্যাকটিভ। এই অ্যাকটিভ পুরুষ বিছানায় গিয়ে নারী নামক ভোগের বস্তুটিকে কী করে অ্যালাউ করবে অ্যাকটিভ হওয়ার? অসম্ভব। ইগোর ঘরে আগুন জ্বলবে। পুরুষ ততটুকুই নড়তে দেবে নারীকে, যতটা নড়ন হলে পুরুষের গায়ে পুলক লাগে। বাৎসায়নমশাই চোষট্টি কলার কথা জোর গলায় বলে গেলেও এক মিশনারি কলাতেই তৃপ্ত বাঙালিবাবুরা, বাকি তেষট্টি কলার পেছনে সময় খরচ না করে নারীকে প্যাসিভ বা পুঁইশাক বানিয়ে রাখার কলা কৌশল ভালো রপ্ত করেছেন।

পুরুষের রসবোধ কম। কম বলেই নারীর রসবোধ নিয়ে আতংকিত তারা। রসক্ষরণ না হলে যাত্রা মসৃণ হয় না, জানার পরও রসক্ষরণের রাস্তায় পুরুষের যেতে বড় আপত্তি বা আলসেমি। পুরুষ প্রস্তুত সুতরাং সব্বাইকে প্রস্তুত হতে হবে। ঘোড়া প্রস্তুত, লাগাম প্রস্তুত। অর্ডার অর্ডার। এক তুড়িতে পুরুষ গ্রহণে প্রস্তুত হও নারী। তানাহলে তুমি আর নারী কীসের? তুমি আর সেবিকা কীসের? আনন্দদায়িনী, মনোরঞ্জনী কীসের? পুরুষের সুখশান্তিস্বস্তির জন্য আত্মাহুতি দিতে নারী সর্বত্র একপায়ে খাড়া।

শীর্ষসুখ জানে নারী? ক'জন নারী জানে? নারী জানে জগতের যত সুখ, সবই পুরুষের জন্য। নারীর যে একেবারে সুখ নেই তা নয়, নারীর সুখ পুরুষকে সুখ দিয়ে। নারীর অন্য সুখ থাকতে নেই। আনন্দ বলতে কিছু অনুভব করতে নেই। পুরুষ এভাবেই যুগ যুগ ধরে নারীর মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছে ত্যাগী হওয়ার মন্ত্র। নারীর ত্যাগই পুরুষের সবচেয়ে বেশি প্রার্থনীয়। নারী তার নিজস্বতা, তার পৃথক অস্তিত্ব, তার সাধ, তার সুখ সবই সানন্দে ত্যাগ করবে আর এই ত্যাগকেই পুরুষ তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করবে। নারীর ত্যাগএর মতো এত সুস্বাদু আর উপাদেয় জগতে আর কোনও খাদ্য নেই।

নারীরা যদি সমকামী হত, বেঁচে যেত। অসমকামী হওয়ার অসুবিধে হল, অনাদর, অবহেলা, অপমান, অসন্তোষকে একরকম সঙ্গী করেই জীবন কাটাতে বাধ্য হতে হয়। পুরুষ পালকের মতো করে স্পর্শ করবে নারীর সারা শরীরে, নারী একটু একটু করে কুড়ি যেমন ফুল হয়ে ফোটে, তেমন ফুটবে। বাঘিনীর মতো কামার্ত চোখে তাকাবে, হরিণের মতো কাতর চোখে নয়। পুরুষের নিঃশ্বাসে স্পর্শে, ঘামে গন্ধে, কামে, কাঙক্ষায় উপচে উঠবে তীব্র প্রেম। ওঠে কি? না। দৈত্যের মতো উঠে আসে ধর্ষনেচ্ছা। মেগালোমেনিয়া। মাচিসমো। নারীকে পিষে নিংড়ে ছোবড়া করে দেওয়ার পুরুষিক সুখ।

এ জগত পুরুষের। ভারতবর্ষ তো আরও বেশি পুরুষের। পুরুষ কামনা করবে নারীকে, পুরুষের যখন খুশি, তখন। নারীর কামনা বাসনা থাকতে নেই। থাকলেও প্রকাশ করতে নেই। নারীর শরীর জাগতে নেই, জাগলে ঘুম পাড়িয়ে রাখাই মঙ্গল। নারীর এগিয়ে আসতে নেই। চুমু খেতে নেই। যৌনতায় নারী প্রধান ভূমিকা নিতে পারে না। নারী যৌনপ্রভু নয়, 'যৌনদাসী'। এই চরিত্রটি সযতনে নারীকে উপহার দিয়েছে পুরুষ। যৌনতায় নারী যদি সঙ্গীর ভূমিকাও নেয়, তবুও পুরুষের পিলে চমকে ওঠে, শিশ্ন শিথিল হয়। যতক্ষণ না নারী যৌনদাসীর ভূমিকায় নামছে, ততক্ষণ অবধি পুরুষের উত্থান অনিশ্চিত।

নারী যৌনতৃষ্ণায় কাতরালে সে নারী মন্দ, পুরুষ যৌনতৃষ্ণায় কাতরালে পুরুষ বীর্যবান, শৌর্যবান। এই বৈষম্য নিয়ে সত্যিকার সুস্থ কোনও যৌনসম্পর্ক কি হতে পারে নারী পুরুষে? না। পারে না। ঘরে ঘরে নারী-পুরুষ দুজন মিলে যে যৌনসম্পর্ক করছে, তাকে কথ্য বাংলায় বলা হয় 'পুরুষ নারীকে করছে'। মুখের ভাষা থেকেই কিন্তু বেরিয়ে আসে বৈষম্যের বিভৎস চিত্র। 'ওরা করছে'র বদলে 'ও করছে'। একজন কাজ করছে, আরেকজন বসে আছে, ব্যাপারটা এরকম। যৌনতায় নারীর কোনও ভূমিকা নেই, থাকতে নেই — তা সর্বজনমান্য রায়।

উত্থানরহিতে জগত ভর্তি। অথচ দেখলে বোঝার জো নেই। কারও লজ্জা নেই, মাথা হেট নেই, দুশ্চিন্তা নেই। উত্থানরহিতদের মস্তক কিন্তু উত্থিত থাকে। আর যে নারীরা উত্থানরহিতদের শিকার, তারাই বরং মাথা নত করে দিন কাটায়। দুঃসহ রাত্তির কাটায়। নারী যৌনতৃপ্তি পাক, এটা আন্তরিকভাবে খুব বেশি উত্থানরহিত কি চায়? চাইলে চেষ্টা থাকতো নিজেকে সংশোধনের। যৌনতার নামে দিনের পর দিন নারীর ওপর অত্যাচার চালাতো না।

পুরুষ যেদিন বিশ্বাস করবে নারীর সমঅধিকারে, পুরুষ যেদিন নারীর স্বাধীনতাকে শর্তহীন সম্মান জানিয়ে ধন্য হবে, পুরুষ যেদিন তাদের কুৎসিত পৌরুষ বিসর্জন দিয়ে, তাবৎ পুরুষিক নৃশংসতা-কদর্যতা ত্যাগ করে মানুষ হবে, মানবিক হবে, নারীকে স্পর্শ করবে প্রেমে, যে প্রেমে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে থাকে শ্রদ্ধা; সেদিনই হবে সত্যিকার নারী পুরুষের যৌনসম্পর্ক। তার আগ অবধি ঘটনা ওই একই, একজন ভোগ করে, আরেকজন ভোগে।

'নারী স্বাধীনতা'র অর্থ 'যৌন স্বাধীনতা' — এরকম মন্তব্য অনেকে করে। বিদ্রুপ করে বলা কথা। কথা কিন্তু সত্য। যৌন স্বাধীনতা ছাড়া নারী কখনও সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না, পারেনি। যে নারীর শরীর তার নিজের অধিকারের বাইরে চলে যায়, সেই নারী কোনও অর্থেই 'স্বাধীন নারী' নয়। শিক্ষা পেলেও, স্বনির্ভর হলেও, এই নারীবিদ্বেষী সমাজে নারীরা 'যৌনদাসীত্ব' থেকে মুক্তি পেতে

পারে না । এই দাসীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে, এই বন্দিত্ব থেকে বেরিয়ে নারী যদি যৌন স্বাধীনতা পুরোপুরি ভোগ করতে পারে, তবেই সে নারীকে 'স্বাধীন' বলে মানবো আমি। যৌন স্বাধীনতা মানে পুরুষ পেলেই শুয়ে পড়া নয়, পুরুষের সঙ্গে না শোয়ার নামও যৌন স্বাধীনতা। চারদিকে ধর্ষকের ভিড়, এ সময় ধর্ষক-ধ্বজভঙ্গদের আহ্বানে আদেশে সাড়া না দেওয়ার জন্য যে যৌন স্বাধীনতা, তা থাকা প্রতিটি নারীর প্রয়োজন। ঠোঁট কামড়ে, স্তন খামচে যে পুরুষেরা পৌরুষ ফলাতে চায়, তারা যত যা-ই হোক না কেন, তাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার যৌন স্বাধীনতা না পেলে মুক্তি নেই নারীর। যে পুরুষেরা কেবল নিজের যৌনসুখ নিয়ে মগ্ন, নারীর যৌনসুখ নিয়ে ভাবা যাদের কম্ম নয়, সেই পুরুষদের সবলে অস্বীকার করার যৌন-স্বাধীনতা যে করেই হোক অর্জন করুক নারী।

সোনার বাংলার সোনার নারীরা শোনো: ঘনিয়ে আসছে ঘোর দুর্দিন

বাংলাদেশে দুই রাজনৈতিক নেত্রী বহুকাল থেকে দেশ শাসন করছেন। হাসিনা আর খালেদা। খালেদা নিশ্চিতভাবেই ধর্মীয় মৌলবাদীদের বন্ধু। আর হাসিনাকে ভাবা হত সেকুলার, অসাম্প্রদায়িক, মৌলবাদের বিপক্ষ শক্তি। হাসিনার দল আওয়ামি লীগ এবার জিতে যাবে, এরকমই অনেকে ভেবেছিল। কারণ ধর্মীয় মৌলবাদীদের দাপটে, সন্ত্রাসে জনজীবন জর্জরিত। আশা ছিল দেশটিতে আবার ধর্মনিরপেক্ষতা আনা, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার বন্ধ করা, ফতোয়াবাজদের ফতোয়া বন্ধ করা, মৌলবাদীদের দাপট বন্ধ করার বিরুদ্ধে হাসিনাই একমাত্র নেত্রী যিনি রুখে দাঁড়াতে পারেন। প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী শক্তি যখন দেশটিকে ধ্বংস করে ফেলছে, তখন হাসিনার দিকে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাকিয়ে ছিল দেশের শুভানুধ্যায়ী মানুষ। সবাইকে স্তম্ভিত করে, স্থবির করে হাসিনা জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ফতোয়াবাজদের অধিকার দেবেন ফতোয়া দেবার। বললেন, তিনি মাদ্রাসাগুলোকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেবেন, ব্লাসফেমি আইন আনবেন, এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্র বানিয়ে তবে ছাড়বেন। ১৯৯৩ সালে হাবিবুর রহমান নামের যে সিলেটি মৌলবাদী লোকটি আমার বিরুদ্ধে ফতোয়া ঘোষণা করেছিলো, মাথার দাম ঘোষণা করেছিল, সে আগামী নির্বাচনে আওয়ামি লীগের একজন প্রার্থী। হাসিনা অবলীলায় হাত মিলিয়েছেন ইসলামী মৌলবাদী দলের নেতা শায়খুল হাদিসের সঙ্গে, দেশ জুড়ে ধর্মীয় সন্ত্রাস ছড়াতে যার জুড়ি নেই। কারও কি বিশ্বাস হয় এমন কথা! বিশ্বাস না হলেও এসব সত্য। বিশ্বাস না হলেও সত্য যে বাংলাদেশ নামের দেশটির আর কোনও সম্ভাবনা নেই গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শে ফিরে যাবার।

আওয়ামি লীগ নামের দলটিকে মানুষ চিনতো প্রগতিশীল এবং অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে। এখন আওয়ামি লীগ আর মৌলবাদী দলে কোনও কি পার্থক্য আছে? জামাতে ইসলামি, ইসলামি ঐক্যজোট, বিএনপি, আওয়ামি লীগ — এইসব দলের মধ্যে নীতি ও আদর্শগতভাবে সত্যি কথা বলতে কী, এখন সত্যিকার কোনও পার্থক্য নেই। এই মুহূর্তে কী হতে পারে তবে দেশটির ভবিষ্যত! না। ও দেশ নিয়ে কোনও সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখতে আমি এখন অপারগ। দেশটি উগ্রপন্থী জঙ্গি মুসলমানদের একটি ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। বাকি যারা আছে, যারা বলছে যে তারা উগ্রপন্থী নয়,

তারা মৌলবাদবিরোধী, তারা গোপনে গোপনে মৌলবাদের শেকড় আঁকড়ে বসে আছে। মৌলবাদের শেকড় যে ধর্ম — তা সবলে অস্বীকার করতে চাইবে অনেকে। কিন্তু ধর্মে বিশ্বাস আছে বলেই মৌলবাদের বিরুদ্ধে অত শক্ত করে লড়তে আজ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষও পারছে না। মৌলবাদ তো আকাশ থেকে পড়েনি! মৌলবাদ ধর্ম থেকে উদ্ভূত। আল্লাহ বা ঈশ্বর বা ভগবান সকলেই মৌলবাদী, তাদের বান্দাগণ মৌলবাদী, ধর্মের গুরুজনেরা, প্রেরিত পুরুষেরা সকলেই সন্দেহাতীতভাবে মৌলবাদী। ধর্মের মূলনীতিতে যারা বিশ্বাস করে তারাই তো মৌলবাদী। ধর্মের মূলনীতিতে বিশ্বাস তো তাঁরা করেনই, তাঁরা চান অগুনতি মানুষও সেই নীতিতে যেন বিশ্বাস করে। বাংলাদেশে যারা দাবি করছেন যে তাঁরা মৌলবাদী নন, তাঁরা কি ধর্মের মূলনীতিতে বিশ্বাস করেন না? গোপনে গোপনে অনেকে করেন। যাঁরা করেন না তাঁদের বেশির ভাগেরই সাহস নেই বলার যে তাঁরা করেন না।

বাংলাদেশ ছিল সুফিদের দেশ। ছোটবেলায় দেখেছি খুব বুড়োরা যাদের কিছু করার নেই, লাঠি ভর দিয়ে টুক টুক করে হেঁটে মসজিদে যেতেন, যতনা নামাজের জন্য, তার চেয়ে বেশি অন্য বুড়োদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য। সব মিলিয়ে দশ বারোজন লোক হত মসজিদে। আর এখন? তরুণদের ভিড়ে মসজিদ উপচে পড়ছে। রাস্তা বন্ধ করে তারা নামাজ পড়ে। এ কী রূপ দেখি বাংলাদেশের! ধর্মের এই উন্মাদনা কে সৃষ্টি করলো? আমি দোষ দেব রাজনীতিকদের। দোষ দেব ধনী আরবদেশগুলোকে যারা ধর্মপ্রচার করতে দরিদ্র দেশগুলোকে প্রায় কিনে নিয়েছে, দোষ দেব সমাজতন্ত্রবিরোধী পুঁজিবাদী নিও-কনদের রক্তচক্ষুকে। বাংলাদেশ সোনার বাংলা নয়। কোনওকালে ছিল কী! বাহান্নোতে, উনসত্তরে আর একাত্তরে একটি কেবল সম্ভাবনা ছিল। সেই অফুরান সম্ভাবনা কিন্তু মাত্র কবছরেই হাওয়া।

এই যে ধর্মান্ধতায় থিকথিক করছে দেশ, এই যে রাজনৈতিক নেতারা এক এক করে নিজেরা মৌলবাদীতে পরিণত হচ্ছেন এবং নিজেদের মধ্যে কে কতটা ধার্মিক বা মৌলবাদী তার প্রতিযোগিতা চালাচ্ছেন তাতে কী হাল হবে দেশের, ভেবেছেন কেউ? রাজনীতিকরা না হয় গদিতে বসার আরাম কিছুদিন ভোগ করলেন। কিন্তু দুরবস্থা কাদের দিকে ধেয়ে আসছে? মেয়েদের দিকে আসছে, সকলেই জানে। ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে মেয়েদের জীবনভর ভুগতে হয়। রাষ্ট্রে সমাজে, আইনে পরিবারে ধর্মকে ডেকে আনা মানে নারীনির্যাতনকে সাদরে ডেকে আনা, নারীপুরুষে বৈষম্য ডেকে আনা, মেয়েদের বাল্যবিবাহকে, পুরুষের বহুবিবাহকে, তথাকথিত ব্যাভিচারের নামে মেয়েদের পাথর ছুড়ে হত্যা করার আইন ডেকে আনা, বোরখা না পরলে, স্বামীর অবাধ্য হলে, পিটিয়ে মারা ডেকে আনা, তালাক তালাক তিন তালাকের বীভৎসতা ডেকে আনা, মেয়েদের জন্য বন্দিত্ব, বেকারত্ব, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, দাসীত্ব আর দুর্ভোগ ডেকে আনা।

নারীকে ছোবল দেবার জন্য ফণা তুলে আছে মৌলবাদ। বিষাক্ত সাপে ছেয়ে যাওয়া আমার জন্মভূমি বাংলাদেশের মেয়েদের জন্য আশংকায় আমি আজ বাকরুদ্ধ। দেয়ালে পিঠ ঠেকলে নাকি প্রতিবাদ করবে মৌলবাদ বিরোধী শক্তি। কিন্তু পুরুষরা

কি প্রতিবাদ করবে? পুরুষ কি সত্যি করে করবে কোনও প্রতিবাদ? ধর্মের যাবতীয় আরাম তো ভোগ করছে পুরুষ। নারীর ঘাড়ের ওপর বসে, নারীকে পায়ের তলায় পিষে, দলবদ্ধভাবে দলে, যত রকম আরাম আয়েশ করা যায়, করছে পুরুষ নামক প্রভুরা। ধর্মের কারণে বা মৌলবাদের কারণে পুরুষকে কখনও দুর্ভোগ পোহাতে হয় না, হবে না। পোহাতে হয় এক মেয়েদেরই। দেয়ালে যদি পিঠ ঠেকে কারওর, ঠেকবে মেয়েদের পিঠই। যদিও আরও বহু বছর আগেই দেয়ালে পিঠ ঠেকার কথা, কেন ঠেকছে না, সে এক রহস্য। অথবা ঠেকেছে পিঠ, কিন্তু তাদের এত বেশি অনুভূতিহীন করে রাখা হয়েছে যে তারা আজ বুঝতেও পারে না কোথাও কিছু ঠেকলে। মেয়েদের মস্তিষ্ক এত ভোঁতা করে রাখা হয়েছে যে বুঝতে পারে না পুরুষেরা মৌলবাদী হোক যৌগবাদী হোক, সব এক। সবাই মেয়েদের ভোগাবে। সবাই মেয়েদের লাথি দেবে, গুঁতো দেবে। মেয়েদের অধিকার টেনে ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলবে। মেয়েদের স্বাধীনতাকে গণধর্ষণ করে খুন করবে ঠাণ্ডা মাথায়। মৌলবাদী যৌগবাদী দু জাতের পুরুষই করবে, করবে এবং করবেই। তারা করেছে অতীতে, এখনও করছে, এবং ভবিষ্যতেও করবে। ততদিন অবধি করবে যতদিন না পুরুষদের পায়ের তলায় পিষে মারা না হয়। যতদিন না তাদের দম্ভকে গুঁড়ো করা না হয়। তাদের পৌরুষকে ছিঁড়ে টুকরো করে ঘৃণায় এবং অবজ্ঞায় ছুড়ে ফেলা না হয় দুর্গন্ধ ডোবায়।

হাসিনা নারী। যে কেউ এখন বলবে। হাসিনা নারী, কিন্তু তিনি পুরুষের প্রতিনিধি। তিনি মৌলবাদের দোসর। তিনি ধর্মের দোসর। পুরুষতন্ত্রের দোসর। হাসিনার মতো পুরুষ বাংলাদেশে আর দ্বিতীয়টি নেই। হাসিনা এখন পুরুষের মতো পুরুষ। নারীরা পুরুষতন্ত্রের ধারক এবং বাহক, এ কথা জানি। কিন্তু কোনও নারী যে এত জঘন্যভাবে এমন ভয়াবহ নারীবিরোধী পুরুষ হয়ে উঠতে পারে, তা এত তীব্র করে আমার জানা ছিল না।

নারী হয়ে নারীর ক্ষতি অনেকে করে। না বুঝেই করে। কিন্তু হাসিনা, আমি মানি যে জেনে বুঝেই নারীর এই ক্ষতি করছেন। তিনি ভালো করেই জানেন মৌলবাদীরা আজ ক্ষমতার চুড়োয় উঠে নারীর সর্বনাশ সবার আগে করবে। তিনি জানেন শরিয়তি আইনের আগুন, ফতোয়ার আগুন, ধর্মীয় আইনের বর্বরতা, অসভ্যতা সবই নারীকে গিলে খাবে, তারপরও তিনি এই ভয়ংকর সিদ্ধান্তটি নিলেন। অনেকে হাসিনার এই সিদ্ধান্তকে কৌশল বলে ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু আমি একে বলবো আগুন নিয়ে খেলা। এর পরিণাম কখনও ভালো হয় না। হবে না।

আজ যেদিকে তাকাই, দেখি নারীদের চরিত্রহীনতা। পুরুষের সুখের জন্য ভোগের জন্য নিজের অধিকার বিসর্জন দেওয়া, পুরুষের দাসীত্ব করা, পুরুষের প্রতিনিধি হওয়া কি নারীর চরিত্রহীনতা নয়? এর চেয়ে বেশি চরিত্রহীন নারী আর অন্য কোনও কারণে হতে পারে না। হাসিনার চরিত্রহীনতা থেকে যেন কোনও নারী শিক্ষা না নেয়। যেন সকল নারী একযোগে ধিক বলতে পারে হাসিনার মতো চরিত্রহীনকে। ধিক বলতে পারার সাহস এবং শক্তি এবং সততা অর্জন করুক সকল নারী।

মেয়েরা ছেলে হয়ে যাক, মেয়ে বলে কিছু আর না থাকুক কোথাও

ছোটবেলায় আমিও ছেলে হয়ে যেতে চাইতাম। হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে দেখবো আমি ছেলে হয়ে গেছি। আমি তখন বাবা মার আদর পাবো বেশি, যত্ন পাবো বেশি, যা চাই তাই আমাকে দেওয়া হবে। দামি খেলনা চাই, পাবো। ফ্যাশনের জামা জুতো, পাবো। আমাকে খেতেও দেওয়া হবে সবচেয়ে ভালো খাবার। যেখানে খুশি যেতে পারবো, শহরের বড় মাঠগুলোয় খেলতে পারবো। কেউ আমাকে বাধা দেবে না। আমার সাধ আহ্লাদ সব মেটানোর জন্য একশ একজন দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি রাজা, আমি বাদশাহ, আমি পুত্র, আমি জগত, আমি ভগবান।

যত বড় হতে থাকি, ততই দুর্ভোগ বাড়ে। মেয়ে বলে মুখ ঝামটা, গালাগালি। কথায় কথায় চুলের মুঠি ধরে হেঁচকা টান। ঘরের কোণে বসে বসে চোখের জল ফেলি আর ভাবি 'ছেলে তো কত কেউ হঠাৎ হয়ে যায়, আমি কেন হতে পারি না!' স্তনের দিকে পুরুষের লোলুপ চোখ, সুযোগ পেলেই থাবা দিচ্ছে। ঋতুবতী হওয়ার পরই শুনি আমি অপবিত্র। এটা ছোঁয়া যাবে না, ওটা করা যাবে না। মেয়ে বলে আমাকে দিন রাত তটস্থ থাকতে হত, এই বুঝি কেউ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, ধর্ষণ করবে নয়তো গলা টিপে মেরে ফেলবে। এই বুঝি অ্যাসিড ছুড়বে মুখে, এই বুঝি সারা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেবে, ঠাণ্ডা মাথায় কুপিয়ে মারবে।

ছেলে হয়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম। ভয় যেত। আরামে বাঁচতাম। পরিবার থেকে সমাজ থেকে আইন থেকে রাষ্ট্র থেকে সবসরকম সহযোগিতা পেতাম। মন দিতে পারতাম লেখাপড়ায়, গবেষণায়, অর্জনে, উপার্জনে, জীবন যাপনে। কিন্তু মেয়ে হয়েছি বলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যায় নিজের নিরাপত্তা রক্ষায়। কাজে মন দিতে হয়, একই সঙ্গে অগুনতি থাবা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। কোনওদিনই নিশ্চিন্তে রাস্তায় একা হাঁটতে পারিনি, পার্কে বেড়াতে পারিনি, নদীর ধারে বসে থাকতে পারিনি, সমুদ্রের সামনে দুদণ্ড দাঁড়াতে পারিনি। পুরুষের জগত এটি, এই জগতে আর কোনও কিছু, আর কেউ, কোনও প্রাণী এত নিরাপত্তাহীন নয়, যত নিরাপত্তাহীন নারী। শহরে, বন্দরে, গ্রামে, গঞ্জে রাস্তায় ঘাটে মাঠে ক্ষেতে কখনও একা আমি নিরাপদ ছিলাম না, এখনও নই। নিজেকে রক্ষা করার জন্য আমাকে চিরকালই রক্ষী নিয়ে চলতে হয়েছে। কেউ না কেউ সঙ্গে থাকে আমাকে নিরাপত্তা দেবার জন্য, আমি একা আমার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নই বলে। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের আইন,

সমাজ, সমাজের রীতি নীতি কিছুই যথেষ্ট নয় একটি মেয়েকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। অনেকে এসময় ফোঁস করে উঠে বলবে, 'পুরুষেরও তো অভাব নিরাপত্তার।' তা ঠিক। পুরুষেরও অভাব। একটি পুরুষের নিরাপত্তার যে অভাব, সেই অভাব তো মেয়েদের আছেই, তার লক্ষগুণ বেশি অভাব মেয়েদের, মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়ার কারণে। এই সমস্যা কোনও পুরুষের নেই। প্রাণীজগতে অন্য কারওর নেই।

এই সমাজ নারী পুরুষ উভয়কে জন্মের পর থেকে শিখিয়ে আসছে যে পুরুষ একটু বেশি-মানুষ, নারী একটু কম-মানুষ। অনেক কিছু নারীর করতে নেই, বলতে নেই, চাইতে নেই, ভাবতে নেই। নারীর শরীর দুর্বল, মন দুর্বল। নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়। এই শিক্ষা পেতে পেতে নারীর 'আত্মবিশ্বাস' ভেঙে গুঁড়ো হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। মেয়েরা তাই একত্র হয় না, প্রতিবাদ করে না। রুখে ওঠে না। লাথি দেয় না। নারীবিরোধী সমাজের বিরুদ্ধে নারীরা কোনও টুঁ শব্দ তো করেই না, বরং আদরে আহ্লাদে আস্কারা দিয়ে একে মাথায় তুলে রাখে।

পুরুষেরা মনে করে সমাজে নারী পুরুষে যে বৈষম্য আছে, তা নারীর সমস্যা, তাদের নয়, এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার দায়িত্ব নারীর, তাদের নয়। এই বৈষম্য বিলুপ্ত করার দায় নারীর একার। পুরুষেরা দায়দায়িত্বহীনের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সমাজের সামান্য ভালোও যদি একটি পুরুষ চায়, তাকে বৈষম্য ঘোচাবার দায়িত্ব নিতে হবে। এক মানুষের আরেক মানুষকে অত্যাচার করে যাবার নিয়ম বহাল থাকলে কোনও সমাজ সুস্থ হয় না, সুন্দর হওয়ার প্রশ্ন তো নেইই। সমাজকে সুস্থ করার দায়িত্ব একা নারীর কেন, কেন দুজনেরই নয়! সমাজ তো নারী পুরুষ উভয়ের! এর মানে কি এই যে, পুরুষ চায় না বৈষম্য দূর করতে? পুরুষ চায় না সমতা? সমানাধিকার? চাইলে আজ ওপরতলায় যে মহান মহান পুরুষেরা বসে আছে, তারা এক ফুঁয়ে বৈষম্যকে শেকড়সুদ্ধ উড়িয়ে দিচ্ছে না কেন!

উড়িয়ে দিলে যৌন হেনস্থার সুযোগ পাবে না বলে! যে-পরিবারের বড়াই করে আসছে ভারতীয় সমাজ, সেখানেই জঘন্য অপরাধ ঘটে চলেছে। মেয়েশিশুদের ওপর চলছে যৌন হেনস্থা। বাবা কাকা দাদা জ্যাঠামশাই ঠাকুরদা দাদুর পরিবারে একটি ছোট্ট মেয়ে-শিশু নিরাপদ নয়।

'দেশের ৫৩ শতাংশ শিশু কোনও না কোনওভাবে যৌন হেনস্থার শিকার। এর মধ্যে ধর্ষণ, পায়ুসঙ্গম, যৌন নিগ্রহ থেকে শুরু করে জোর করে চুম্বন পর্যন্ত রয়েছে। এক-পঞ্চমাংশ শিশু চূড়ান্ত যৌন নির্যাতনের শিকার। ৮৩ শতাংশ ক্ষেত্রে ওই যৌন হেনস্থা করেছেন পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠরাই। ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিটি শিশুর পরিচিত কেউ। গোটা ব্যাপারটা পরিবারের মধ্যেই ধামাচাপা পড়ে যায়। কেউ মুখ খোলেন না। অসহায় শিশুরা অন্ধকারেই থেকে যায়। ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে তারা কিছু জানাতেই পারে না।' গতকাল প্রকাশ হওয়া কেন্দ্রীয় সরকারি সমীক্ষা রিপোর্ট এটি।

পশ্চিমবঙ্গ অপরাধের শীর্ষে। এ রাজ্যের নারী পুরুষ উভয়ের কাছ থেকে সবসময় শুনে আসছি, 'সবচেয়ে প্রগ্রেসিভ রাজ্য এটি। অন্যান্য রাজ্যে হয়তো নারী নির্যাতন হয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কখনও নয়।' 'প্রগ্রেসিভ' শব্দটি খুব ব্যবহার হয় পশ্চিমবঙ্গের

ক্ষেত্রে। জানি না আজ তারা কেন্দ্রের এই সমীক্ষার কথা শুনে কী বলবেন। হয়তো নাক সিঁটকে বলবেন, ‘শহরে তো নয়, হলে গ্রামের দিকে হয়।’ যদি শহরের উদাহরণ দেখাই, ‘বাগবাজারে তো হচ্ছে’, বলবে, ‘ও তো উত্তরে হচ্ছে, দক্ষিণে তো হচ্ছে না।’ যদি দক্ষিণের উদাহরণ দিই, যে, ‘টালিগঞ্জে হচ্ছে’, বলবে, ‘টালিগঞ্জে হয় হোক, বালিগঞ্জে তো হচ্ছে না!’ এত চোখ কান বুজে থাকা মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। প্রতিবেশীর বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছে, কিন্তু যতক্ষণ না নিজের লেজে আগুন লাগছে, ততক্ষণ সে ঘুমিয়ে থাকবে এবং স্বীকার করবে না যে আগুনের ছিটেফোঁটাও কোথাও আছে।

যৌন নির্যাতনের কারণে মেয়েশিশুরা এত বেশি বিপন্ন বোধ করছে যে, ৪৮·৪ শতাংশ মেয়ে বলছে ‘কেন ছেলে হয়ে জন্মালাম না!’ তারা ছেলে হয়ে যেতে চাইছে। আমিও যেমন ছেলে হয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

ছেলে হয়ে গেলে নিরন্তর পীড়ন নেই। একটি মেয়ের তো ভোগা কেবল শিশুবয়সেই নয়, সব বয়সেই তাকে ভুগতে হয়। কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে, বার্ধক্যে। ভুগতে কে চায়! মেয়েদের, এই সত্য, যে, না মরে মুক্তি নেই।

আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে পৃথিবীর সব মেয়েই একদিন ছেলে হয়ে গেছে। মেয়ে বলতে আর কিছু নেই কোথাও। তখন সম্ভবত পুরুষতন্ত্র বলে কিছুর আর অস্তিত্ব থাকবে না। পুরুষতন্ত্র তো মেয়েদের পেষণ করার জন্যই। মেয়ে না থাকলে পেষণ আর কাকে করবে! পুরুষেরা যুদ্ধ করবে, মরবে, কিছু পুরুষ আবার শান্তির কথা বলবে, শ্রেণী সংগ্রাম আর সাম্যের দাবিতে পথে নামবে। পুরুষেরা স্বাভাবিক কারণেই সমকামী হবে। তাদের ভগবানের কাছে তারা জরায়ু কামনা করবে, সেই জরায়ু যেন কোনও এক শুভক্ষণে কন্যা-সন্তান ধারণ করতে পারে। পুরুষেরা স্বপ্ন দেখবে সেই কন্যা জন্মানোর পর পৃথিবীর সব পুরুষ মিলে তাকে ধর্ষণ করছে। ধর্ষণ করছে কন্যা যতক্ষণ বেঁচে থাকে ততক্ষণ, প্রতিমুহূর্ত। সেই কন্যা যখন আরেক কন্যা জন্ম দেবে, তাকেও জন্মানোর পর থেকে ধর্ষণ করছে তারা।

কিন্তু পুরুষের এই স্বপ্ন সফল হবে না। পুরুষ স্বপ্ন দেখতে থাকবে যতদিন না তারা এক এক করে মরে গিয়ে মানবজাতির বিলুপ্তি ঘটায়।

মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য জীবনভর পুরুষের অন্যায়-অত্যাচার সয়ে মেয়েদের কেন মরতে মরতে বেঁচে থাকতে হবে! এই জাতিকে টিকিয়ে রাখার দায় কী কারণে কী স্বার্থে মেয়েরা নেবে! তার চেয়ে বিলুপ্তিই ভালো। যে প্রাণীরা সুখে থাকে, সমতায় থাকে, ভালোবাসায় ভরে থাকে, অন্যকে খাবলে খায় না, কামড়ে মারে না, অন্যের রক্তে হোলি খেলে না, তারা বেঁচে থাকুক এই পৃথিবী নামের গ্রহে। মানুষ ইতিহাস হোক। পুরুষের কলঙ্কের ইতিহাস।

ডিভোর্স হয় না বলেই ব্যভিচার বাড়ে

ডিভোর্স হয় না এদেশে। ডিভোর্স হওয়ার কোনও কারণ নেই। নারী পুরুষ যখন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাতে অলিখিত বা লিখিত যে শর্ত থাকে তা হল স্বামী উপার্জন করবে, বাড়ির সদস্যদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে, আর স্ত্রী স্বামীর আদেশ নিষেধ পালন করবে, স্বামীর শয্যাসঙ্গী হবে, স্বামীর ঘরসংসার সামলাবে, স্বামীর সন্তান জন্ম দেবে, সেই সন্তান লালন পালন করবে। এটি একটি চুক্তি। এই শর্ত বা চুক্তিটি নারী পুরুষের প্রণয়ঘটিত বা অপ্রণয়ঘটিত যে কোনও বিয়েতেই থাকে। আস্ত একটি মানুষকে পুরুষরা নিজেদের আরাম আয়েশ ভোগ বিলাসের জন্য হাতের মুঠোয় পেয়ে যায়। স্ত্রী মানুষ বটে, তবে এই স্ত্রীর নিজস্ব কোনও বোধবুদ্ধি থাকা বারণ, স্ত্রীর কোনও নিজস্ব জীবন থাকা বারণ, স্বামী-সেবায় এবং স্বামীর সুখ-ভোগে নিজেকে বিসর্জন দিতে হবে স্ত্রীকে, মানুষ হলেও মানুষের জন্মসূত্রে প্রাপ্য স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে স্ত্রীর নিজেকে বঞ্চিত রাখতে হবে। বিনে পয়সায় এমন চমৎকার দাসী পেয়ে যাওয়ার আরাম পুরুষেরা ছাড়বে কেন! তাই বিয়ে করার পর পুরুষের কোনও কারণ নেই ডিভোর্স করার। স্ত্রীকে শয্যাসঙ্গী করতে যদি ইচ্ছে না হয় পুরুষের, তবেও কোনও অসুবিধে নেই, অন্য কোনও শয্যাসঙ্গীর ব্যবস্থা করে নিতে পারে অনায়াসে, এতে তাদের কেউ বাধা দেয় না। স্ত্রীর বাইরে অন্য কোনও নারীর প্রতি আকর্ষণ পুরুষের জন্য আধুনিক হওয়ার শর্তের মতো। পুরুষের ডিভোর্স করবার দরকার হয় না। এক দাসীকে বাদ দিয়ে অন্য দাসী নেওয়ার খুব আকুলতা থাকার কোনও অর্থ হয় না। দাসী তো দাসীই। দাসীর মধ্যে প্রভুভক্তি বা পুরুষভক্তি থাকলেই যথেষ্ট। অত না পাল্টে বরং একজনকে — পুরোনোজনকে, যে এরমধ্যে ঘরসংসারের কাজ ভালো বুঝে নিয়েছে, তাকে রাখাই ভালো। পুরুষেরা তাই একের বদলে একইরকম আরেককে রাখার কোনও অর্থ দেখে না। তারা অর্থহীন কাজে তেমন আগ্রহী হয় না। স্ত্রী থেকে মন উঠলে শরীর উঠলে যদি ঘরসংসার ঠিকঠাক থাকে, স্ত্রীও যেমন ছিল তেমন থাকে, বাইরের ব্যভিচারও চমৎকার ভোগ করা যায় — তবে কি পুরুষেরা বুদ্ধু হয়েছে যে ডিভোর্স করার মতো বোকামো তারা করবে! স্ত্রীরা কেন মেনে নেয় স্বামীর ব্যভিচার— প্রশ্ন এটাই। উত্তর হল, না মেনে তাদের উপায় নেই। অন্য কোনও পুরুষের ঘরে গেলে সে পুরুষও যে ব্যভিচার করবে না তার গ্যারান্টি কে

দেবে নারীকে? ব্যভিচার পুরুষের রক্তে, কেউ কেউ বলে। আমি বলি রক্তে নয়, ব্যভিচার পুরুষতন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

যার সঙ্গে প্রেম করছো, তার সঙ্গে জীবনযাপন করো। যার সঙ্গে মন মেলাচ্ছো, তার সঙ্গে শরীর মেলাও, যেহেতু শরীরেই বসত করে মনরূপ পাখি। বাস শুধু তার সঙ্গে যার সঙ্গে মন, যার সঙ্গে শরীর। — এমন সততা যদি থাকতো সবার, ডিভোর্সের সংখ্যা বাড়তো। ভালোবাসাহীন সম্পর্ককে দু' পক্ষই বছরের পর বছর টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতো না। যদি নারীর স্বনির্ভরতা বাড়তো, সচেতনতা বাড়তো, তবে ডিভোর্সের সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই বাড়তো। নিজেকে নিরন্তর অপমানিত হতে দিতে নারী রাজি হত না। ডিভোর্স যেহেতু স্বামী স্ত্রী দুজন দুই ভিন্ন কারণে করছে না, করা থেকে বিরত থাকছে, ব্যভিচারের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়বেই। অসুখী দম্পতি আর ব্যভিচারের অসুস্থতায় ছেয়ে যাবে সমাজ। অনেকে ব্যভিচার শব্দটিকে খুব রক্ষণশীল বলে মনে করে। আমি করি না। সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বস্ততা থাকতে হয়, যে কোনও সম্পর্কেই। না থাকলে তা ভণ্ডামি, তা ব্যভিচার। সম্পর্কের মধ্যে প্রেম থাকলে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা থাকেই, এটিকে জোর করে পাহারা বসিয়ে আইন করে আনা যায় না। তবে প্রেম না থাকলে সেই সম্পর্ককে জিইয়ে রাখলে তা শুধু নিজেদের যন্ত্রণা দেয় না, শিশুসন্তানদেরও দেয়। ওরা প্রতিদিন ঘৃণা দেখে, ঝগড়া দেখে, হিংসে দেখে, মারামারি দেখে। দেখে দেখে কি ওরা আদৌ কোনও সুস্থ সুন্দর হৃদয়বান যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে বড় হতে পারে! অসম্ভব। জাতির ভবিষ্যতের কথাও যদি ভাবি, তবেও তো ভালোবাসাহীন যে কোনও তিক্ত পরিবেশ থেকে শিশুদের সরিয়ে ফেলা আমাদের উচিত। সকলের স্বার্থে, নারী পুরুষ উভয়ের স্বার্থে, সন্তানের স্বার্থে, সুস্থ সমাজের স্বার্থে ঘরে ঘরে দুঃসহ জীবন যাপন করা মানুষের ভালোবাসাহীন সম্পর্কগুলো ভেঙে যাওয়া উচিত। যা ভাঙার তা ভাঙুক। ভাঙতে না দিলে কী করে গড়ে উঠবে নতুন কিছু! পচা পুরোনোকে আঁকড়ে রেখে স্বপ্ন কি দেখা যায় সুন্দরের!

স্বামীরা ডিভোর্স করছে না কেন, তা জানি। কিন্তু স্ত্রীরা কেন করছে না! স্ত্রীরা ব্যভিচারী স্বামীদের দেখছে, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা, দ্বিচারিতা সবই সইছে কিন্তু ডিভোর্স করছে না। ঘরে ঘরে এই চিত্র। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রেম নেই, কিন্তু এক ছাদের তলে তারা বাস করছে অথবা বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। পুরুষ এরকম অভিযোগ করে — স্ত্রী আর আকর্ষণীয় নয় স্বামীর কাছে। স্ত্রী যত শ্রম দিচ্ছে, যত সন্তানের জন্ম দিচ্ছে, যত স্বামী সেবায় এবং সন্তান সেবায় নিজের হাড়মাংস কালি করছে, তত সে স্বামীর কাছে অনাকর্ষণীয়, অনাদরণীয় হয়ে উঠছে। স্বামী অন্য ফুলে মধু খেতে ছোটে। স্ত্রী-ফুল তার কাছে তখন শ্রীহীন, নিতান্তই বাসি। ঠিক একইরকম কিন্তু স্ত্রীও ভাবতে পারে। আসলে স্ত্রীদেরই ভাবতে পারার কারণ বরং বেশি। এ সমাজে বেশি-বয়সের পুরুষের সঙ্গে কম বয়সী নারীর বিয়ে হয়। স্ত্রীর কাছে স্বামীকে বুড়ো ভাম বলে মনে হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। স্ত্রীর কাছে স্বামীকে লাগতে পারে কুৎসিত, কদাকার বস্তু, স্বার্থান্ধ, লোভী, নষ্ট ভ্রষ্ট,ভঙ্গ, ধ্বজভঙ্গ। স্ত্রীদের নিশ্চয়ই তেমনই লাগে।

অন্তত গোপনে গোপনে হলেও তো লাগে। কিন্তু প্রশ্ন হল, স্ত্রী কেন এই বাসি পুরুষকে ত্যাগ করে কোনও কচি সুদর্শনের সঙ্গে প্রেম করে না? যৌনতার খেলা খেলে না? খেলে না, কারণ স্ত্রীর সময় নেই খেলার। কাঁধে তো সংসার সন্তানের বোঝা! বোঝা লাঘবের কোনও ব্যবস্থা যদি হয়ও, স্ত্রীরা তবে যাবে কোথায় ব্যভিচারী স্বামীকে ত্যাগ করে! নতুন পুরুষও তো একই রকম ব্যভিচারী হবে। হবেই। দাঁতে দাঁত চেপে তাই স্ত্রীরা ঘন করে পরা মাথার সিঁদুর আর হাতের শাঁখা-পলার আড়ালে স্বামীর ব্যভিচার লুকিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্ট করে। উপায় নেই। উপায় কি সত্যিই নেই?

ব্যভিচারি পুরুষদের ব্যভিচারী না বলে ব্যভিচারী বলা হয় মেয়েদের। ব্যভিচারের শাস্তি এতকাল মেয়েদেরই পেতে হয়েছে। যে অসহায় মেয়েদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে পুরুষ, যে মেয়েদের ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে, ঠকিয়ে, ঠেকিয়ে তাদের সঙ্গে যৌনসম্পর্কে যেতে বাধ্য করেছে পুরুষ— সেই মেয়েদেরই হয় দুর্নাম 'ব্যভিচারী' বলে। সেই মেয়েদেরই হয় শাস্তি। এতকাল হয়ে এসেছে। এখন মহিলা কমিশনের দাবিতে নতুন আইন আসছে দেশে, ব্যভিচারী হিসেবে শাস্তি পেতে হবে পুরুষকে, নারীকে নয়, নারী ব্যভিচারে লিপ্ত থাকুক বা না থাকুক।

সম্প্রতি প্রণয়ন করা নারী নিগ্রহ আইনটির মতো নারী নয় কেবল পুরুষের শাস্তি পাওয়ার নতুন এই ব্যভিচার আইনটি একটি সভ্য আইন। নারী নিয়ে লীলাখেলা ভগবানেরা যথেষ্ট করেছে। এর প্রভাব ভারতীয় পুরুষের ওপর এত পড়েছে যে লীলাখেলায় তারা বেশ সিদ্ধহস্ত। এখন ব্যভিচারের শাস্তি ব্যভিচারীকেই দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, শাস্তি পাওয়ার যোগ্য লোককেই শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সঠিক অপরাধীর হাতেই পরানো হচ্ছে হাতকড়া। ভগবানের উত্তরসুরীর জন্য যথেষ্ট ছাড় দেওয়া হয়েছিল, এখন হবে না।

নারীর জন্য বড় মায়া হয়। গুলি খায়। আবার গুলি খায় বলে অপরাধী বনে ফাঁসিকাঠে চড়ে। নারীর কেবল ঘুরে ঘুরে নানারকম মৃত্যুই হয়। এক মৃত্যুর পর আরেক মৃত্যু। এতবার মরে কেউ? নারীর মতো শত শত বার? একটি ভয়ংকর নারীবিরোধী সমাজে বসে আমি প্রয়োগ হোক বা না হোক নারীর পক্ষে আনা নতুন আইনগুলোকে স্বাগত জানাচ্ছি । আর সহস্রবার উচ্চারণ করছি নারীর জন্য আমার শুভকামনা। পুরুষের মিথ্যের, ছলনার, আধিপত্যের, ষড়যন্ত্রের, তন্ত্রের, দ্বিচারিতার, ত্রিচারিতার, চতুর্চারিতার, পুরুষের অনাচারের, অন্যায়ের, পুরুষের বদমাইশির, ব্যভিচারের শিকার যেন কোনও নারীকে আর হতে না হয়। নারী যেন পুরুষের আঁচড়, কামড় থেকে বাঁচে। জন্মের মতো বাঁচে।

মেয়েরা কেন তাদের অত্যাচারী ব্যভিচারী স্বামীদের ডিভোর্স করছে না?

পৃথিবীতে ডিভোর্স সবচেয়ে কম ঘটে ভারতে। প্রতি এক হাজার দম্পতিতে মাত্র এগারো। রাশিয়ায় ডিভোর্স শতকরা ৬৫, সুইডেনে ৬৪,বেলজিয়ামে ৫৬, যুক্তরাজ্যে ৫৩, যুক্তরাষ্ট্রে ৫০, আর ভারতে ১·১ ভাগ। সভ্য দেশগুলোয় যেখানে নারী শিক্ষিত, সচেতন এবং স্বনির্ভর, সেখানে ডিভোর্সের সংখ্যা বেশি। এই সত্য বারবারই প্রমাণিত। পশ্চিমের জরিপে দেখা গেছে প্রথমবারের বিয়েতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ডিভোর্স ঘটে, আর পুনর্বিবাহে শতকরা ষাট ভাগ। প্রশ্ন হল, ভারতে ডিভোর্সের সংখ্যা এত কম কেন? এর উত্তর খুব সহজ। পুরুষতন্ত্রের জয়জয়কার এখানে বেশি। নারীকে এখানে শিক্ষিত হতে দিলেও সচেতন হতে দেওয়া হয় না, সচেতন হতে দিলেও স্বনির্ভর হতে দেওয়া হয় না, স্বনির্ভর হতে দিলেও স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। নারীর জিনিস নারীকে আবার দেয় কে? দেওয়ার মালিকটি কে? এই প্রশ্নটি উঠতে পারে। এর উত্তরও খুব সহজ। দেওয়ার মালিক হল পুরুষ এবং নারীবিরোধী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। পুরুষ এবং তার তন্ত্র ইচ্ছে হলে নারীকে স্বাধীনতা দেয়, ইচ্ছে না হলে দেয় না। নারীর স্বাধীনতা নারীর কাছে থাকে না, থাকে পুরুষের সার্ট বা পাঞ্জাবির পকেটে, থাকে তাদের হাতের মুঠোয়।

ভারত সেই দুর্ভাগা নারীদের দেশ, যে দেশে স্বামীকে ডিভোর্স করার ক্ষমতা অন্য যে কোনও দেশের নারীদের চেয়ে কম। এত বিশাল দেশ, এত ধর্মের এত সংস্কৃতির মানুষ, এত মতের এত পথের মানুষ, এত রঙের এত ঢংএর, এত ধনের এত অধনের মানুষ এ দেশে, এখানে মানুষে মানুষে দাঙ্গা হাঙ্গামা, হিংসে দ্বেষ, বিরোধ বিদ্বেষ লেগেই আছে, সংশয়, সন্দেহ ঘাপটি মেরে বসে থাকে মনে, নারী পুরুষে আকাশ পাতাল বৈষম্য । তারপরও, ডিভোর্সের জন্য এত উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও ডিভোর্স কেন ফলছে না! উত্তর সহজ। নারী এখানে শিক্ষিত নয়, সচেতন নয়, স্বনির্ভর নয়, স্বাধীন নয়। অনেকে দাবি করে নারী 'সব পেয়েছির দেশে' আছে। কিন্তু যে শিক্ষা নারী পাচ্ছে অ্যাকাডেমিতে, সেই শিক্ষার মধ্যে কি নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কোনও শিক্ষা আছে? নারীর যে মানুষ হিসেবে, পৃথক অস্তিত্ব হিসেবে সম্মান পাওয়ার কথা এবং তা পাচ্ছে না, তার কোনও তথ্য আছে? নেই। নারীর সচেতনতা কোথায়? নারী যে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, নারী যে নিজের প্রাপ্য অধিকার

থেকে বঞ্চিত এবং নারীর যে এইসব নির্যাতন সহ্য করা উচিত নয়, মাথা উঁচু করে বাঁচতে যে তাকে হবে, পাছে লোকে কিছু বলে ভেবে তার যে পিছুহটা উচিত নয়, কেউ পথরোধ করতে এলে যে তাকে লাত্থি দিয়ে সরিয়ে দিতে হয় সেই সচেতনতা কি নারীর আছে! থাকলে ক'জন নারীর আছে? নারী স্বনির্ভর হচ্ছে, কিন্তু অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা তাদের কি আদৌ কোনও আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে? তারা কি নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারছে? নারীর স্বনির্ভরতা কি নারীকে একা বাস করার মতো দৃঢ়তা যোগাতে পারছে? স্বামীর হাতে টাকা পয়সা ঢেলে দিয়ে শ্বশুর বাড়ির খানিকটা খাতির পাবার জন্য যদি স্বনির্ভরতাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবে সেই স্বনির্ভরতার সত্যিকার নাম কিন্তু পরনির্ভরতা। স্বাধীনতার অর্থ ভারতের বেশির ভাগ নারী জানে না। মদ সিগারেট খাওয়া, ছোট ছোট পোশাক পরে তন্ত্রে মন্ত্রে নাচা আর পর-পুরুষের সঙ্গে শুয়ে বেড়ানোর নাম তাদের কাছে নারী-স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ যে তা নয়, এবং একেবারেই তা নয়, তা বোঝার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই আছে। ঘোর পুরুষতন্ত্রের মধ্যে থেকে যে ওসব করা হয়, ওই নাচা শোয়াগুলো, পুরুষের পণ্য হয়ে, পুরুষের সুখভোগের বস্তু হয়ে, তা বোঝে ক'জন? মদ সিগারেট না খেয়ে, ছোট কোনও পোশাক না পরে, তন্ত্রে মন্ত্রে না নেচে এবং কোনও পুরুষের সঙ্গে না শুয়েও যে চূড়ান্ত নারী স্বাধীনতা ভোগ করা যায় তা জানা প্রয়োজন। আজ নারীর কোনও স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা নেই। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দীর্ঘ শতাব্দী বাস করতে করতে মাথা তাদের ভোঁতা। নারীর অন্য কিছু তত পুরুষের প্রার্থনীয় নয়, যত প্রার্থণীয় ভোঁতা মাথা। 'স্বাধীনতা' মানে মন্দ জিনিস তা নারীর মাথায় খোঁপায় গুঁজে দেওয়া গোলাপের মতো গুঁজে দিয়েছে পুরুষ। নারীরা সেইটুকু স্বাধীনতা পায় বা পেতে চায়, যেটুকু পুরুষেরা তাদের দেবে বা দিতে চায়। নারীর সহায় সম্পত্তি যেমন পুরুষের হেফাজতে থাকে, তাদের স্বাধীনতাও অমন থাকে পুরুষের হেফাজতে। অনেকটা নাটাই-ঘুড়ির মতো। পুরুষের হাতে নাটাই। পুরুষ সুতো ছাড়লে ঘুড়ি বা নারী উড়বে, সুতো না ছাড়লে নারী বা ঘুড়ি উড়বে না, মুখ থুবড়ে পড়বে মাটিতে। সুতো কতটুকু ছাড়বে, কতটা আকাশ নারী পাবে, তাও নির্ধারণ করবে পুরুষ। নারী কি জানে নাটাই কেড়ে নিতে? শেখায় তাকে কেউ? হাজার বছর ধরে পরাধীন নারী স্বাধীনতা ভোগ তো করতে জানেই না, স্বাধীনতার সঠিক সংজ্ঞাও তারা জানে না। সংজ্ঞা জানলে ডিভোর্সের সংখ্যা বাড়তো।

গোটা পৃথিবীর এক ভারতেই ডিভোর্সের হার নির্লজ্জ ভাবে কম। এত কম অন্য কোথাও নয়। অন্য দেশে ষোলোটি বৈধ কারণ আছে ডিভোর্স হওয়ার। ভারতে মূলত পাঁচটি কারণ। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি না থাকায় এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য আইন আবার ভিন্ন ভিন্ন। যে কারণে হিন্দুর ডিভোর্স হবে, সে কারণে খ্রিস্টানের হবে না। হিন্দুর ডিভোর্সের কারণগুলো ১. ব্যভিচার, ২. নিখোঁজ হওয়া, ৩.নিষ্ঠুরতা ৪.যৌন অক্ষমতা, ৫. দীর্ঘদিনের মানসিক এবং শারীরিক অসুস্থতা, যৌনরোগ।

ব্যভিচার যদিও নারী পুরুষ উভয়ে করার যোগ্যতা রাখে, করে কিন্তু পুরুষেরা। করার সুযোগ সুবিধে পুরুষেরা নিজেদের জন্য যত রেখেছে, খুব স্বাভাবিকভাবেই

নারীর জন্য রাখেনি। পুরুষের ব্যভিচারের শিকার নারী, আর শিকারের হয় 'ব্যভিচারী' বলে দুর্নাম। ব্যভিচার বা বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্ক স্বামীই ঘটায়, স্ত্রী মাথা পেতে সবই বরণ করে নেয়। ভোঁতা মাথা বলেই নেয়।

তিন বছর একসঙ্গে এক বাড়িতে বাস না করলে ডিভোর্স হতে পারে, কিন্তু স্ত্রীরা কি সে কারণে কোনও স্বামীকে ডিভোর্স করে? নিখোঁজ স্বামীকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়, তারপর নর্দমা থেকে তুলে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়ে ধান-দুব্বো দিয়ে বরণ করে অপদার্থটিকে।

মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেয় স্বামীরা, তারপরও তাদের দেবতা মানার স্বভাব দূর হয় না নারীকুলের। শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্রমাগত অত্যাচারিত হচ্ছে নারী। পাষণ্ডদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘোচাতে তারপরও রাজি নয় ভীরু ভীতু নারীর দল।

যৌন অক্ষমতা পুরুষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। যৌন অক্ষম স্বামীর সঙ্গে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ কাটিয়ে দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ মেয়ে। মুখ বুজে। যৌনতা এবং তার আনন্দ পুরুষের জন্য। নারীর কাজ সন্তান উৎপাদন, এবং সন্তান লালন। এরকমই শেখানো হয়েছে নারীকে। নারী যে সত্য জানবে শিখবে বুঝবে, নারীর ভোঁতা মাথা যে ধারালো হবে তার কোনও উপায় রাখেনি এই কঠিন কঠোর পুরুষতন্ত্র।

যৌনরোগে আক্রান্ত স্বামী নিয়ে, দীঘ দীর্ঘ কাল ধরে অথর্ব অক্ষম পঙ্গু পুরুষ নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে নারী। স্বামীর সেবার জন্য নারীর এই ঝি বা চাকরানির ভূমিকাকে 'ভালোবেসে আত্মত্যাগ' বলে তারিফ করে আসছে পুরুষতন্ত্র। আর তাতেই খুশিতে বাকুম বাকুম আমাদের নারী।

ঘরে ঘরে প্রেমহীনতা, অসন্তোষ, ঘৃণা, ঘরে ঘরে ব্যভিচার, স্বৈরাচার। ঘরে ঘরে নারীর ওপর নির্লজ্জ নিপীড়ন। তারপরও নারীর সাহস নেই মেরুদণ্ড শক্ত করে মাথা উঁচু করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার। সাহস নেই নিজের জন্য একটি বাসস্থান তৈরি করার। ডিভোর্স করলে কী কী হবে তার একটি ফিরিস্তি দেওয়া হয়, যেমন ডিভোর্সী মেয়েদের দিকে পুরুষেরা হাত বাড়াবে। ভাববে এ খুব সহজলভ্য। কিন্তু এ কি কারও অজানা যে পুরুষের হাত বাড়ানোর জন্য ডিভোর্স হওয়া মেয়ের দরকার হয় না। কুমারী অকুমারী ডিভোর্সী অডিভোর্সী বুড়ি ছুড়ি যে কারও দিকেই ওরা ওদের হাত বা পুরুষাঙ্গ বাড়াতে পারে। আড়াই বছরের শিশুকেও ওরা ছেড়ে দেয় না। বলা হয় যে 'ডিভোর্স করলে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হবে।' আহ্, না হয় হোক। হোক খারাপ তারপরও নিজের মতো করে বেঁচে থাকা তো যাবে। আজ যদি হাজার হাজার মেয়ে তা-ই চায়, নিজের ইচ্ছের মূল্য দেয়, বেঁচে থাকে নিজের একশ ভাগ স্বাধীনতা এবং একশ ভাগ অধিকার নিয়ে, একা, তবে কত ঐতিহ্য, কত সংস্কার, কত পরিবারপ্রথা আছে যে গালাগালি পেড়ে সামনে এসে দাঁড়াবে, বাধা দেবে! নিরাপত্তার কথা বলা হয়। স্বামী কি সত্যিই কোনও নিরাপত্তা? ঘরে ঘরে স্বামী দ্বারা স্ত্রী খুন, স্ত্রীর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া, স্ত্রীকে গলা টিপে মেরে সিলিং ফ্যানে ঝুলিয়ে

দেওয়া, রাতে রাতে ধর্ষণ করা — এর নাম কি নিরাপত্তা? পরিসংখ্যান বলে, মেয়েরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয় স্বামীর ঘরে।

ভারতবর্ষে মেয়েদের অবস্থা যে ভীষণ করুণ, মেয়েরা যে বন্দি হয়ে আছে সংসার-কারাগারে, মেয়েদের যে ন্যূনতম অধিকার নেই নিজের অধিকারটুকু ভোগ করার — তা ভারতের ডিভোর্সের হার দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। বিবর্তন বলে একটি জিনিস আছে, পৃথিবীতে ঘটে। পৃথিবীতে এই দেশটি একমাত্র দেশ যে দেশের নারীর অবস্থায় বিবর্তন বলে কোনও জিনিস নেই। প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই, অত্যাচারে অতিষ্ঠ ঠাকুরমার ঠাকুরমার ঠাকুরমার ঠাকুরমারা যে কারণে ডিভোর্স করতো না স্বামীদের, এখন এই ২০০৭ সালে আজকের তথাকথিত শিক্ষিত সচেতন স্বনির্ভর মেয়েরা একই কারণে ডিভোর্স করছে না।

আর কতকাল নারী কোলে কাঁখে রেখে অমানুষ করবে পুরুষজাতকে?

ভারতীয় ছবির মেগা স্টার অমিতাভ বচ্চনের ছেলে অভিষেকের সঙ্গে ঐশ্বর্যার বিয়ে হতে পারে এরকম একটি খবর যখন পত্রিকায়, সকলের অতি ভালোবাসার ধন অমিতাভ বচ্চন বলে দিলেন জ্যোতিষি বলেছে ঐশ্বর্যাকে বিয়ে করলে অভিষেকের অমঙ্গল হবে, সুতরাং বিয়ে বাদ। তারপর নানারকম পুজো আচ্চা করে নাকি সঙ্কট মোচন হল। অমঙ্গলও মোচন হল। অভিষেক এখন বিয়ে করতে পারে ঐশ্বর্যাকে। ঐশ্বর্যা নামী অভিনেত্রী। তাঁর পক্ষে কি অভিনয় করা সম্ভব হবে বিয়ের পর, এই প্রশ্ন সকলের মনে। তাঁকে কি অভিনয় করার অনুমতি দেবে তাঁর স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ি? অভিষেক শুনেছি বলেছেন, ঐশ্বর্যা অভিনয় করতে চাইলে করবে। বিয়ের পর অভিষেকের অভিনয় বন্ধ হবে কী হবে না তা নিয়ে কিন্তু কেউ প্রশ্ন করেনি। ঐশ্বর্যার কাছে জানতে চায়নি অভিষেককে তিনি অনুমতি দেবেন কিনা অভিনয় করার।

কারও কাছে কি এগুলো খুব অবাক করা ব্যাপার? না। কারও কাছেই নয়। এসব সবই খুবই স্বাভাবিক। কেন এমন? কেন এই প্রশ্নটি কেউ করে না, যে, বিয়ে কেন মেয়ের জীবনকে পাল্টে দেয়, ছেলের জীবনকে নয়?

শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে দেয়, এ কথা অনেক নারীবাদীরাও বলে। ভুল বলে নিশ্চয়ই। ভুল না হলে নামী অভিনেত্রী যে কিনা শিক্ষিত এবং অঢেল টাকাকড়ির মালিক, ভীষণভাবে স্বনির্ভর, তাকে কেন স্বামীর ইচ্ছের যূপকাষ্ঠে বলি হতে হয়? তবে কি এই সত্য যে এই স্বামী সংসার ব্যাপারটির মধ্যেই যত গণ্ডগোল! কারণ এখানে মেয়েরা এখনও বন্দি, মেয়ে শিক্ষিত হোক কী অশিক্ষিত হোক, স্বনির্ভর হোক না হোক, সকলের জন্য একই নিয়ম। স্বামী সেবা কর, স্বামীর আদেশ নির্দেশ পালন কর, স্বামীর সন্তান উৎপাদন কর, সন্তান লালন পালন কর — এই নিয়মটির নাম পুরুষতন্ত্র, জগতের সকল নারী এই তন্ত্রের শিকার। পুরুষেরা যুগ যুগ ধরে টিকিয়ে রাখছে এই নোংরা কুৎসিত পুরুষতন্ত্র। স্বামীসন্তানসংসারকে মেয়েরা যেন তাদের জীবনের চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করে, এরকম একটি মন্ত্র মেয়েদের মাথায় আজকাল পুরে দেওয়া হচ্ছে। আগে তো মেয়েদের লেখাপড়া করারই সুযোগ ছিল না, স্বনির্ভর হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। এখন মেয়েদের ইস্কুল কলেজ হচ্ছে, মেয়েরা বিএএমএ পাশ করছে, কিন্তু

হলে হবে কী ! পাশ করে হয় গৃহবধূ হয়ে বসে আছে নয়তো চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য করছে, করছে কিন্তু পুরুষের অনুমতি নিয়ে, বাবার নয়তো স্বামীর নয়তো পুত্রের। মেয়েদের গলায় বা কোমরে শক্ত দড়ি বাঁধা। এই দড়ি খুলে ফেলার সাহস এবং শক্তি কোনওটাই যেন মেয়েদের না থাকে, তার সবরকম ব্যবস্থাই পুরুষেরা করে রেখেছে। পুরুষেরা দড়ি নাড়ে, এই নাড়ায় দড়িতে ঝুলে থাকা মেয়েদের জবুথবু জীবন আর নড়বড়ে ভবিষ্যত নড়ে।

বিখ্যাত নারীবাদী লেখক গ্লোরিয়া স্টেইনেম বলেছেন, 'আই হ্যাভ ইয়েট টু হিয়ার অ্যা ম্যান আস্কস ফর অ্যাডভাইস অন হাউ টু কমবাইন ম্যারেজ অ্যান্ড এ কেরিয়ার।'

বিয়ে সম্পর্কে অনেক মন্তব্যই করেছেন গ্লোরিয়া। 'একবার আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা কেন জুয়ো খেলে বেশি। এর কমন সেন্স উত্তর আমার, আমাদের টাকা পয়সা বেশি নেই তাই। ওটা সঠিক কিন্তু অসম্পূর্ণ উত্তর। ইন ফ্যাক্ট উইমেনস টোটাল ইন্সটিংট ফর গ্যাম্বলিং ইজ স্যাটিসফাইড বাই ম্যারেজ।' আর, গ্লোরিয়ার সেই কথাটা? 'এ লিবারেটেড উইম্যান ইজ ওয়ান হু হ্যাজ সেক্স বিফোর ম্যারেজ এণ্ড এ জব আফটার।' বিয়ে নিয়ে তিনি বলেছেন, যে, 'বিয়েটা নারীর চেয়ে পুরুষের জন্য খাটে ভালো।' 'ম্যারেজ ওয়ার্কস বেস্ট ফর মেন দ্যান উইমেন। দ্যা টু হ্যাপিয়েস্ট গ্রুপস আর ম্যারেড মেন অ্যান্ড আনম্যারেড উইমেন।' সবচেয়ে সুখী হল দু ধরনের মানুষ, বিবাহিত পুরুষ আর অবিবাহিত নারী। গ্লোরিয়ার প্রতিটি কথা আগুনের মতো সত্য। ষাটের দশকে যে স্লোগানটি জগতব্যাপী জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, ভাবা হত ওটি বুঝি গ্লোরিয়ার। 'এ উওম্যান উইদাউট এ ম্যান ইজ লাইক এ ফিস উইদাউট এ বাইসাইকেল।' তন্ত্রে মন্ত্রে বুঁদ হয়ে থাকা নারীর পক্ষে বোঝা শক্ত যে নারীর জীবনে পুরুষের প্রয়োজন নেই, মাছের জীবনে যেমন সাইকেলের প্রয়োজন নেই।

কত মাধুরী, কত কাজল, কত নিতু সিং, কত শ্রীদেবী, কত কারিশমা, কত জানা কত অজানা অকালে ঝরে গেল যেহেতু বিয়ে নামক ঘটনাটি তাদের জীবনে ঘটেছিল। মেয়েদের জন্য বিয়েটা খুব ভয়ঙ্কর। অভিশাপের মতো। পশ্চিমের নারীবাদীরা একসময় বলেছেন, 'নারী পুরুষের বৈষম্য নির্মূল করতে ততদিন পারবো না, যতদিন না আমরা বিয়েটা নির্মুল করতে পারবো।'

বলেছেন, যেহেতু বিয়ে ব্যাপারটি নারীকে পুরুষের দাসী বানায়, এটা খুব স্পষ্ট যে, নারী আন্দোলনের প্রথম কাজ এই বিয়েপ্রথাটিকে ভেঙে ফেলা। বিয়ের বিলুপ্তি ছাড়া নারীর স্বাধীনতা অর্জন কখনই সম্ভব নয়।

ষাট সত্তর দশকে বিয়ে ব্যাপারটির জনপ্রিয়তা পশ্চিমের মেয়েদের মধ্যে মোটেও ছিল না। কিন্তু বিয়ে ফিরে আসছে, দুঃসময় যেমন ফিরে আসে। রক্ষণশীলতা ফিরে আসছে, দুর্যোগের মেঘ যেমন হঠাৎ হঠাৎ ফিরে আসে আকাশ কালো করতে।

ভারতবর্ষের অর্ধেক আকাশে তো চিরকালই দুর্যোগের ঘনঘটা। এই ভারতবর্ষে বিয়ের বিলুপ্তি কোনওদিনই হয়নি। চিরকালই মেয়েরা এই প্রথার বলি হয়েছে। আজও

হচ্ছে। যে সমাজে নারীর নিজের অধিকার বলতে কিছু নেই, নারীর নিজস্বতা বা আলাদা অস্তিত্ব বলে আদৌ কিছু নেই, যেখানে নিজের নামে স্বামীর পদবী ধারণ করে, শাঁখা সিঁদুর পরে পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করতে হয়, যেখানে নারীকে নিজের বাড়িঘর ছেড়ে পুরুষের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়, ভবিষ্যত কী হবে তা নির্ধারণ করবে অন্য লোকে, সেখানে বিয়ের কী করে বিলুপ্তি হবে!

এখনও নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতাকে সত্যিকার স্বনির্ভরতা বলে বিচার করা হয় না। পুরুষের উপার্জনকে যে মূল্য দেওয়া হয়, সে মূল্য নারীর উপার্জনকে দেওয়া হয় না।

পুরুষ উপার্জন করে তিনটে কারণে, প্রথম কারণ টাকা, দ্বিতীয় কারণ স্টেটাস, আর তৃতীয় কারণ স্যাটিসফেকশান। নারীও উপার্জন করে ওই তিনটে কারণে, তবে কারণগুলো প্রথম স্যাটিসফেকশান, দ্বিতীয় স্টেটাস, তৃতীয় টাকা। উচ্চবিত্ত এমনকী মধ্যবিত্তদের আচরণ এমনই, যেন নারীর উপার্জনের খুব প্রয়োজন নেই, শখের জন্য, তৃপ্তির জন্য, যেন ব্যাপারটি টাইমপাসের জন্য।

উপার্জনের প্রয়োজন যেন কেবল নিম্নবিত্ত নারীদের, স্বামীরা বাউন্ডুলে বদমাশ বলে, অল্প পয়সা কামায় বলে, টাকা পয়সা দেয় না বলে, ভাত দেয় না বলে গতর খাটতে হয় বা ঘরে স্বজন-পরিজন উপোসে বলে খাটতে হয়। উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত স্বামীদের স্ত্রীরা খুব খুশি যে তারা গরিব নয়, স্বামীদের পয়সায় তারা বেশ আরাম করতে পারে। এই নারীরা ঘরের শোভা বর্ধনের জন্য বেশ উপকারী বটে। শোভা বর্ধন তো আছেই, একই সঙ্গে সতীত্ব এবং নারীত্ব এবং মাতৃত্ব এবং গৃহবধূত্ব রক্ষা করে তাদের বিবাহিত জীবন সার্থক করতে হয়।

নিজের স্বাধীনতা এবং স্বনির্ভরতা রক্ষার জন্য পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা আজও করছে না নারীরা। আজও তারা যত ধনী হোক, যত বিদুষী হোক, যত নামি হোক, দামি হোক, নিজেদের পতনে নিজেরাই প্রশ্রয় দিচ্ছে। এই নারীরাই আবার চোখে ঠুলি এঁটে বলে যে, নারী তার স্বাধীনতা সবটাই পেয়ে গেছে ভারতবর্ষে। একটা কথা তারা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বলে না যে এই ভারতেই প্রতি ২৬ মিনিটে একটি মেয়েকে যৌন হেনস্থা সইতে হচ্ছে, প্রতি ৩৪ মিনিটে একটি মেয়েকে ধর্ষিতা হতে হচ্ছে, প্রতি ৪২ মিনিটে একটি মেয়ে যৌন লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে, প্রতি ৪৩ মিনিটে একটি করে মেয়েকে কিডন্যাপ করা হচ্ছে, প্রতি ৯৩ মিনিটে একটি মেয়েকে খুন করা হচ্ছে। এটি সরকারি হিসেব। বেসরকারি হিসেবে সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও তিনগুন বেশি।

মেয়েদের খুন করা হয়, সবচেয়ে বেশি কিন্তু হয় ঘরের ভেতর, স্বামী দ্বারা। নির্যাতন নিষ্পেষণ যা কিছুই মেয়েদের জীবনে ঘটে, পৃথিবীর সর্বত্র একই ঘটনা, ঘটে ঘরে। স্বামীর ঘরের মতো অনিরাপদ এবং অনিশ্চিত জায়গা মেয়েদের জীবনে আর কিছু নেই। স্বামীকে দেবতা মানার রেওয়াজ আছে এখানে। এই দেবতারাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে স্ত্রীদের প্রতিভার বিচ্ছুরণ তারা চায় কী না। না চাইলে স্ত্রী যতই প্রতিভার পুকুরে ডুবে থাক, ওখান থেকে স্বামীর অঙ্গুলিহেলনে উঠে তাকে আসতেই হবে তীরে। যে

সংসার নারীকে ছিঁড়ে ছিবড়ে খায়, সেই সংসারে নিজের জীবন উৎসর্গ করার জন্য নারীর যে আকুলতা, সেটি কি নারীর নিজের নাকি বাইরের? শেখানো?

আমার বিশ্বাস এটি শেখানো। আমার বিশ্বাস আত্মসম্মানবোধ অর্জন করলে নারী বিদ্রোহ করবে। নিজের মতো বাঁচবে। নিজের মতো যে বাঁচাটাকে সবচেয়ে ভয় পায় পুরুষ এবং তার তন্ত্র মন্ত্র, তার শাসন করা সমাজ। পুরুষের কি আজও ভয় পাওয়ার, ভেঙে যাওয়ার, হাহাকার করার সময় আসেনি? আর কতকাল নারীরা কোলে কাঁখে রেখে অমানুষ করবে পুরুষজাতকে?

পুরুষ কি আদৌ নারীর প্রেম পাবার যোগ্য?

আমার এই এক দোষ। প্রেমে পড়া। প্রেমে পড়লেই আমি পুরুষের প্রতি খুব আন্তরিক হয়ে উঠি। পুরুষের সাতখুন মাফ করে দিই। নিজেকে আমি অনেকবার শাসন করেছি। বলেছি, 'আর যাই করিস, প্রেম যেন করিস না।' আমার হৃদয়, শরীর কোনওটিই এই শাসন মানে না। হৃদয়ের দুয়ার আমি খোলা রাখি বলে যে কোনও সুদর্শনই আচমকা ঢুকে যেতে পারে । দেখে সব্বাইকেই প্রথম প্রথম মনে হয়, 'এ পুরুষটি পুরুষতন্ত্র মানে না, ধর্ম কুসংস্কার রক্ষণশীলতা ইত্যাদি থেকে লক্ষ মাইল দূরে। এ পুরুষটি অসাধারণ প্রেমিক না হয়েই যায় না।' প্রেম আমাকে কল্পনার সাত সাগরে ডুবিয়ে রাখে। সেই ডুবে থাকা আমি পুরুষকে ভেবে নিই নারীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল, নারী-স্বাধীনতায় একশ ভাগ বিশ্বাসী, নারীর অধিকারের জন্য নিজেই বুঝি লড়বে। কিন্তু দিন যত যায় তত ডুবে থাকা আমি ভেসে উঠতে থাকি, অবশেষে ডাঙায় উঠি। আমাকে হতাশ করে প্রেমিক বুঝিয়ে দেয় যে আর দশটা লোকের মতো সেও নারীবিদ্বেষী, সেও সুযোগ পেলে নারীর সর্বনাশ করতে ছাড়ে না।

'পুরুষেরা নারীর প্রেম পাবার যোগ্য নয়', এ কথা বিশ্বাস করেও আমি প্রেম করি, করি পুরুষের সঙ্গেই। এর কারণ, আমি চেষ্টা করেও সমকামী হতে পারিনি, আর আমার প্রকৃতিতে পুরুষ-কাম প্রচণ্ড। সুদর্শন সুঠাম মেদহীন ধারালো পুরুষ-শরীর ভোগ করে আমি বড় আনন্দ পাই। পুরুষের পণ্য হওয়া আমার কম্ম নয়। আমিও কি চাই পুরুষ আমার পণ্য হোক! চাই না। এই নারী বিদ্বেষী সমাজে নারীই যেখানে ঘরে ঘরে পুরুষের পণ্য হয়ে বেঁচে থাকছে, সেখানে পুরুষকে পণ্য করা অসম্ভব। সম্ভব হলে প্রতিশোধ নিতে আমিই একবার ওদের পণ্য করে দেখতাম। আমি যে জিনিস চাই, সে জিনিস এখানে মেলে না। তার নাম সমানাধিকার। সমানাধিকার কী জিনিস, এখানকার পুরুষের তার ধারণা নেই। সমানাধিকারের গল্প যারা শুনেছে, তারা শুনেছেই কেবল, বোঝেনি কিছু।

পুরুষ আসলে সব এক। পুবের পশ্চিমের দক্ষিণের উত্তরের পুরুষে খুব একটা তফাত নেই। তফাত যা আছে বাইরে। ভেতরে এক এবং অভিন্ন। স্বনির্ভর পরনির্ভর, উঁচুশ্রেণী নিচুশ্রেণী সব এক। নিচুশ্রেণীর এক পরনির্ভর আমার পেছন পেছন সামান্য

অনুকম্পা পেতে অনেকদিন চলেছিল। অনুকম্পা দেব কী! ঢেলে প্রেম দিয়েছিলাম একবার, যেই না প্রেম পেয়েছে, অমনি সে মাথায় উঠেছে। মাথায় উঠেই আমাকে আর চেনে না সে, গায়ে টোকা দিয়ে দিয়ে বলে, 'এই তুই কে রে? কে তুই?' পুরুষকে লাই দেওয়া আর প্রেম দেওয়া একই কথা। প্রেম তারা নিতে জানে, প্রেম কোনওদিন দিতে শেখেনি। কী করে শিখবে, শেখাবে কে তাদের! জন্মের পর প্রথম পাঠ নিয়ে নেয় অন্দরমহলে, বাবা আর মায়ের ভিন্ন ভূমিকা তাদের নজরে পড়ছে। দেখছে মা প্রেম দিচ্ছে, শ্রদ্ধা দিচ্ছে, সেবা দিচ্ছে, আর বাবা নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় ভোগ করছে সব। পাঠের কী আর শেষ আছে! ঘর থেকে বেরোলেই দ্বিতীয় পাঠ, তৃতীয় পাঠ।

ঘরে বাইরে পুরুষের জয় জয়কার। পুরুষ প্রভুর ভূমিকায়, সমাজের রাজনীতির অর্থনীতির মাতব্বর তারা। এই আরামের তিলার্ধও কোনও পুরুষ ছাড়ছে না। এ না হয় ভারতবর্ষের চিত্র। পশ্চিমের যেসব দেশে মেয়েদের দাপট অনেকটাই বেড়েছে, ওখানেও একই চিত্র। সাদা প্রেমিক-পুরুষও দেখেছি হীনমন্য, ঈর্ষাকাতর, দুষ্ট, দাম্ভিক। আসলে পুরুষ জাতটাই ভীষণরকম নারীবিদ্বেষী। জাতের দোষ দেওয়া হয়তো ঠিক নয়। পুরুষদের বানানো হয়েছে নারীবিদ্বেষী করে। বহু শতাব্দী ধরে পুরুষ এই শিক্ষাই পেয়েছে যে তারা বেশি বোঝে, বেশি জানে, তাদের শরীরটা শক্তি ধরে বেশি, তাদের মাথাটা বুদ্ধি ধরে বেশি, তারা উন্নত জাতের মানুষ। সুতরাং এ খুব স্বাভাবিক কম বোঝা কম জানা দুর্বল বুদ্ধিহীন নারীজাতকে পুরুষ পুছবে না, কেবল ব্যবহার করবে নিজের স্বার্থে।

নিজের ওপর বড় রাগ হয় আমার। এত মাথা উঁচু করে চলা মানুষ আমি, এত স্বাধীন, স্বনির্ভর, এত দৃঢ়, এত সবল, শক্তিমান, আর এই আমি প্রেমে পড়লেই দুর্বল একটি দ্বিপদী জীব হয়ে উঠি। প্রেমে পড়লে বুদ্ধিদীপ্ত আমিটিও কোথায় কোন দমকা হাওয়ায় উবে যায়। বোকা একটি জবুথবু আমি পড়ে থাকি প্রেমিকের নাগালের মধ্যে। আমি আমার পেটের মেদ নিয়ে বিব্রত হই, আমার ডাবল চিন নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না। আমার নাক চোখ মুখের গড়ন কিম্ভূত লাগে। পাকা চুল সহ্য হয় না, চুলের বিন্যাস জঘন্য লাগে। আমার তখন রেখার মতো চেহারা চাই, সুস্মিতা সেনের মতো ফিগার চাই। নিজের কোনওকিছু আমার আর পছন্দ হয় না। প্রেমিকের চোখ দিয়ে নিজের দিকে তাকাই আমি, কারণ তখন আমার নিজস্ব কোনও চোখ থাকে না। প্রেমিকের চোখে আমি ঢুকিয়ে দিই অসন্তোষ। সেই অসন্তোষ নিয়ে নিজেকে দেখি আমি। বারবার দেখি। সহস্রবার দেখি। যত দেখি তত নিস্তেজ হই। যত দেখি তত আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি প্রেমিককে মুগ্ধ করার নানারকম আয়োজনে। ভোঁতা মাথা থেকে ছিটকে বেরোতে থাকে মূর্খতা, হীনমন্যতা, অসহায়তা। প্রেমের আগুন আমার আত্মবিশ্বাসকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। আমাকে আমি আর চিনতে পারি না। ন্যূব্জ, নিথর, নম্র। আমার রূপ দেখে প্রেমিক যেন আহ্লাদিত হয়, গুণ দেখে আমোদিত হয়, মরিয়া হয়ে তার চেষ্টা করি। আমার নিজস্ব কোনও বোধ থাকে না। আমার

ইন্দ্রিয়গুলো ক্রমে অকেজো হয়ে উঠতে থাকে। মাথার খুলি পড়ে থাকে, ভেতরে মস্তিষ্ক বলে কিছু আর থাকে না। আমার আমিকে আমি হারিয়ে ফেলতে থাকি। আমার নিজস্বতা, আমার অহংকার, আমার দৃঢ়তা, আমার বলিষ্ঠতা, আমার শক্তি সাহস প্রেমের তুফানে টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকে। যত উড়তে থাকে, যত আমি একটি দীনহীন জড় বস্তু হয়ে উঠি, তত আমার প্রেমিক দেখি শক্তিধর পুরুষ হয়ে উঠছে। যত আমি নত, তত সে আনন্দিত, তত সে ফুলে ফেঁপে ঢোল হচ্ছে, তত সে মেগালোম্যানিয়াক, তত সে ইনক্রিডিবল হাল্ক, তত সে 'মুই যেন কী হনুরে..'।

কে আমাকে শিখিয়েছে প্রেমিকের মন ভরাতে? পুরোনো কোনও শিক্ষা কি এখনও ঘাপটি মেরে কোথাও লুকিয়ে আছে ভেতরে? কর্কট রোগের মতো এই শিক্ষা, জীবনবিনাসী শিক্ষা, ধ্বংস করে ছাড়ে। হামুখো মৃত্যুকে টেনে এনে আস্ত জীবনটাই মুখে পুরে দেয়। আর প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে বেঁচে থাকা, পৃথিবীর সব ধর্ম আর মৌলবাদের বিরুদ্ধে, কুৎসিত পুরুষতন্ত্র, যুদ্ধ আর রক্তপাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েও, মানবতার জন্য বিশ্বজুড়ে লড়াই করা অনমনীয় আপোসহীন আমিই কিনা নত হই অমানবিক পুরুষের কাছে। পুরুষতন্ত্রের সুবিধে ভোগ করা, যুগ যুগ ধরে নারীকে দলে পিষে আরাম করা পুরুষের কাছে।

কী যুক্তি দেব আমি এর! এই ভুলের, এই অধঃপাতের! একটিই সান্ত্বনা যে আমার ঘোর কেটে যায় যখনই চাবুক পড়ে পিঠে। পুরুষ মাথায় উঠলেই মাথা বনবন করে ঘোরে আমার। একটিই সান্ত্বনা যে তাকে না নামিয়ে আমার আর চলে না তখন। পুরুষকে মাথা থেকে নামানোর সময়, মাকড়শার মতো জীবন আঁকড়ে পড়ে থাকা পুরুষকে ঠেলে সরানোর সময় অসম্ভব শক্তি পেয়ে যাই মনে আর শরীরে। প্রেমের শেকল ছিঁড়ে, প্রেমিকের কালিধুলো ঝেড়ে উঠে আবার দাঁড়িয়ে পড়তে পারি। দাঁড়ানো আমিটি কোনও বৈষম্যের সঙ্গে আপোস করে না। দাঁড়ানো আমিটি পেছন ফিরে তাকায় না। দাঁড়ানো আমিটি পুরুষ পোছে না। দাঁড়ানো মানুষটি একজনের সঙ্গেই প্রেম করতে পারে, একজনের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব হতে পারে, সে হল মানুষ। এ সমাজের পুরুষ এখনও পুরুষ, এখনও মানুষ নয়। যতদিন 'মানুষ' না হয়, ততদিন প্রেম নৈব নৈব চ।

পুরুষ কি আদৌ কোনওদিন মানুষ হবে! ঘোর পিতৃতন্ত্রের মধ্যে ডুবে থেকে আর যা কিছুই হওয়া যায়, 'মানুষ' হওয়া যায় না। মানুষ বলতে আমি বুঝি যার মনুষ্যত্ব আছে, মানবিক গুণ আছে, যে মানববাদে বিশ্বাসী। মানুষ বলতে বুঝি মানুষের প্রতি অন্যায় যে করে না, মানুষে মানুষে অসাম্য যে মানে না, কেবল লিঙ্গগুণে নিজেকে উন্নততর জীব বলে বিচার করে না। তারাই মানুষ, যারা নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষুদ্রতম কোনও বৈষম্যও মেনে নেয় না, বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, যুদ্ধ করে, এবং নিজের জীবনে বৈষম্যের ছিঁটেফোঁটারও চর্চা করে না নারীকে অসম্মান করা,

নারী বলে নারীকে অবজ্ঞা করা পুরুষের চরিত্রের অন্তর্গত। পুরুষ কি চাইবে 'চরিত্রহীন' হতে? প্রেমিকের ভেতর থেকে যখন বেরিয়ে আসে পুরুষ, সে আর প্রেমিক থাকে না। এ আমার জীবনে আমি বারবারই দেখেছি। প্রেমিককে পুরুষ নয়, মানুষ বলে বারবারই আমি ভুল করেছি।

যে নারীরা আমার মতোই প্রেমে বিশ্বাসী, যারা ভোগে, যারা মরে, তারাও যদি আমার মতো উঠে দাঁড়াতে পারতো, পুরুষের ধুলোময়লা ঝেড়ে পুরুষহীন মানবিক জীবন কাটাতে পারতো, পৃথিবীটা সুন্দর হত খুব। পুরুষতন্ত্রের বাইরে না বেরোলে কোনও পুরুষই, আমি সত্য বলছি, যে, নারীর একবিন্দু প্রেম পাবারও যোগ্য নয়।

সমকামীদের গর্তে লুকিয়ে রেখে প্রগতিশীল হওয়া অসম্ভব

আমার পশ্চিমী বন্ধুদের প্রায় অর্ধেকই সমকামী। সে কারণে ইওরোপ আমেরিকার সমকামী বারে রেস্তোরাঁয় নৃত্যমঞ্চে আমার প্রচুর যাওয়া আসা। নিউইয়র্কে সমকামীদের যে বিশাল গে প্রাইড প্যারেড হয় প্রতিবছর, সেটিতেও সমকামী-সমর্থক হিসেবে নেমে গেছি মহানন্দে। সমকামীরা তাদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করছে বহু বছর। অনেক অধিকারই অর্জন হয়েছে, অনেক বাকি রয়ে গেছে। উত্তর ইওরোপের দেশগুলোয় সমকামীরা সবচেয়ে বেশি অধিকার পায়। ওখানে বিয়ে তো বটেই, দত্তক সন্তানের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে যে প্রশ্ন ছিল, সেটিরও ফয়সালা হয়ে গেছে। ওসব দেশে সমকামীরাও আজ রাষ্ট্রপ্রধান, আজ প্রধানমন্ত্রী।

সমকামীদের অধিকারকে সমর্থন যে করে না, সে মানবাধিকারকে সমর্থন করে না। প্রতিটি মানুষেরই অধিকার আছে নিজের যৌনইচ্ছের প্রকার এবং প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, সেই মতো সঙ্গী খুঁজে নেওয়া, এবং একত্রবাস করা। একত্রবাস করছে আমার অনেক সমকামী বন্ধু। দুএকজন শখ করে বিয়ে করেছে। দত্তক নিয়েছে কিছু সমকামী পুরুষ-বন্ধুজুটি। সেদিন প্যারিসে আমার দুই সমকামী মেয়ে-বন্ধুর সাজানো সংসারে গিয়ে দেখলাম একজন সবে মা হয়েছে। কী ব্যাপার, স্পার্ম পেলে কোত্থেকে? কোন পুরুষের সঙ্গে শুয়েছো? না, শুয়ে নয়। স্পার্ম নেওয়া হয়েছে তাদেরই এক সমকামী পুরুষ বন্ধু থেকে। সমকামী মেয়ে-বন্ধু দুজনই নবজাতক শিশুটিকে একইরকম আদরে লালন পালন করছে। পুরুষ এবং নারী যখন শিশুর বাবা মা, তখন কিন্তু শিশুর লালন পালন একা নারীকেই করতে হয়, বাচ্চাকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, বাচ্চার কাঁথা কাপড় পাল্টানো ইত্যাদি হাজার রকম কাজের ক'টি পুরুষ করে?

পেরেন্টস যদি দুজনই নারী হয়, তবে শিশুর যত্ন যেমন বেশি হয়, তেমনি শিশুও বড় হয় বৈষম্যহীন একটি পারিবারিক পরিবেশে। শিশুর লালন পালনের ভার একজনের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না। সবচেয়ে ইতিবাচক দিকটি হল, দুই নারীর সংসারে উঁচুলিঙ্গ উচুঁনাক আর মানকচু মাচোঘেঁচুর ঝামেলা নেই।

সেদিন এই কলকাতায়, যে কলকাতাকে বিরাট এক প্রগতিশীল শহর আর

ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে বেশিরভাগ লোক বিশ্বাস করে, সেখানে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে রাখা এক সমকামী মেয়ে আমার কাছে বললো এসে তার যন্ত্রণার কথা। কোনও পুরুষকে সে বিয়ে করেনি। বাবা মা ক্ষুব্ধ। মেয়েটির পছন্দ মেয়ে। মেয়ে নিয়ে সে ঘরে গেলে লোকে নিন্দে করে। পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেছে। এই মেয়ে নাকি 'খারাপ'। একত্রবাস চায় সে তার প্রেমিকাটির সঙ্গে। সম্ভব নয় এই কলকাতা শহরে। বলতে বলতে মেয়ে কাঁদছিল। বললাম, 'লোকে যা ইচ্ছে তাই বলুক, তোমার যেটা ভালো লাগে সেটা করবে।' বললাম বটে, কিন্তু মেয়ে কী করে টিকে থাকবে শহরে! একে তো বাঁচতে দেবে না। সমকামী হওয়ার অপরাধে এখন চাকরি চলে যাচ্ছে মানুষের। মেয়েটি চাকরি যাবার ভয়ে, পাড়া থেকে তার অপসারণের ভয়ে নীল হয়ে থাকে। আমার খুব কষ্ট হয় মেয়েটির জন্য, তার দুর্ভোগের জন্য। কষ্ট হয় পচা পুরোনো পুরুষতান্ত্রিক প্রথায় পড়ে থাকা রক্ষণশীল হোমোফোবিকদের জন্য। তাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য।

যেখানে মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়াটাই একটা অভিশাপ, সেখানে সমকামী হওয়া যে ঠিক কী রকম, তা অধিকাংশ মানুষের বোঝার ক্ষমতা নেই। সমকামের বিরুদ্ধে আইন আছে, ধরা পড়লে দশ বছরের কারাদণ্ড, হ্যাঁ, এই গণতন্ত্রের দেশে। অবিশ্বাস্য বটে। গণতন্ত্রের এই দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আর মানবাধিকারের লঙ্ঘন কী অবলীলায় করা হয়! ক'জন প্রতিবাদ করে?

সরকারি হিসেবে এ দেশে প্রতি ঘন্টায় একটি করে মেয়ে ধর্ষিতা হচ্ছে, প্রতি ছ ঘন্টায় একটি করে মেয়েকে পণ না দেওয়ার অপরাধে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, এবং অবৈধ গর্ভপাতের শতকরা আশি ভাগ শিশুই মেয়ে। হ্যাঁ, ধর্ষিতা হওয়ার, নির্যাতিত হওয়ার, মরে যাওয়ার অধিকার মেয়েদের আছে, কিন্তু অন্য একটি মেয়েকে ভালোবাসার অধিকার নেই। ভালোবাসতে হবে পুরুষকে, প্রেম দিতে হবে পুরুষকে, পুরুষকে উৎসর্গ করতে হবে জীবন। তা না হলে এই পুরুষতন্ত্রে এক তিল ঠাঁই নেই তোমার।

আমার এক ইওরোপীয় সমকামী মেয়ে-বন্ধু এসেছিল দুবছর আগে কলকাতায়। একটা এনজিওর কাজে সে শহরে তো বটেই গ্রামে গঞ্জেও ঘুরে বেড়ালো দু মাস। ইওরোপে ফিরে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা তার। বললো কী কী করেছে, বললো অন্তত বারোটি মেয়ের সঙ্গে তার যৌন সম্পর্কের হয়েছে।

'বল কী?' আমি চমকে উঠি। 'ওরা রাজি হল?'

মেয়েটি বললো, 'নিশ্চয়ই রাজি।'

'বিবাহিত?'

'হ্যাঁ বিবাহিত। কিছু আবার অবিবাহিতও।'

'আড়ষ্ট নয়?'

'মোটেও না।'

‘খুব কষ্ট হয়নি বিছানায় নিতে?’

‘মোটেও না। ঠোঁটে চুমু খেতে খেতে বুকে আলতো করে আদর করে দিতেই দেখি গলে পড়লো।’

‘আর বিছানায়..? জানে কিছু?’

‘একটু গাইড করলেই পারফেক্ট।’

‘আর অরগাজম?’

‘তীব্র অরগাজম পেল। মনে হয় পুরুষদের কাছ থেকে পায়নি কখনও।’

আমার বন্ধুটির কাছে অসমকামী বা হেটারোসেক্সুয়াল বলে পরিচিত মেয়েদের আচরণ খুব স্বাভাবিক বলে মনে হলেও আমি একটু ভাবনায় পড়লাম। মেয়েরা নিজেদের যৌনতার অবদমন করে চলেছে বছরের পর বছর! একটু কেবল স্পর্শের অপেক্ষায়। দুফোঁটা জলের অপেক্ষায় আগুন!

পুরুষের কাছ থেকে সুখ না পেয়ে পেয়েই যে মেয়েরা সমকামী হয়, তা নয়। মেয়েদের ভালোবেসেই মেয়েরা সমকামী হয়। ভালোবেসে স্পর্শ করতে জানে ক'টা পুরুষ! পুরুষ যেটা খুব ভালো জানে, তা হল ধর্ষণ। পিতৃতন্ত্রের মন্ত্র যদি মেয়েদের মস্তিষ্কে কৃত্রিমভাবে ঢোকানো না হত, মেয়েদের যদি অসভ্য তন্ত্রে মন্ত্রে অন্ধ করা না হত, বেশির ভাগ মেয়েই হয়তো সমকামী হত। সমকামীতার অভিজ্ঞতা আমারও আছে এবং আমি হলফ করতে বলতে পারি ওই দিনগুলোয় আমি খুব সুখে এবং স্বস্তিতে ছিলাম, নির্ভাবনায় ছিলাম, ভেতরে বাইরে তৃপ্ত ছিলাম।

যেই না পুরুষে ফিরেছি অমনি দুশ্চিন্তা, দুর্ভোগ, অমনি অশান্তি আর অসন্তোষ। দুর্ভাগ্যক্রমে শরীর আমার পুরুষকামী, তা না হলে সমকামী হয়ে সমাজকে দেখিয়ে দিতাম কী করে ভালোবাসতে হয়, একত্রবাস করতে হয়, এবং লক্ষ লোকের সামনে চেঁচিয়ে বলতে হয় যে ‘সমকামী হওয়ার সবরকম অধিকার আমার আছে, আমি সমকামী, আমি আমাকে নিয়ে লজ্জিত নই, গর্বিত।’

তাদের জন্য আমার লজ্জা হয় যারা অন্যের যৌন ইচ্ছের লাগাম টেনে জীবন পার করে। এবং দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই সংখ্যাটিই সমাজে বেশি।

কলকাতার যে সমকামী মেয়েটি আমাকে বলতে এসেছিল তার কষ্টের কথা, বলেছিল, সমাজ যেদিন, যদি কোনওদিন, স্বীকার করে সমকামীদের, সেই সুদিনের জন্য সে অপেক্ষা করছে। আমি বলেছি, ‘সমাজ কোনওদিন এই কাজটি করবে না।’ তাকে বলেছি ‘কিছুকে পরোয়া করো না। বরং মুখ ফুটে নিজের দাবি জানাও। জোর গলায় জানাও। পৃথিবীতে সমকামীরা আন্দোলন করেছে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য, তাদের অধিকার কেউ তাদের হাতে দিয়ে বলেনি যে এই নাও, দিলাম। কোনও সমাজই এত মানবিক কোনওকালেই ছিল না।’

সমকামীদের বেরিয়ে আসতে হবে গর্ত থেকে। যতদিন তারা গর্তের মধ্যে থাকবে ততদিন লোকের সুবিধে হবে তাদের ঘৃণা করতে, এবং ভয় পেতে। বেরিয়ে

এলেই লোকে টের পাবে যে তারা তাদেরই মতো মানুষ, তারা তাদেরই ভাই বোন। তাদেরই স্বজন।

লেসবিয়ান শব্দটি এসেছে গ্রীসের লেসবো নামের একটি দ্বীপ থেকে, যে দ্বীপে খ্রিস্টের জন্মের সাড়ে তিনশ বছর আগে জন্মেছিলেন স্যাফো নামের এক কবি। যে কবি নিজে নারী এবং অন্য নারীর প্রতি তার প্রেম এবং যৌনআকর্ষণের কথা প্রকাশ করেছেন। বাংলায় আমরা লেসবিয়ানদের সমকামী বলি। শব্দটি সুন্দর। কিন্তু শব্দটিতে শুধু কামের উল্লেখ আছে, ভালোবাসার নেই। সমকামী জুটিরা কিন্তু পরস্পরকে ভালোবাসে। কাম তাদের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে না, টিকিয়ে রাখে প্রেম। অনেকসময় দেখেছি সমকামীরা যত মূল্য দেয় প্রেমের, অসমকামীরা তত দেয় না।

টেনিস খেলোয়াড় মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার প্রাক্তন প্রেমিকা আমেরিকান লেখক রিতা মে ব্রাউন সমকামীদের প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘মেয়েরা যারা মেয়েদের ভালোবাসে তারা লেসবিয়ান। পুরুষ, যেহেতু তারা মেয়েদেরকে যৌনসামগ্রী বলে ভাবে, লেসবিয়ানের সংজ্ঞা দেয় ভিন্নভাবে, তাদের মতে লেসবিয়ান মানে হচ্ছে দুই নারীর মধ্যে যৌনসম্পর্ক। আরও বলেছেন— No government has the right to tell its citizens when or whom to love. The only queer people are those who don’t love anybody.

সরকারের যেমন অধিকার থাকা উচিত নয় জনগণের প্রেমজীবনে নাক গলাবার, আমাদের তেমন দায়িত্ব আছে জনগণের অধিকারের জন্য লড়ার। আমরা যারা মানবাধিকারে বিশ্বাস করি, কেন অসমকামী আর সমকামী সবার জন্য এই গণতন্ত্রের দেশে সমানাধিকারের ভিত্তিতে সভ্য আইন প্রণয়নের জন্য আন্দোলন করছি না! আমরা আর কতকাল ঘৃণায়, হিংসেয়, যুদ্ধে, রক্তপাতে বিশ্বাস করবো, আর কতকাল ভালোবাসায় বিশ্বাস না করবো ! আর কতকাল প্রেমকে ছিছি করবো, চুম্বনকে সেন্সর করবো, যৌনতাকে নিষিদ্ধ করবো! আর কতকাল আমরা সভ্যতার নামে অসভ্যতা করে যাবো?

আমার মায়ের আমার বোনের কষ্টে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি....

আমাকে একটি ভাষা শিখিয়েছিল আমার মা, মার নিজের ভাষা। ভাষাটি শিখতে শিখতে ডাঙর হয়েছি, শিখতে শিখতে মানুষ। ভাষাটি ছিল বলে কথা বলেছিলাম, ক্ষিধেতেষ্টার কথা, ইচ্ছের কথা, ইচ্ছেগুলোর কথা। মুখ ফুটে বলেছিলাম, 'আমার প্রাপ্যটুকু চাই।' ভাষাটি ছিল বলে গান গেয়েছিলাম, প্রতিবাদ লিখেছিলাম দেওয়ালে, ব্যক্তিগত কাগজে। ব্যক্তিগত কিছুই আর ব্যক্তিগত থাকেনি, আগুন হয়ে ছড়িয়েছিল সারা দেশে। ভাষাটি আমাকে দিন দিন কী আশ্চর্য রকম শক্তিময়ী করে তুলেছিল, আমি আর সেই সাত চড়ে রা না করা আমি ছিলাম না। রেললাইনের ঘুমটি ঘরে ঘুরে বেড়ানো, বিকেল জুড়ে গোল্লাছুটের আমি ছিলাম না। বাড়ির ছাদে বসে একা একা রাতের তারা গোনার আমি ছিলাম না। আমি তখন হাজার মানুষের ভিড়ে হাঁটছি, আমি তখন বিভেদগুলো ভাঙছি, আমি তখন অগুন্তি বিষবৃক্ষ উপড়ে তুলছি। আমি তখন কেবল আমার নয়, সহস্র কোটির প্রাপ্যের কথা চিৎকার করে বলছি। শুনে এমনই রাগ ওদের, গলা চেপে ধরেছিল আমার, ভাষা কেড়ে নেবে।

হাত থেকে কলম কেড়ে নিল, ভাষা কেড়ে নেবে। বই পোড়ানোর উৎসব করলো শহরে নগরে, গঞ্জে গ্রামে। ভাষা কেড়ে নেবে। আমাকে পোড়ালো, পুড়ে আমি অঙ্গার হইনি, ইস্পাত হয়েছি। যে শক্তি আমাকে দিয়েছিল আমার মা, ওরা কেড়ে নেবে। কেউ কি নিতে পারে কারও ভেতর গভীর করে যদি কিছু থাকে, তা? কেউ কি পারে ওভাবে দু হাতে নখে দাঁতে ছিঁড়ে নিতে কিছু! ভালোবাসা পারে নিতে? ভাষা? ভাষা তো রক্তে থাকে, রক্ত থেকে কেউ কি ঠুকরে নিতে পারে ভাষার কণিকা?

নির্বাসন দণ্ড হল আমার। আর কেউ নয়, কোনও স্বজন নয়, বন্ধু নয়, ভাষাটি রইল কেবল সঙ্গে, একা একা আমরা দুজন। ভিনদেশে ভিনভাষীদের ভিড়ে আমরা দুজন, দুজনে নিভৃতে নিরালায় হৃদয়ে হৃদয়ে বাক্য বিনিময় করি। সারারাত না ঘুমিয়ে করি। ভিন-ভাষার শক্ত শক্ত মুষ্ঠিতে আঘাত পেতে আমার ভাষাটিকে দিই না, ভিন-ভাষার লোমশ লোমশ পায়ের তলে পিষ্ট হতে আমার ভাষাটিকে দিই না, নিরীহ নির্জন ভাষাটিকে আগলে রাখি, দেখে দেখে রাখি। ভালোবেসে রাখি। চোখের জলে ভাষার গায়ের ধুলোকালি ধুয়ে রাখি। মায়ের মতো রাখি, বোনের মত ভাইয়ের মতো

রাখি। ভাষাটি রইল নির্বাসনে দীর্ঘ এক যুগ। ভাষাটি রইল বরফে তুষারে, অন্ধকারে দীর্ঘ এক যুগ। ভাষাটি রইল আমার উচ্চারণে নয়, শ্রবণে নয়, হৃদয়ে এক যুগ। চতুর্দিকের হই চই থেকে এক কোণে একা একা আমার মতোই এক যুগ।

ভাষাটি ক্রমে ক্রমে অসুস্থ হয় তীব্র শীতে, ভাষাটি জমে যেতে থাকে ঠাণ্ডা বরফে। বাঁচাতে থাকি তাকে বুকের উত্তাপ দিয়ে দিয়ে, শত্রু শিবিরে বসে শুশ্রুষা করি তার। সে আমার আত্মীয় তখন, বন্ধু তখন। সে আমার মা। কত কত বছর চলে গেল, কত কেউ চলে গেল, আপন কত কেউ, যেতে যেতে সীমানা পেরোনো, চোখের আড়াল। কোনওদিন আর ফিরে না আসা দূরত্বে এক এক করে মানুষগুলো চলে গেল। আমিই পড়ে আছি একা, সব হারিয়ে ফুরিয়ে নিঃস্ব। সঙ্গে কেউ নেই, কিছু নেই, শুধু ভাষাটি। ভাষাটি আছে বলে চলে যাওয়া মানুষগুলোর সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে পারি। ভাষাটি আছে বলে চারদিক খা খা করার, একলা-লাগার দুচারটে গদ্যপদ্য লিখতে পারি। খুব দুঃখকষ্টের দিনে ভাষার বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে পারি। ভাষাটি আছে বলেই কেউ আছে।

কিন্তু ভাষাটি তো যে করেই হোক লোকালয় চায়, দেশ চায়, উষ্ণতা চায়, উচ্চারণ চায়। ভাষাটির জন্য আমি সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে আজ এখানে। ভাষাটিকে বাঁচাতে। আমার ভাষাকে।

ভাষা আজ সূর্যের মুখ দেখছে, আজ সে সূর্যমুখী।

ভাষা আজ মাঠে ময়দানে বিকেলের রোদ্দুরে খেলছে, সে সুখী।

ভাষার শরীর থেকে স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলা দূর হচ্ছে, সে সাঁতার কাটছে গঙ্গায়, বঙ্গোপসাগরে।

আমি আর আমার ভাষা, দীর্ঘ দীর্ঘ বছরের বিদেশ বিভুঁইএর ক্লান্তিকর পরাধীনতা সরিয়ে এইখানে, দেশে, দেশের পশ্চিম প্রান্তে, নিশ্চিন্তে। আমি আর আমার ভাষা আজ ঘরে, নিজঘরে, নিরাপদ আশ্রয়ে। আমি যখন আমার ভাষাকে উচ্চারণ করি, আমার মাকে উচ্চারণ করি। আমি যখন আমার ভাষাকে ভালোবাসি, আমার মাকে ভালোবাসি আমি। মা নেই, কেউ কেউ বলে মা নাকি কবে কোথায় আকাশের কোনও একটি তারা হয়ে গেছে।

মা নেই, আমাকে মায়ের মতো দেখে দেখে রাখছে আমার মায়ের ভাষা, যে ভাষায় মা আমাকে ভালোবাসার কথা বলতো, যে ভাষায় মা আমার জন্য কাঁদত, যে ভাষায় মা আমাকে তার কোলে ফিরে আসতে বলতো। ভাষাটিকে আমি খুব নিবিড় করে আলিঙ্গন করি, মনে মনে বলি, মা তুমি। ভাষাটির শরীরে আমি আমার মায়ের সুগন্ধ পাই। মার বিষয় আশয় কিছু ছিল না, সামান্য যা ছিল সব পচে ধ্বসে গেছে, কেবল ভাষাটিই আছে, প্রতিদিন জীবন্ত, প্রাণময়।

মাকে আমি উচ্চারণ করি, মাকে আমি উচ্চারণ করছি। আমি উচ্চারণ করছি তোমাকে আমার ভাষা, তোমাকে উচ্চারণ করতে চাই, যতদিন শ্বাস নেব। তোমাকে ভালোবাসব, যতদিন বাঁচব। তোমার কাছেই বারবার ফিরে আসবো। আমি তো চিরকালের নিরাশ্রয়, ভাষা তুমি আমাকে দেখে দেখে রেখো। মানুষের মার খেয়ে, ঘৃণা পেয়ে যখন নুয়ে পড়ব, ভাষা তুমি সাহস দিও ভাষা তুমি শক্তি দিও, মা যেমন শক্তি দিত।

প্রতিবাদ আমি লিখছি, পাথরগুলো সরাচ্ছি পথ থেকে, পথগুলো পথ হোক। আমাদের প্রাপ্য তো খল-পুরুষেরা লুটেপুটে খেল, আমরা নারীরা আজ বোবা, ভাষাহীন। যতবারই কথা বলতে চাই, ততবারই মুখ চেপে ধরে ওরা। গলায় গরল ঢেলে দেয়। যতবারই কথা বলতে চাই, ততবারই ঠোঁটে সেলাই, জিভে কাঁটা। আমরা নারীরা আজ কীকরে কাকে জানাবো যে আমরা ভালো নেই! হাজার বছর ধরে পিঠে কালসিটে, চোখ নির্ঘুম, হাজার বছর ধরে আমরা ভাষাহীন। নারীর কণ্ঠে এবার ভাষা উঠে আসুক, স্ফূলিঙ্গ হোক সে, আগুনের মতো ছড়িয়ে যাক সবখানে, নারীরা পুড়ে পুড়ে ইস্পাত হোক। নারী শক্তিময়ী হোক।

ভাষা তুমি মা,
ভাষা তুমি আমি,
ভাষা তুমি বোন।

নারী আজ উচ্চারণ করছে ভাষা, নারী আজ উচ্চারণ করছে প্রতিবাদ। নারী আজ কণ্ঠে নিচ্ছে তীক্ষ্ণ তীব্র ভাষা, নারী আজ উচ্চারণ করছে নারীর জন্য নারীর ভালোবাসা।

আমি এবং আমার ভাষা আজ খোলামেলা ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমাদের স্বাধীনতার পায়ে কেউ শেকল পরাতে এসো না, আমাদের মুক্তকণ্ঠকে কেউ চেপে ধরতে এসো না, আমাদের ভালোবাসার বুকে কেউ ছুরি বসাতে এসো না।

ক্ষমতা তুমি দূরে সরে থাকো,
ক্ষমতা তুমি পাথর ছুড়ো না,
ক্ষমতা তুমি পথরোধ করো না,
ক্ষমতা তুমি ভালোবাসতে শেখো,
ক্ষমতা পারোতো মানুষ হও,
ক্ষমতা তুমি মানুষ হও, মানবিক হও।

আমাকে থাকতে দাও আমার মতো, নির্বিবাদে, ভাষায়ভালোবাসায়। আমাকে থাকতে দাও আমার মায়ের কাছে, আমার মায়ের চোখের জল ধুয়ে দেবে আমার গায়ের ধুলোকালি। আমার মায়ের কোলটি থাকবে আমার জন্য, ওই কোলে সুখে কিংবা দুঃখে আমি ফিরবো, মা তো চিরকালই ডাকতেন আমাকে, তাঁর কোলে।

সানেরার মতো মেয়ে চাই। আছে?

বীরভূমের আলুন্দা গ্রামের মেয়ে সানেরা যা ঘটালো, তা ক'জন মেয়ে ঘটাতে পারে? ক'জন মেয়ে বিয়ের মালা খুলে ফেলতে পারে বিয়ের আসরেই? আঠারো বছর বয়সের একটি মেয়ে দেখিয়ে দিল বুকের পাটা। কারও অনুরোধে সে ঢেঁকি গেলেনি। যা তার ইচ্ছে করেছে, করেছে। সে এই বিয়ে ভেঙে দেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভেঙে দিয়েছে। যে লোক বিয়ের আসরেই মেয়ের বাবাকে অপমান করতে দ্বিধা করেনি, সে যে মেয়েকে উঠতে বসতে জীবনভর অপমান করবে, তা সানেরা বুঝে গিয়েছে। সানেরা ওই দুর্বিষহ জীবন চায়নি, চায়নি বলেই বিবাহিত জীবন শুরু করার আগেই ওটি সে শেষ করেছে।

বয়স মাত্র আঠারো সানেরার। এই বয়সে সাধারণত পরিবারের চাপের কাছে নত হতে মেয়েরা বাধ্য হয়। প্রতিবাদের ভাষা তৈরি হতে মেয়েদের সময় নেয় অনেক। অবশ্য যার তৈরি হয় না, তার সারা জীবনেও হয় না। কেউ কেউ কিশোরীবয়সে বেশ প্রতিবাদী, যেমন ইচ্ছে তেমন চলছে, নিজের অধিকারের ব্যাপারে ভীষণ সজাগ, কিন্তু যেই না বিয়ে নামক জিনিসটি ঘটার সময় হয়ে আসে, তখন একেবারে বাবা মার পছন্দ করা পাত্রের গলায় চোখ কান বুজে ঝুলে পড়ে। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দিব্যি বাধ্য বধূ। শান্ত, সমাহিত। কোনওএক কালে কিশোরীবয়সে দুরন্ত ছিল সে, দস্যি ছিল, বিকেলের চায়ের সঙ্গে মুচমুচে স্মৃতি হয়ে থাকে ওসব।

ডমেস্টিক ভায়োলেন্সের বাংলা অনুবাদ নারী নির্যাতন হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কারণ ভায়োলেন্স সাধারণত নারীর ওপরই হয়, পুরুষ দ্বারা। আপাতত একে গৃহনিগ্রহ বলেই উল্লেখ করছি। রাষ্ট্রপুঞ্জ বলছে, 'ভারতবর্ষের দুই তৃতীয়াংশ বিবাহিত নারী গৃহনিগ্রহের শিকার।' নতুন একটি আইন হয়েছে গৃহনিগ্রহের বিরুদ্ধে। কিন্তু ক'জন মেয়ে এই আইনের আশ্রয় নেবে? সানেরার মতো মেয়ে ছাড়া কারও কি সাহস হবে এই আইনে ফাঁসিয়ে অত্যাচারী স্বামীকে জেলের ভাত খাওয়াতে? হবে না ভয় এবং লজ্জার কারণে। 'ভয়' এবং 'লজ্জা' এ জিনিসদুটো মেয়েদের সতীত্বের মতো পবিত্র। যে মেয়ে সমাজকে ভয় পায় না, সমাজের সামনে লজ্জা বলতে কিছু যার নেই, সে তার ইজ্জত বা সতীত্ব খোয়ানোর মতো অপরাধ করে। গৃহনিগ্রহ আইনকে কাজে লাগাতে সানেরার মতো মেয়ে চাই। আছে?

সানেরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। তোয়াক্কা করেনি এরপর কী হবে না হবে

তার। বিয়ে হবে না আর? না হোক, সে পরোয়া করছে না। বরং বলছে, 'বিয়ে করতেই হবে তার কী মানে আছে?' এ কথা এই নারীবিদ্বেষী সমাজে মেয়েদের মুখে মুখে থাকার কথা, কিন্তু শহুরে শিক্ষিত স্বনির্ভর মেয়ের মুখ থেকেও এত ঋদ্ধ বাণী উচ্চারিত হয় না, যা হয়েছে আলুন্দা গ্রামের এক দরিদ্র রিক্সাওয়ালার মেয়ে সানেরার মুখ থেকে। সানেরা মানে যে বিয়ে না করেও সে দিব্যি ভালো বেঁচে থাকতে পারে। বলছে, 'আমি সেলাই জানি, কাপড়ে সেলাইয়ের আলপনা তুলবো। খেটে বাকি জীবনটা কাটাবো।' এমন আত্মবিশ্বাস যদি আজ নারীদের থাকতো, পৃথিবী বদলে যেত। নারী যদি অত্যাচারী পুরুষের সঙ্গে জীবন আর যাপন করবে না বলে মনস্থির করে যেমন সানেরা করেছে, যদি বোঝে যে দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো, অথবা কোনও বদমাশের সঙ্গে থাকার চেয়ে একা থাকাই ঢের ভালো, এবং নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কোনও কাজ খুঁজে নেয়, এবং নিজের আত্মসম্মান নিয়ে চলার সংকল্প করে, তবে সত্যিই, পৃথিবী বদলে যেতে বাধ্য। কিন্তু, সানেরার মতো মেয়ে কি খুব বেশি আছে?

কিছু বিয়েতে লগ্নের কুসংস্কার থাকে। লগ্নের একটু এদিক ওদিক হলে সব্বনাশ। পুরুষের কোনও সব্বনাশ হয় না, হয় নারীর। যার সঙ্গে বিয়ে হয় নারীর, ভেবেই নেওয়া হয়, সারাজীবনের সঙ্গী সে। সারাজীবন সংসারদাহে পুরুক কী পুরুষাবর্জনায় পচুক, সঙ্গীকে ত্যাগ করা চলবে না। কত যে যন্ত্রণাকাতর নারীর মুখ দেখেছি আমি এই ভারতীয় উপমহাদেশে, তারা না পারে যন্ত্রণা বইতে, না পারে সইতে। এভাবেই কেটে যায় তাদের জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো, মাসগুলো। কাটে দীর্ঘ দীর্ঘ বছর আর যুগ। সানেরা হওয়ার স্বপ্ন কি গোপনে গোপনে সবার মধ্যে নেই! থাকলেও সে স্বপ্ন বাস্তব করার সাহস এবং শক্তি অধিকাংশ নারীর নেই। নারীর স্বপ্ন স্বপ্নই দেখে যায়। ভয় আর লজ্জা তাদের স্বপ্নকে চিরকাল স্বপ্ন করেই রেখে দেয়।

একটা বিশ্বাস খুব জনপ্রিয় যে মেয়েরা শিক্ষিত আর স্বনির্ভর হলে গৃহনিগ্রহের শিকার তারা আর হয় না। এই বিশ্বাসকে মিথ্যে প্রমাণ করে প্রতিদিনই মেয়েরা নির্যাতিত হচ্ছে গৃহে। তারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, গায়িকা, নায়িকা, ব্যবসায়ী কী নয়! ইস্কুল কলেজ না পাশ করা গৃহবধূকে যেমন গৃহনিগ্রহ সইতে হয়, পাশ করা মেয়েদেরও সইতে হয় একই রকম গৃহনিগ্রহ। এর পিছনের কারণ, দুজনই নারী। দুজনই শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক, এই সমাজের চোখে দুর্বল, দুজনই দ্বিতীয়লিঙ্গ। সানেরা পুরুষতান্ত্রিকতার অত শত তত্ত্ব বোঝেনি। কেবল তার ইচ্ছের কথাটি সে বুঝেছে। এবং ইচ্ছেটাকে মূল্য দিয়েছে। সে চেঁচিয়েছে। অপদার্থের সঙ্গে বিয়ে ভেঙেছে। সানেরা শিক্ষিতও নিশ্চয়ই ছিল না, স্বনির্ভরও সে নয়। কিন্তু তার যে স্বনির্ভর হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই সে জোর গলায় বললো। পুরুষনির্ভর পরজীবী মেয়েদের পা কাঁপে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বললে। এদের মধ্যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা মেয়ের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

এরকম একটি চল আছে, যে, বিয়ের রাতে পুরুষদের বেড়াল মারতে হয়। ওই বেড়াল মারা দেখেই নতুন স্ত্রী বুঝে যাবে যে তার কপালেও এই মার আছে। সুতরাং

সে নত হবে নম্র হবে, আদেশ নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, এবং স্বামী-সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে। বিয়ের দিন বেড়াল না মেরে বরপক্ষের লোকেরা মেয়ের বাবাকে মেরে দেখিয়ে দিতে চেয়েছিল, 'তোর বাবাকেই আমরা কেয়ার করি না, তোকে কী করবো!' এখানে সানেরার বাবা পুরুষের প্রতিনিধি নয়, প্রতিনিধি তার মেয়ের, সানেরার। তাই সে অত সহজে মার খেতে পেরেছে। সানেরার বাবা যদি সেদিন তার ছেলের বিয়ে দিত, কার শক্তি ছিল তার গায়ে হাত তোলে!

যা কোনও বড় শহরে ঘটে না, ছোট কোনও গ্রামে, ছোট কোনও পরিবারে নিভৃতে ঘটে যায়। ওইসব ছোট ছোট গ্রামেই দেখেছি হঠাৎ কোনও এক মেয়ে ধর্ষকের পুরুষাঙ্গ কেটে নেয় বা ভিন্ন গোত্রের ভিন্ন ধর্মের প্রেমিককে নিয়ে নির্দ্বিধায় পালিয়ে যায়।

পুরুষতন্ত্রের বিদ্যেটা যত সুন্দর করে ইতিহাস ভূগোল পদার্থ বিজ্ঞান আর রসায়নজ্ঞান শেখার মতো মেয়েরা শিখে নেয়, তত কিন্তু 'লেখাপড়া না জানা' সানেরারা শিখতে পারে না। তাদের তাই বিয়ের আসরে একথা বলতে বাধে না যে 'এই বিয়ে আমি মানি না।' অনড় দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ের মালা খুলে ফেলতে তাদের একটুও সংকোচ হয় না। পুরুষতন্ত্রের নিয়ম কানুন অন্তস্থ্ থাকলে সংকোচ হত। বিয়ের দিন বর এবং বরের বাড়ির লোকেরা আরও বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটালেও, মেয়ের বাবাকে কেবল পেটানো নয়, মেরে ফেললেও পুরুষতন্ত্রের বিদ্যে শেখা মেয়েরা বিয়ে ভাঙার মতো দুঃসাহস করতো না। কলঙ্ক বলে কথা।

কিন্তু সানেরা জানে না কী করলে কলঙ্কের কীর্তিকাহিনী রচিত হয়। জানে না বলেই সে অমন কঠিন এবং জরুরি একটি সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেনি। এখন কী হবে সানেরার? হয়তো তার বাবা আবার পাত্রস্থ্ করতে চাইবে সানেরাকে। সানেরা এবার বোধহয় চোখ কান বুজে রাজি হবে। কারণ আত্মীয় স্বজন পাড়া পড়শি আর তাকে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না। সানেরা এখন স্বামী আর শ্বশুরবাড়ির সবার সেবা করবে আর প্রতিদিন মার খাবে। এরকম, অথবা সত্যিই সানেরা যা বলেছিল, তাই করবে, বিয়ে সে করবে না আর, নিজের উপার্জনের ব্যবস্থা নিজেই করে নেবে। সে কারও খায় না, পরে না। সে কোনও নিয়মনীতির ধারও ধারে না। এই দুটো পরিণতির কথাই আপাতত ভাবছি। দ্বিতীয় পরিণতিটি যদিও আমি সমর্থন করি, কিন্তু এই সমাজে তা ঘটানো খুব দুরূহ । যে চাপ সানেরার ওপর আসবে সমাজের অনুশাসন মেনে চলার, যে নিন্দা সানেরাকে করা হবে সে তার ইচ্ছের মূল্য দিয়েছে বলে, তা কি সানেরার একার পক্ষে বহন করা সম্ভব! মানুষ যদি চারদিক থেকে সানেরাকে সমর্থন করতো, সহযোগিতা করতো, মনে সে জোর পেত। তবে, জনসমক্ষে না করলেও অগুনতি মেয়ে আজ সানেরাকে মনে মনে সমর্থন করছে, আমার বিশ্বাস।

সানেরাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই অভিনন্দন বার্তা তার কাছে জানি না কখনও পৌঁছোবে কি না। হয়তো জানবেও না তার ওই ছোট্ট রুখে দাঁড়ানোটি দিয়ে সে আমাকেও আজ কী ভীষণ অনুপ্রাণিত করছে। নারীবাদের আদ্যোপান্ত জানা মানুষ আমি, এই আমারও সানেরার কাছে শেখার আছে অনেক কিছু। পুরুষেরা আমাকে

যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করে, আর আমি যে তারপরও ভদ্র মেয়ের মতো, ভালো মেয়ের মতো মুখ বুজে থাকি, আর মুখ বুজে থাকি বলে বারবারই আমাকে অপমান করতে বা অপদস্থ করতে পুরুষের এতটুকু অসুবিধে হয় না — আমার এ জিনিসটি শেখার আছে, যে, পুরুষেরা একবার অপমান করার পর তাদের যেন দ্বিতীয় বার অপমান করার সুযোগ আমি না দিই, যেন তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করি।

৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৬৪ দিন পুরুষদিবস, ১ দিন নারীদিবস

দিনটি কী করে আমাদের হলো:

৮ মার্চ ১৮৫৭ সাল। ন্যুইয়র্ক শহরে শতশত গার্মেন্টস আর টেক্সটাইল নারী-শ্রমিকেরা জড়ো হয়ে প্রতিবাদ করে তাদের কর্মস্থলের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে। ১২ ঘন্টা কাজ, বেতন সামান্য। পুলিশ এসে ছত্রভঙ্গ করে মিছিল। এর দুবছর পর ওই শ্রমিকেরাই একটি ইউনিয়ন গড়ে তোলে।

৮ মার্চ, ১৯০৮ সাল। ন্যুইয়র্ক শহরে পনেরো হাজার নারী মিছিল করে। তাদের দাবি ছিল কাজের সময় কমাতে হবে। ভালো বেতন দিতে হবে। ভোটের অধিকার দিতে হবে। শিশু শ্রম বন্ধ করতে হবে।

ওই বছরের মে মাসে আমেরিকার সোশালিস্ট পার্টি ফেব্রুয়ারির শেষ রোববারকে জাতীয় নারী দিবস বলে ঘোষণা করে।

২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯ সাল। পুরো আমেরিকায় প্রথম জাতীয় নারী দিবস পালিত হয়। ১৯১৩ সাল অবধি এই দিনটি পালন করে আমেরিকার নারীরা।

১৯১০ সাল। ইওরোপের নারীরা ফেব্রুয়ারির শেষ রোববারকে নারীদিবস হিসেবে পালন করতে শুরু করে।

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক দলের সভায় নারীদিবসকে আন্তর্জাতিক করার দাবি জানানো হয়। জার্মান সোশালিস্ট দলের নেত্রী ক্লারা জেটকিন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সতেরোটি দেশের একশ জন নারী প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রস্তাবকে সমর্থন জানায়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের জন্য তখনও কোনও দিন নির্দিষ্ট হয়নি।

১৯ মার্চ, ১৯১১ সাল। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ইওরোপে মহাসমারোহে পালিত হতে থাকে। অস্ট্রিয়া, জার্মানি, সুইৎজারল্যাণ্ড ও ডেনমার্কে দশ লক্ষেরও বেশি নারী মিছিলে নামে নিজেদের অধিকারের দাবিতে। ভোটের অধিকার। রাজনীতি করার অধিকার। কাজ করার অধিকার। কর্মস্থলে নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করার দাবি।

এর কিছুদিন পরই পঁচিশে মার্চে ন্যুইয়র্কের এক কারখানায় আগুন লেগে একশ চল্লিশ জন নারীশ্রমিকের মৃত্যু হয়। বেশির ভাগই ছিল ইতালীয় আর ইহুদি মেয়ে। এই ঘটনার পর আমেরিকায় তুমুল শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।

৮ মার্চ,১৯১৩-১৯১৪। ইওরোপ আমেরিকায় এই দিনটিতেই পালন হতে থাকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। মেয়েরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭ সাল। ২০ লক্ষ রাশিয়ান মেয়েরা খাদ্য এবং শান্তির দাবিতে তাদের অসহনীয় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে মিছিল করে।

রাশিয়া তখন জুলিয়ান ক্যালেন্ডার মানতো। জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের ২৩ ফেব্রুয়ারিই হল জর্জিয়ান ক্যালেন্ডারের ৮ই মার্চ।

৮ মার্চ, ১৯৭৫ সাল। রাষ্ট্রপুঞ্জ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস বলে ঘোষণা করে।

ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সাল। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভা একটি প্রস্তাব সমর্থন করে যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য রাষ্টগুলোকে যে কোনও দিনকেই নারী অধিকার রাষ্ট্রপুঞ্জ দিবস বা আন্তর্জাতিক শান্তি রাষ্ট্রপুঞ্জ দিবস বলে মেনে নিতে হবে।

দিনটি এখন :

দিনটি এখন আর তত রাজনৈতিক নয়, যত ছিল। দিনটি এখন যে কোনও ফাদারস ডে, মাদারস ডে, ভ্যালেন্টাইনস ডের মতো দিন।

দিনটিতে কী হয় সারা দেশে?:

বড় বড় বক্তৃতা হয় নানা দেশের সভায়। বর্ণাঢ্য র‍্যালি হয় দেশে দেশে। প্রচুর সাজগোজ করে সুখী নারীরা। খায় দায় গান গায়।

সেদিন আরও অনেককিছু ঘটে, যে অনেককিছুর খবর অনেকেই পায় না।

সেদিন অগুনতি মেয়ে কেবল খাবার না পেয়ে, কেবল খাবার জন্য বিশুদ্ধ জল না পেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। এমনকী মারা যাচ্ছে।

সেদিন কন্যা যেন না জন্মায় সেজন্য ভ্রূণহত্যা করা হয়, সেদিন পরিবারকে খুব দুঃখ দিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত কন্যা জন্মায়। কন্যা জন্ম দেওয়ার অপরাধে সেদিন শত শত রমণীকে তালাক দেয় তাদের স্বামীরা।

সেদিন মেয়েশিশু হত্যা হয়, কারণ তারা মেয়ে। মেয়েশিশুদের সেদিন ছুড়ে দেওয়া হয় আবর্জনার স্তূপে, কারণ তারা মেয়ে। সেদিন মেয়েশিশুদের ধর্ষণ করে বয়স্ক পুরুষেরা।

সেদিন গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে কিশোরী তরুণী যুবতীতের ওপর গণধর্ষণ

চলে। সেদিন পুরুষেরা মেয়েদের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেদিন পুরুষেরা মেয়েদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। সেদিন পুরুষেরা মেয়েদের প্রবল প্রহার করে। পুরুষেরা অ্যাসিড ছুড়ে দেয় মেয়েদের মুখে। যেন ঝলসে যায় মুখ। প্রেমিকরা প্রেমিকাদের বেচে দেয় বেশ্যাপাড়ায়। সেদিন এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এক শহর থেকে আরেক শহরে, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে লক্ষ লক্ষ মেয়েদের পাচার করা হয় যৌনদাসী বা ক্রীতদাসী বানাবার জন্য। সেদিন যেন ঝলসে যায় মুখ। দলিত দংশিত অপমানিত অবহেলিত অসম্মানিত অসংখ্য মেয়ে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে আত্মহত্যা করে।

সেদিন, যাদের ডিম্যাণ্ডের কারণে পৃথিবীর সহস্র কোটি মেয়েকে বেশ্যা বা যৌনদাসী হতে হয়েছে, (ডিমাণ্ড থাকলেই সাপ্লাই এর ব্যবস্থা হয়, ডিমান্ড না থাকলে সাপ্লাইএর দরকার হয় না।) তারা যেমন ইচ্ছে তেমন করে ভোগ করে পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতির শিকার আমাদের দুঃখিনী মেয়েদের। মেয়েরা পিষ্ট হয় নারীদিবসের ভোরবেলা থেকে মধ্যরাত্তির পর্যন্ত পৌরুষিক অত্যাচারে। পৈশাচিক এবং পাশবিক অত্যাচারের চেয়ে যে অত্যাচার সহস্রগুণ নির্মম।

৩৬৪ দিন পুরুষদিবস, ১দিন নারীদিবস:

আসলে, সত্যি কথা বলতে কী, এই পুরুষশাসিত সমাজে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৬৫দিনই পুরুষ দিবস। একটি দিন নারীর জন্য করুণা করে রাখা হয়েছে, কারণ নারীর ওপর পুরুষের নির্যাতন খুব বেশি বলে অন্তত ওই দিনটিতে যেন নারীরা সদলবলে কান্নাকাটি করতে পারে। অথবা 'যা দিয়েছো নাথ, তাতেই সুখী' বলে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে। 'মানি না মানবো না' জাতীয় স্লোগানের যুগ অনেককাল শেষ হয়েছে। এখন যত নরম হওয়া যায়, যত আপোস করা যায়, ততই মঙ্গল। নারীদের মঙ্গলময়ী করার কায়দা এবং কৌশল এই সমাজে নতুন নয়।

এ জগতে 'পুরুষ দিবস' বলে কোনও দিবসের প্রয়োজন নেই। কারণ প্রতিটি দিবসই পুরুষ দিবস।

আমার নিজের মত, নারী পুরুষের মধ্যে যে ভয়ংকর বৈষম্য বিরাজ করছে, তা দূর হলে 'নারীদিবস' বা 'পুরুষদিবস' বলে কোনও দিবস থাকবে না। আমার স্বপ্ন ৩৬৫ দিনের প্রতিটি দিনই 'মানবদিবস' হবে।

উক্তি:

না, এই দিনটি নিয়ে সমালোচনা বেশি মানুষ করেনি। এমনকী বড় নারীবাদীরাও করেনি। আমেরিকার রাজনীতিবিদ, নারীবাদী, আইনজ্ঞ বেলা আবজুগ, স্পস্টবাদী হিসেবে যার বেশ নাম ছিল, বলেছিলেন চমৎকার কথা —

'They used to give us a day—it was called International Women's Day. In 1975 they gave us a year, the Year of the Woman. Then from 1975 to 1985 they gave us a decade, the Decade of the

Woman. I said at the time, who knows, if we behave they may let us into the whole thing. Well, we didn't behave and here we are.'

বিহেভএর কথা উঠলে আমার সবসময় মনে পড়ে সেই কথাটি, well-behaved women rarely make history.

আমরা নারীরা এখন কী করবো:

আমাদের একটি দিবস দেওয়া হয়েছে। সেই দিবসটি আমরা পালন করবো। আমাদের কেউ কেউ বলবে, আমরা খুব ভালো আছি, কিন্তু খুব গণ্ডগ্রামের দিকে কোনও কোনও মেয়ে হয়তো খুব ভালো নেই, ওরা আসলে চেষ্টা করে না বলেই অধিকার পেতে পারে না। ইচ্ছে থাকলে কী না হয়!

কেউ কেউ বলবে, আমরা ভালো নেই। আমরা ঘরে বাইরে নির্যাতিত হচ্ছি। পুরুষতন্ত্র আর ধর্ম, সংস্কার এবং সংসার, প্রথা এবং পর্দা, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সবই এই সমাজে নারীবিদ্বেষী। নারী এই সমাজে যৌনবস্তু ছাড়া কিছু নয়, পুরুষ এবং পুরুষের তন্ত্রমন্ত্র সেবার জন্য নারী। এই ধর্মীয় পুরুষতান্ত্রিক পচা পুরোনো সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ভেঙে নতুন একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে হলে বিপ্লব দরকার।

কেউ বলবে, সেই বিপ্লব করতে হলে শুধু নারীদের এগিয়ে আসতে হবে।

কেউ বলবে, নারী পুরুষ উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে।

কেউ এই দিবসটিতে বেশ্যাপ্রথার গুণগান গাইবে। কেউ বেশ্যাপ্রথা নির্মূল করতে চাইবে। নারীরাই নারীর পণ্য হওয়ার পক্ষে বলবে, আবার অনেক নারীই নারীর পণ্য হওয়ার বিপক্ষে বলবে। দু' পক্ষ দুরকম মত প্রকাশ করবে। এবং নারীদের মধ্যে কোনও ঐক্য তৈরি হবে না। নারীরা বিভক্ত হবে। দ্বিখণ্ডিত হবে। প্রতি বছরের মতো এবছরও। পুরুষতন্ত্র আরও হাজার বছর টিকিয়ে রাখার জন্য এর চেয়ে ভালো আর কী আছে এই মুহূর্তে!

দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি

১. বডি লাইন বলে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে টিভিতে। প্রশ্নকর্তা পুরুষ, এবং উত্তর দিচ্ছে দুজন নারী-তারকা।

পুরুষ প্রশ্ন করছে পুরুষ-ক্রিকেটারদের নিয়ে, 'কাকে সেক্সি লাগে, কাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করে, কে অ্যাপিল করে বেশি।' এগুলোর উত্তর মেয়েদুটো মহানন্দে দিয়ে যাচ্ছিল। ব্যক্তিজীবনে কী রকম পুরুষ তাদের পছন্দ, এই প্রশ্নের উত্তরে দুজনই বললো, তাদের পছন্দ অ্যাগ্রেসিভ পুরুষ। পুরুষরা অ্যাগ্রেসিভ না হলে তাদের আনন্দই হতে চায় না।

আমি হাঁ হয়ে রইলাম। না পুরুষেরা নয়, নারীরা চাইছে 'অ্যাগ্রেসিভ পুরুষ।' এই পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের অ্যাগ্রেসিভনেস সর্বত্র। পুরুষ নারীকে ধর্ষণ করছে, গণধর্ষণ করছে, কন্যাভ্রূণ হত্যা করছে, অপহরণ করছে, নারীহত্যা করছে, বধূহত্যার হার বাড়ছে, বিবাহিত নারীর দুই তৃতীয়াংশই শিকার হচ্ছে ডমেস্টিক ভায়োলেন্সের, পুরুষেরা মেয়েদের মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মারছে, মেয়েদের সঙ্গে প্রতারণা করছে, প্রেমিক সেজে মেয়েদের ঘরের বার করে পতিতালয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে, হু হু করে বাড়ছে নারীপাচার, মেয়েদের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে পুরুষ, গলা কেটে ভাসিয়ে দিচ্ছে নদীর জলে, খুন করে আত্মহত্যা নাম দিয়ে কড়িবরগায় বা সিলিং ফ্যানে বা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। পুরুষের অ্যাগ্রেসিভনেসের কারণে নারী নির্যাতন চলছেই গ্রামে গঞ্জে, শহরে নগরে। ঘরে, ঘরের বাইরে। আর টিভির পর্দায় লাস্যময়ীরা বলছেন, তারা আরও অ্যাগ্রেসিভ পুরুষ কামনা করেন। তাঁরা ম্যাচো-ম্যান চান। রাফ টাফ। তারা শক্ত পেশি চান, পেশির জোর চান, যে পেশির জোরে নারীর ওপর অর্থাৎ দুর্বলের ওপর চড়াও হতে পারে পুরুষ। পুরুষের কম্ম হল নারীদের মুঠোয় রাখা, ডমিনেট করা, তেড়িবেড়ি করলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া। পুরুষের পেশির জোরে পিষ্ট হতে ভালোবাসেন নারীরা, এবং এভাবেই তাঁরা পুরুষতন্ত্রকে চমৎকার টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেন। এবং এই নারীরাই অগুনতি সাধারণ নারীকে উৎসাহিত করেন পুরুষকে কামনা করতে, অ্যাগ্রেসিভ পুরুষকে। পুরুষের অ্যাগ্রেসিভনেসে তাঁরা মুগ্ধ হন। তাই যখন কোমরে লাথি কষায় পুরুষ, মুঠো ধরে চুল ছিঁড়ে ফেলে, কপাল ফাটায়, চোখে মেরে চোখ রক্তাক্ত করে, মেয়েরা আনন্দে আটখানা হন। এই না হলে আবার পুরুষ কিসের!

নারীরা ম্যাসোকিস্ট হতে, নির্যাতিত হতে ভালোবাসে। পুরুষের শখ মেটাতে, সাধ মেটাতে, তাদের আরও আরও আরও আনন্দ দিতে আর কত যুগ কত শতাব্দী বোকা বুদ্ধু নারীরা আত্মাহূতি দেবে!

২. আমার সংসারের কাজে যে মেয়েটি আমাকে সাহায্য করতো, সে অনেকদিনের জন্য বাড়ি গেছে। আমি একা। একাই ঘরের কাজকর্ম সবই সারছিলাম। এরমধ্যে কিছু মেয়েবন্ধু আমার বাড়িতে এলো, তারা যে থালা বাটি গ্লাস ডিনার খেতে গিয়ে ব্যবহার করেছে, সেগুলো নিজেরাই পরিষ্কার করলো, শুধু তাই নয়, আগ বাড়িয়ে আরও কিছু ঘরবাড়ির কাজ করে দিয়ে গেল, নিজেরা বাড়ি থেকে রান্না করা খাবারও দিয়ে গেল আমাকে। আমার অসুবিধে হচ্ছে অনুমান করে আমাকে ওরা সাধ্যমতো সাহায্য করলো, সত্যিকার বন্ধুরা যা করে। দুদিন পর ওই মেয়ে-বন্ধুরা যেমন ঘনিষ্ঠ, তেমনই ঘনিষ্ঠ আমার কিছু পুরুষ-বন্ধু আমার বাড়িতে এলো। ওরা বাড়ি জুড়ে হাঁটছে, পান করছে, খাচ্ছে, ফেলছে। জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে সর্বনাশ করছে। আমি যখন বললাম সব গুছিয়ে রাখতে, ওরা আঁতকে উঠলো। আমি খুব নরম কণ্ঠে বললাম, ‘বাড়িতে আমাকে সাহায্য করার মেয়েটি নেই, আমার প্রচুর ব্যস্ততা, তোমাদের নোংরা পরিষ্কার করার সময় আমার নেই।’ এতে ওদের মনে কোনও রকম সহানুভূতি জাগলো তো না-ই, বরং হেসে উঠলো, যেন আমি মজা করছি। আমি বোঝালাম যে আমি মজা করছি না, আমি সত্যিই চাইছি ওরা যেন ঘরের যে জিনিসটি যেখানে ছিল, সেখানে রেখে আসে। বন্ধুদের আমি রান্নাঘরে নিয়ে চেষ্টা করলাম ওদের নোংরা বাসনগুলো ওদের দিয়ে ধোয়াতে। পারলাম না। ওরা মনে করলো আমি ওদের অপমান করছি। কমোডের সিট না তুলে হিসি করে টয়লেট ভিজিয়ে ফ্লাশ না করে চলে আসে। অভিযোগ করলে খ্যা খ্যা করে হাসে। এই চরিত্র নিয়ে ওরা সংসার করে কী করে আমি বুঝিনা, ওদের বউদের দুরবস্থা অনুমান করে আমি শিউরে উঠি।

এই পুরুষেরা কিন্তু সমাজে ‘ভদ্রলোক’ বলে পরিচিত। ওরা মনে করে, ঘরদোর পরিষ্কারের আর গোছানোর কাজ মেয়েদের। আর ওদের কাজ আনন্দ করার, ফুর্তি করার, বসে থাকার, শুয়ে থাকার আর আদেশ করার, এটা চাই, ওটা চাই।

মেয়েরা পুরুষতান্ত্রিক-সুবিধের কারণে অচ্ছুতের জাতে নিক্ষিপ্ত হয়। পুরুষের এঁটো আবর্জনা পরিষ্কার করার দায়িত্ব পুরুষের দিদিমা, ঠাকুরমা, কাকি, মামী, মা, বোন, বউদি, বউ, প্রেমিকা, বান্ধবী, চাকর আর মেথরের।

পুরুষের এই মানসিকতা না বদলালে কোনওদিন সমাজে কোনও পরিবর্তন আসবে না। পুরুষ নারীর সম্পর্ক প্রভু দাসীর সম্পর্ক হিসেবেই রয়ে যাবে। মনুষ্যসমাজে বৈষম্য থাকলে তা নারী পুরুষ উভয়কেই ঘোচাতে হবে, এ কারও একার দায়িত্ব নয়। মনুষ্যসমাজে সমতা এবং সুস্থতা আনতে চাইলে নারী পুরুষ উভয়কেই এ কাজে ব্রতী হতে হবে, তা না হলে পুরুষের মস্তিষ্কের অসুস্থতা, নিজেদের রাজা বাদশাহ ভাবার আর নারীদের চেয়ে নিজেদের উন্নত শ্রেণীর মনে করার অসুস্থতা কোনওদিনই দূর হবে না।

৩. দীপা মেহতার ওয়াটার ছবিটি দেখলাম। অসাধারণ ছবি। কী চমৎকার দেখিয়েছেন ধর্মের শাসন, মেয়েদের দুর্ভোগ, বৈধব্যের যন্ত্রণা। কী মর্মান্তিক সেইসব দৃশ্য, যখন আট বছর বয়সী মেয়েকে বিধবার সাদা থান পরিয়ে দেওয়া হল। ঠেলে দেওয়া হল বিধবা আশ্রমে। কী মর্মান্তিক সেই দৃশ্য যখন মেয়েটিকে ধর্ষণ করে নৌকোয় ফেলে রাখা হয়েছিল। নৌকো চলছে। জগত চলছে জগতের মতো নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে।

পাঁচশ বছর ধরে বিধবা-বৃদ্ধাদের, এমনকী বিধবা-বালিকাদেরও ছুড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ওই অঞ্চলে, যেন ওরা মরে শিগগির। ওয়াটার ছবির ঘটনা প্রায় সত্তর বছর আগের। কাশির আশ্রমে বিধবা মেয়েদের জীবনের করুণ কাহিণী বর্ণনা করা হয়েছে। মেয়েদের ওপর যে নির্যাতন চলছিল তখন, এখন না হয় ঠিক সেরকম নেই, কিন্তু কিছু কি একটুও নেই? এখানে, কলকাতার লেখাপড়া জানা ফ্যাশন করা মেয়েরা জানে যে 'ভারতবর্ষের মেয়েরা ভীষণ রকম স্বাধীন। হিন্দু মেয়েদের মতো এত স্বাধীনতা জগতে কেউ কোনওদিন পায়নি।' বিধবা বিবাহের পক্ষে আইন আছে, সুতরাং দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। তারা কি কাশি বৃন্দাবনে একবার উঁকি দিয়ে দেখেছে কত শত বিধবা ওখানে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে! তারা কি কলকাতারই ঘরে ঘরে বিধবাদের হবিষ্যির পাতের দিকে তাকিয়েছে কোনওদিন?

না, নারী-বিরোধী-কুসংস্কার সেই সমাজ থেকে কোনওদিনই যাবে না, যে সমাজে নারী পুরুষের মধ্যে সমতার কোনও সংস্কৃতি নেই, যে সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতার জয়জয়কার।

৪. টেলিভিশনে কিছু ধারাবাহিক নাটকের দু একটি পর্ব আমার দেখা হয়েছে। আমি খুব অবাক হয়ে দেখি নাটকের মেয়েরা যখন ঘরে থাকেন, ঘরের কাজকর্ম করেন, ঘুম থেকে ওঠেন, বা ঘুমোতে যান, মুখে তাদের কড়া মেকআপ থাকে। শরীরে অসম্ভব সাজগোজ। টেলিভিশনের পরিচালক ক'জনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বাস্তবের সঙ্গে মোটেও তো মিলছে না, এমন সেজে কি মেয়েরা ঘরে বসে থাকে? পরিচালক বললেন, 'উপায় নেই, মেয়েরা ওরকম না সাজলে টিআরপি কমে যায়, দর্শকরা দেখতে পছন্দ করে না মেয়েদের রঙচঙহীন মুখ।'

'তাই বলে ঘুমোবে ওই লিপস্টিক রুজ আইস্যাডো আইলাইনার, কপালে বড় বড় টিপ আর গা-ভরা গয়নাগাটি পরে?'

পরিচালকরা বললেন, হ্যাঁ।

ছেলেদের বেলায় নিশ্চয়ই এ নিয়ম নেই। ওঁরা মাথা নেড়ে সায় দিলেন, নেই।

মেয়েরা যা, তা দিয়ে কেন চলে না? মেয়েদের কেন বাড়তি রঙের, বাড়তি ঢংএর দরকার হয়? মেয়েদের কেন শরীরের নানান জায়গা থেকে মেদ কমিয়ে ফ্যাশন ম্যাগাজিন, ফ্যাশন-শো বা বিজ্ঞাপন জগত প্রস্তাবিত একটি ফিগারএর দরকার হয়? এই প্রশ্নগুলো কেউ কি করেছে কখনও? শরীরের সৌন্দর্য ছাড়া, যে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা তৈরি করেছে পুরুষ, মেয়েদের নিতান্তই মূল্যহীন এবং আকর্ষণহীন মনে করা হয়।

তাই সৌন্দর্য রক্ষা করার নানারকম কায়দা কানুন শিখতে বাধ্য হচ্ছে মেয়েরা। এই পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষেরা তাদের ব্যক্তিত্ব, তাদের গুণ, জটিল এবং জটিলতর বিষয়ে তাদের জ্ঞান, তাদের দক্ষতা, পারদর্শিতা ইত্যাদি প্রদর্শন করতে পারে। আর ওদিকে শরীর ছাড়া নারীর প্রদর্শনের কিচ্ছু নেই। নারীর সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায় এক শরীরের কাছে। যে সব জিনিসকে নারীর গুণ বলে ধরা হয়, তা পুরুষের প্রয়োজনে লাগে বলেই, এবং নারীকে অবদমিত রাখে বলেই। যেমন রান্নাবান্না, ঘরকন্না, যেমন সেলাই সেবা সহমর্মিতা, ভীষণরকম পরনির্ভরশীলতা, যেমন নত নম্র স্বভাব, যেমন লজ্জা ভয়।

নারীর জন্য নারীর জীবনে কিচ্ছু নেই। নারী যদি কোনও কোম্পানীর বড় পদে কাজ করে, পরিচালক হয়, মালিক নয়, নারী যদি ব্যবসায় বিশাল সাফল্য লাভ করে, নারী যদি বড় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র হয়, বিজ্ঞানী হয়, নভোচারী হয়, বড় লেখক হয়, শিল্পী হয়, বড় রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিদ হয়, তবে সমাজের সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে নারী সমর্থ হয়। শরীর না প্রদর্শন করে বা না ব্যবহার করে যে সাফল্য নারীর আসে, সেই সাফল্য সত্যিকার সাফল্য। কিন্তু সাফল্যকে কখনও নারীর গুণ বলে ধরা হয় না। পদগুলো পুরুষিক, মাসক্যুলিন। উঁচুপদগুলো উঁচুস্তরগুলো কখনও ফেমিনিন নয়, তাই মানুষের শ্রদ্ধা অফুরন্ত ওই পদগুলোর জন্য, মাসক্যুলিন পদের প্রতি শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধার পদে যে কেউ বসুক, শ্রদ্ধা তার প্রতি থাকেই, নারী হলে নারীর প্রতিও। এ কিন্তু মানুষ হিসেবে নারীকে শ্রদ্ধা করা নয়। ওই উচ্চতাকে শ্রদ্ধা করা, ওই সাফল্যকে শ্রদ্ধা করা, যে উচ্চতা বা সাফল্যের সমার্থক শব্দ পৌরুষ।

নারী = শরীর

'নিঃশব্দ' দেখে এসে আমার মনে হচ্ছিল, 'এর উল্টোটি কি হতে পারতো? ষাট বছরের একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে আঠারো বছর বয়সী একটি ছেলে, এই গল্প নিয়ে সিনেমা?' না, হতে পারতো না। পুরুষ সে যত বৃদ্ধই হোক, যত কুৎসিত হোক, সে পুরুষ। সে বিরাট সে মহান। তাই বিরাটের প্রেমে পড়া সহজ। ষাট বছরের নারী সে যা কিছুই হোক, যত জ্ঞানী হোক, যত গুণী হোক, যত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী সে হোক না কেন, তার একটিই পরিচয় সে বৃদ্ধা, লোলচর্মসর্বস্ব বৃদ্ধা। নারীকে বিচার করা হয় তার শরীর দিয়ে। শরীর গেল তো নারী গেল। পুরুষ যায় না। অমিতাভ তাঁর বলিরেখা নিয়েও কিশোরীর প্রেমিক হতে পারেন, মেগাস্টার হিসেবে ভূভারতে চুটিয়ে রাজত্ব করতে পারেন। মাধবী কিন্তু তাঁর বলিরেখা নিয়ে আর যাই হোন, তারকা হতে পারেন না। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর লোলচর্ম নিয়েও তারকা হয়ে শহর জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। সুচিত্রা সেনকে বছরের পর বছর ঘরবন্দি হয়ে থাকতে হচ্ছে। রেখাকে টিকে থাকতে হয় বলিরেখা নির্মূল করে, অমিতাভর তার দরকার পড়ে না।

এ কেবল উদাহরণ মাত্র। সমস্যা সিনেমা জগতে নয়। সমস্যা সমাজে। মেয়েদের সৌন্দর্যই মেয়েদের সম্পদ, এই ধারণা বা বিশ্বাসটি সম্পূর্ণই রাজনৈতিক। রাজনৈতিক, কারণ এটি পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখছে। মেয়েদের সৌন্দর্যকে মেয়েদের সম্পদ বলে বিবেচনা করা না হলে মেয়েদের শিক্ষা সচেতনতা, বোধ বুদ্ধি, দক্ষতা বিচক্ষণতা ইত্যাদি গৌণ না হয়ে মুখ্য হয়ে উঠবে। উঠলেই বিপদ পুরুষতন্ত্রের। নারীকে আর খেলনা পুতুল বানিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না।

কোনও একটি ব্যবস্থাকে যদি দীর্ঘ-দীর্ঘকাল সমাজে টিকিয়ে রাখতে হয়, তবে সেটির পেছনে তুখোড় রাজনীতি কাজ করে। শিশুকে জন্মের পর থেকে লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যে লালন করা, এবং মস্তিষ্কে পুরুষ সামনে, নারী পেছনে, পুরুষ বুদ্ধিমান, নারী বোকা, পুরুষ প্রভু, নারী দাসী-র শিক্ষাটি ঢুকিয়ে দেওয়া সামাজিক নয়, রাজনৈতিক। পুরুষতন্ত্রের বা পুরুষবাদের রাজনীতিটি এত শক্তপোক্ত যে জগতে পুঁজিবাদে চিড় ধরে, সমাজতন্ত্র ভেঙে যায়, কিন্তু পুরুষতন্ত্র যেমন ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে থাকে, আগের চেয়ে আরও মজবুত হয়ে।

নারীর কিছুই নারীর নিজের নয়। নিজের যে জীবন, সে জীবনটিও নারীর নয়।

নারী পুরুষের সম্পত্তি, শুধু পুরুষেরই নয়, পুরুষ শাসিত এই 'সমাজের সম্পত্তি'। সমাজ কড়া নজর রাখে নারীর যৌনাঙ্গ অক্ষত আছে কি না, নারীর পোশাক আশাক চাল চলন 'সঠিক' কি না, বয়স থাকতেই বিয়ে হল কি না, স্বামীসেবা ঠিকঠাক সে করছে কি না,পুত্রসন্তান জন্ম দিচ্ছে কি না, সতীলক্ষ্মী হিসেবে জীবন পার করছে কি না। সমাজকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে সমাজ নারীর শাস্তির ব্যবস্থা করে। কঠিন শাস্তি।

নারীর সতীত্বের দিকে লোকের যে কড়া নজর ছিল, সেটি এখন, বিশেষ করে পশ্চিমের দেশগুলোতে, সরে এসেছে নারীর শরীরের আকার আকৃতির দিকে। পুবের দেশে এখনও কড়া নজর সতীত্বের দিকে যেমন ছিল, তেমন আছেই, বরং নতুন একটি নজর তৈরি হয়েছে, সেটি মেয়েদের শরীরের দিকে। গলা, ঘাড়, বুক, পেট, তলপেট. উরু, পা ইত্যাদির আকৃতি কেমন হবে, তা বলে দেওয়া আছে, সেই মতো না হলে মেয়েদের ওপর হুমকি আসে, ধিক্কার আসে, ছিছি আর চুকচুক চলে। অল্প বয়সী মেয়েরা মেয়ে-পছন্দের বাজারে টিকে থাকার জন্য খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে বুলেমিয়া, অ্যানোরেক্সিয়া রোগে ভুগছে। শরীরের কোন আনাচে কোন কানাচে কী খাঁজ কী ভাঁজ থাকলে লোকের চোখ জুড়োবে, তার পেছনে মেয়েরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যাচ্ছে। জায়গা মতো ভাঁজ চাই, বেজায়গায় ভাঁজ পড়ে গেলে মাখতে হচ্ছে ভাঁজ দূর করার দামি ওষুধ, তাতেও কাজ না হলে দৌড়োতে হচ্ছে কসমেটিক সার্জারির জন্য।

আহা, উনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের মডেল করে যত বিখ্যাত রংচিত্র আর ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে, আজ দেখলে কি মনে হবে না, সব মেয়েই বুঝি ন' মাসের গর্ভবতী ছিল! মেয়েদের যে শরীরটিকে কিছুকাল আগেও স্বাভাবিক বলে ভাবা হত, আজ সেটিকে অস্বাভাবিক বলা হচ্ছে। মেয়েদের শরীর কী হবে কেমন হবে তার সিদ্ধান্ত মেয়েরা কোনওদিনই নিতে পারেনি। যে মেয়েরা পুরুষতন্ত্রের কোলাবরেটর হিসেবে নাম করছে, সেই আধুনিক মেয়েরা এখন মেয়েদের সাজাবার দায়িত্ব নিয়েছে। পণ্যকে আরও আকর্ষণীয় পণ্য হিসেবে পুরুষের সামনে পরিবেশন করার দায়িত্ব।

'মেয়েরা সুন্দর', — নারী-প্রগতির বিরুদ্ধে এটি একটি ধারালো রাজনৈতিক অস্ত্র। মেয়েদের এই সৌন্দর্য যেন টিকে থাকে, তারা যেন অসুন্দর হিসেবে চিহ্নিত না হয় — এই চাপটি মেয়েদের ওপর প্রচণ্ড। তাদের এখন দিনরাত গাধার খাটনি খাটতে হচ্ছে, অঢেল খরচা করতে হচ্ছে প্রসাধনের পেছনে। দিনে কত কোটি টাকার প্রসাধন সামগ্রী মেয়েরা ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে! মুখে, গালে, নাকে, চোখে, ভুরুতে, চুলে, চিবুকে মাখবার জন্য কত রং, কত কেমিক্যাল, কত আঠা, কত কালির এখন রমরমা বাজার! কেন? মুখ যা আছে তার, তা যথেষ্ট নয়? গাল চোখ ভুরু পারফেক্ট নয়? মেয়েরা তবে কি জন্মায় 'ইমপারফেক্ট' হয়ে? অ্যাবনরমাল হয়ে? পঙ্গু হয়ে? তাই কি তাদের এটা ঝরিয়ে, ওটা বাড়িয়ে, এটা মাখিয়ে, ওটা তাড়িয়ে পারফেক্ট হতে হবে! তাদের পঙ্গুত্ব দূর করতে হবে? নিজেদের পারফেক্ট বানানোর দায়িত্ব যে মেয়েরা

নিচ্ছে, তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করে যে এছাড়া তারা ঠিক 'সঠিক' বা 'সম্পূর্ণ' নয়। এই মিথ্যেটি তারা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে স্বীকার করে বা মেনে নেয়। এই মিথ্যেটি মেনে নেওয়া মানে মেয়েদের মানুষ বলে মোটেও মূল্য না দেওয়া। এই মিথ্যেটি মেনে নেওয়া মানে মেয়েদের ঘৃণা করা, জঘন্যভাবে তাদের অপমান করা, এবং তাদের পণ্য করার রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

মেয়েরা দেখতে কেমন হবে, তার বিজ্ঞাপন সবখানে। সিনেমায়, টিভিতে, বিলবোর্ডে, পত্রিকায়, পুতুলে। নিস্তার নেই। সৌন্দর্যের গ্যাঁড়াকলে মেয়েদের এমন আটকে দেওয়া হয়েছে যে সৌন্দর্যচর্চার পেছনেই ব্যয় করতে হবে জীবন, জীবনের সব উপার্জন। নিজের অধিকার-অনধিকার বিষয়ে ভাবনার কোনও অবকাশ পাবে না। গাঁটের টাকা এমন ফুরোবে চর্চায়, যে, শেষ সম্বল বলেও কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না। ধূর্ত জালে আটকা পড়েছে আমাদের চারাপোনারা। জরিপ করলে দেখা যাবে শতকরা নব্বই ভাগ মেয়ে মনে করছে তারা যথেষ্ট সুন্দর নয়, বুকগুলো ছোট, ঠ্যাংগুলো চিকন, কোমরটা মোটা, পাছাটা বেঢপ, চুলগুলো পাতলা, রংটা ময়লা, নাকটা বোঁচা, চোখদুটো ছোট, চামড়াটা কোঁচকানো — নিজের শরীরের কিছু না কিছু নিয়ে মেয়েদের অসন্তোষ আর গ্লানি দিন দিন বাড়ছে। মেয়েদের নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেওয়ার রাজনীতিটি ভয়ংকর। আত্মবিশ্বাস না থাকলে, নিজেকে নিয়ে ভয়ভাবনা দূর না হলে পুরুষতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস এবং শক্তি দুটোই কর্পূরের মতো উবে তো যায়ই, নিজের স্বাধীনতার প্রশ্নে জরুরি সচেতনতাও মরে পচে নষ্ট হয়।

সবচেয়ে দুঃখজনক এই যে, শিক্ষা স্বনির্ভরতা মেয়েদের সামনে এগিয়ে নিচ্ছে এক পা, পিছিয়ে নিচ্ছে দুই পা। শিক্ষিত এবং স্বনির্ভর মেয়েদের মধ্যে নিজের শরীর নিয়ে হতাশা হুহু করে বাড়ছে, বাড়ছে বলেই সমস্ত মেধা খরচ হচ্ছে শরীরের পেছনে। মৌলিকতা বিদেয় করে কৃত্রিমতা দিয়ে তারা এমন মুড়ে রাখার চেষ্টা করে শরীর, যেন এ শরীর প্রসাধন বাণিজ্য, প্রচার মাধ্যম আর পুরুষতন্ত্রের যোগসাজসে প্রস্তাবিত নারীর শরীরের সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায়। মিলে গেলেই জয়। নারীকে এভাবেই জয়ী হতে শিখিয়েছে সমাজ। নারীর বোধ বুদ্ধি বিসর্জন দিতে এভাবেই নারী শিখেছে।

আজকালকার মেয়েদের থেকে শুধু তাদের দিদিমারা নয়, দিদিমাদের মা-দিদিমারাও এ ব্যাপারে অনেক বেশি স্বাধীন ছিল। সুন্দর হওয়ার চাপ তাদের ওপর ছিল না। দাসী হওয়ার গুণ থাকলেই চলতো তখন। এখন শুধু দাসী হলেই চলবে না, 'রূপসী দাসী' হতে হবে। সঠিক মাপের বুক কোমর ঠ্যাং নিতম্ব না হলে পাশ হবে না। ত্বক টানটান না হলে, ত্বকে সঠিক রং না হলে পাশ নেই। জগত পুরুষের, সমাজ সংসার পুরুষের, এখানে নারী আসলে গোটাটাই 'শরীর', আর কিছু নয়।

পুরুষতন্ত্রের নিয়মই হল, মানুষ হিসেবে মেয়েদের প্রাপ্য অধিকার দুমড়ে মুচড়ে

নষ্ট করা, মেয়েদের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার না করা, নিজেদের স্বার্থে মেয়েদের ব্যবহার করা। মেয়েদের মূল্য না দেওয়া। নারী-অধিকার আন্দোলনের ফলে যখনই মেয়েদের মূল্য বাড়ানোর চেষ্টা চলে, তখনই তা যে করেই হোক কমিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা পুরুষতন্ত্রের পবিত্র কর্তব্য।

মেয়েদের মূল্য যখন কমতে থাকে, শরীরই মেয়েদের একমাত্র পরিচয়পত্র হয়ে দাঁড়ায়, যেটি দেখিয়ে তার জীবন চলে। মূল্য কমলে মেয়েদের সাজগোজ বাড়ে, বিউটি পার্লারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মূল্য কমলে পণের টাকা বাড়ে। গৃহবধূত্ব বাড়ে। বেশ্যাবৃত্তি বাড়ে। কন্যাভ্রুণহত্যা বাড়ে। গৃহনিগ্রহ বাড়ে। ধর্ষণ বাড়ে। নারীহত্যা বাড়ে। সমাজে মেয়েদের মূল্য কম বলেই নারীবিরোধী সব ক্রিয়াকাণ্ড এত নির্বিঘ্নে এবং নিশ্চিন্তে চলতে পারছে।

পুরুষ এবং পুরুষতন্ত্রের চাহিদা অনুযায়ী মেয়েরা যখন এক শরীর shape আর beauty বনে থাকে, নিজের জীবনটি তখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ কিছুতে পরিণত হয়। সমানাধিকারের জন্য চেঁচানোর কণ্ঠটি তখন আপনাতেই বুজে আসে। টোপ গিললে কি আর গালি দেওয়া যায় কাউকে? আপস করলে কি আর রুখে ওঠা যায়?

পুরুষতন্ত্র সম্ভবত আর অন্য ষড়যন্ত্রে তত সফল নয়, যত সফল মেয়েদের বিরুদ্ধেই মেয়েদের লেলিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে।

ভারতবর্ষে বেঁচে থাকবে শুধু পুরুষরাই

প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে নারী পুরুষের আনুপাতিক হার সাধারণত এমনই থাকে, নারী বেশি, পুরুষ কম। একহাজার পুরুষে একহাজার পাঁচ-এর মতো নারী। সুস্থ সমাজ হলে তাই থাকে। কিন্তু অসুস্থ হলে হেরফের হয়। অসুস্থতা ভারতে আগেই ছিল কিছু কিছু সম্প্রদায়ে, এখন সেটি মহামারির আকার ধারণ করেছে। বিশ্বাস কারও হোক বা না হোক, এটি সত্য।

উনিশশ বিরানব্বই সালে জয়ললিতা মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালীন তামিলনাড়ুর সরকার একটি দোলনা-ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। অনাকাঙ্ক্ষিত মেয়েশিশুদের ওই দোলনায় রেখে যাবে লোকেরা। কিন্তু সাতাত্তরটি শিশু সে বছর দোলনায় জোটে বটে, দত্তক দেওয়ার আগে বেঁচে থাকে মাত্র কুড়িটি। এই ব্যবস্থার প্রতি কারও আর আস্থা থাকেনি। উনিশশ তিরানব্বই সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর অবধি দেখা গেছে তামিলনাড়ুর ওই অঞ্চলে এগারোশ চুরানব্বইটি মেয়ে শিশু জন্ম নেয়, একশ ছাপ্পান্নটি মেয়েশিশুকে হত্যা করা হয়েছে, ২৪৩টি মেয়েহত্যা রোধ করা হয়েছে, আর দোলনায় জুটেছে মাত্র সাতটি শিশু। দোলনা প্রকল্পটি শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

ভারতের উত্তরাঞ্চলের চেয়ে দক্ষিণাঞ্চলে চিরকালই মেয়েদের মর্যাদা তুলনায় বেশি ছিল। কেরালায় এমনকী মাতৃকুলভিত্তিক সমাজ ছিল এক সময়। মায়ের সম্পত্তি মেয়ে পেত। বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীর বাড়ি ঘর করতে যেত না। নিজের বাড়িতে দাপট নিয়ে থাকতো, স্বামী এসে মাঝে মাঝে কিছুদিন কাটিয়ে যেত। ওই মাতৃকুলভিত্তিক সমাজ ভেঙে গেলেও কেরালায় মেয়েদের মান মর্যাদা ভারতের অন্য যে কোনও রাজ্য থেকেই বেশি ছিল। ছেলের অনুপাতে মেয়ে বেশি ছিল। মেয়েরা শিক্ষিতও বেশি, স্বনির্ভরও বেশি। মেয়েদের এমন স্বর্গরাজ্য কেরালাতেও এখন মেয়েহত্যা চলছে। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটকও বদলে যাচ্ছে। বিশেষ করে তামিলনাড়ু। এই রাজ্যের কিছু গ্রামে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হচ্ছে মেয়েদের, সম্ভব হলে জন্মানোর আগে, সম্ভব না হলে পরে। উসিলামপট্টি, সালেম, ধরমপুর, উত্তর আরকট, পেরিয়ার, দিন্দিগুল, মাদুরাই অঞ্চলগুলো মেয়েশিশুহত্যাঅঞ্চল বলে চিহ্নিত। তামিলনাড়ুর কিছু অঞ্চলে মেয়েশিশুকে হত্যা করার একটি নাকি ঐতিহ্যই আছে। মা ঠাকুরমারা সদ্যজাত কন্যার মুখে দুধের ফোঁটা দেয়, যে দুধে মিশিয়ে দেয় হলুদ করবীর গুঁড়ো। যারা খুব বিজ্ঞানী বিশ্বাসী, তারা দুধের সঙ্গে কিছু ঘুমের ওষুধ

গুঁড়ো করে মিশিয়ে দেয়, নয়তো সামান্য কীটনাশক। মেয়েশিশু হত্যা কেবল ওই কিছু অঞ্চলেই নয়। ঐতিহ্যটি যেন দেশ জুড়েই। তবে হত্যার পদ্ধতিটি একেক জায়গায় একেকরকম। গুজরাটে মায়েরা তাদের কন্যাদের দুধের মধ্যে ডুবিয়ে মারে, আর পাঞ্জাবে মাটির হাঁড়িতে কন্যাকে পুরে সেই হাঁড়ির ঢাকনা ভালো করে বন্ধ করে হাঁড়ি মাটির তলায় পুতে রাখে। অনেকে জানে না যে মেয়েশিশু হত্যা কোনও অপরাধ। এটিকে খুব স্বাভাবিক কাজ বলেই অনেক সম্প্রদায়ের ধারণা।

শিশুহত্যা নৃশংস। আজকাল আবার থানা পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে। তাই সবচেয়ে নিরাপদ মেয়েভ্রুণ হত্যা। যেহেতু দেখতে নৃশংস নয়, অপরাধবোধের প্রশ্ন ওঠে না। স্ক্যানিং এখন সস্তায় করা যাচ্ছে। গহন গ্রামের ভেতরেও ঢুকে গেছে লিঙ্গ নির্ণয় আর গর্ভপাতের সব রকমের আধুনিক ব্যবস্থা। আগে মানুষ মন্দিরে মন্দিরে দৌড়োতো ভগবানের কাছে ছেলে চাইতে, সাধু সন্ন্যাসীর পেছনে টাকা ঢালতে হত, এখন আর তুকতাকের দরকার নেই, ভগবানের চেয়েও শক্তিশালি মাধ্যম এসে গেছে ভারতে, বিজ্ঞান। স্ক্যান মেশিন, অ্যামনিওসেনথেসিস, এবং আরও কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে জরায়ুর ভ্রূণের লিঙ্গ দেখে, 'ঠিক লিঙ্গ' না হলেই জরায়ু থেকেই বিদায়। ঠিক লিঙ্গ পুং, বেঠিক লিঙ্গ স্ত্রী। সুস্থ লিঙ্গ পুং, পঙ্গু লিঙ্গ স্ত্রী।

তামিলনাড়ুর মেয়েরা স্বীকার করছে তারা তাদের কন্যাদের হত্যা করছে, মোটেও তারা দুঃখিত নয় এ কাজে। একটুও অনুশোচনা কেউ করছে না। ক্রোধী ক্রোন্দসীরা বলছে, 'তোমরা কী চাও? কী করবো আমাদের মেয়েদের? কেন তাদের আমরা বাঁচতে দেব? যেন নির্যাতিত হয়, যেমন আমরা হচ্ছি? যেন যন্ত্রণায় ভোগে জীবনভর, যেমন আমরা ভুগছি?'

সমাজে মেয়েরা এই শিক্ষা পেতে পেতে বড় হয় যে মেয়েদের জীবনের আদৌ কোনও মূল্য নেই, পুরুষকে সুখী এবং তৃপ্ত করতে না পারলে মেয়েরা অক্ষম অথর্ব এবং অর্থহীন জীব হিসেবে সামাজিক নিন্দা ঘৃণার শিকার হবে। এ তো সত্যিই যে, মেয়েদের বোধ বুদ্ধি বিচক্ষণতার, দক্ষতা পারদর্শিতার কোনও মূল্য দেওয়া হয় না, মেয়েদের যৌনতাকে পণ্য করা হয়, চরিত্রকে দুর্বল বলে ভাবা হয়, মেয়েদের জাতটাকেই 'নিচু জাত' বলে বিশ্বাস করা হয়। মেয়ে হয়ে জন্মালে কীরকম দুর্বিষহ হয়ে ওঠে জীবন, তা জেনে বুঝে মেয়েরা কেবল পুত্রসন্তান চাইছে, কোনও কন্যা সন্তান চাইছে না। পারিবারিক এবং সামাজিক চাপই মেয়েদের বাধ্য করছে কন্যাহত্যা বা কন্যাভ্রুণহত্যা করতে। মেয়েরা এই হত্যাযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করছে ঠিকই, কিন্তু দোষ কেন তাদের দেব! তারা এই খেলায় ঘুঁটি মাত্র। আইনে এই হত্যা অপরাধ। সত্যিকার অপরাধিকে শাস্তি না দিয়ে আজকাল শাস্তি দেওয়া হয় মেয়েদের। এই কুৎসিত লিঙ্গ বৈষম্যের সমাজে ভ্রুণহত্যা বা শিশুহত্যার দায়ে মেয়েদের শাস্তি দিলে মেয়েরা কিন্তু দুবার শাস্তি পায়। এক মেয়ে হয়ে জন্মানোয়, দুই মেয়ে হয়ে অন্য কাউকে জন্মাতে বাধা দেওয়ায়। মেয়েরা হত্যা কেন করে, কন্যা জন্ম দিলে লাথি খেতে হয়, বেশি কন্যা জন্ম দিলে স্বামী তাড়িয়ে দেয়,

বাপের বাড়িতেও তার জায়গা হয় না। তাই কন্যাহত্যা করে তারা নিজের কন্যাকে তো বাঁচায়, নিজেকেও বাঁচায়।

আইনত নিষিদ্ধ হলেও বহাল তবিয়তে চলছে ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা। নারীনির্যাতনও তো আইনত নিষিদ্ধ। চলছে না? চার দেওয়ালের ঘরের মধ্যে কার আইন চলে? ওখানে চলে পুরুষ কর্তার আইন। পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে পুরুষ শাসিত এই সমাজে পার পাবে কোন মেয়ে? কে তাকে বাঁচতে দেবে বাকি জীবন?

বিরানব্বই সালে তামিল নাড়ুর মেয়েশিশুদের নিরাপত্তা দেওয়ার একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়, ২০০০ সালের মধ্যে শিশুহত্যা নির্মূল করার জন্য। এক বা দুই মেয়ে যাদের আছে, কোনও পুত্র নেই, তাদের টাকা দেওয়া হবে যদি বাবা মার একজন বন্ধ্যাকরণ করেন। মেয়ের নামে টাকা জমা হবে ফিক্সড ডিপোজিটে, যতদিন না মেয়ের ২১ বছর বয়স হয়। মেয়ের ইস্কুলের খরচপাতি বাবা মার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। স্কিমে প্রতিবছর ২০,০০০ পরিবারকে নেওয়া হচ্ছিল। বিরানব্বই সালে সালেম ডিস্ট্রিক্টে ৬১৪ টি মেয়ে টাকা পেল, পেল দেড় বছর পর্যন্ত। স্কিমটি শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হল। নানারকম বাধা বিপত্তি। মাস্তান পুলিশ সুদখোর ঘুসখোর ঢুকে সব্বনাশ করলো প্রকল্পটির । ২১ বছর বয়সে যখন মেয়ের নামে জমা হওয়া টাকাটা তোলা হবে সেই টাকা এক পণ দেওয়া কাজে ছাড়া অন্য কিছুতে ব্যবহার হবে না। কোনও স্কিমই বুঝি সত্যিই মেয়েদের অবস্থা বদলাবে না।

৬ বছর বয়স অবধি ছেলে মেয়ের সংখ্যার আনুপাতিক হার হওয়া উচিত খুব কম করে হলেও ছেলে ১০০০, মেয়ে ৯৫০। বয়স বাড়লে এটি পাল্টে যায়, মেয়ের সংখ্যা বাড়ে, ছেলের সংখ্যা কমে। কারণ ছেলেদের চেয়ে বাঁচার ক্ষমতা মেয়েদের বেশি। যত্নআত্তি পেলে মেয়ের সংখ্যা ১০০৫ হয়। সমানাধিকার পেলে মেয়ের সংখ্যা ছেলের অনুপাতে অনেক ওপরে ওঠে। কিন্তু ছ বছর অবধি মেয়ে-শিশুর সংখ্যা যদি ৯৫০এর কম হয়, বুঝে নিতে হবে নির্ঘাত হত্যা করা হচ্ছে মেয়েদের।

অমর্ত্য সেনএর এক গবেষণায় দেখা যায় যে, তিন কোটি সাত লক্ষ মেয়ে এই ভারতে, ১৯৮৬ সালে, 'মিসিং'। এই যে মেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে, এ কিন্তু হঠাৎ করে ঘটছে না। এ বহুকালের পুত্রপিপাসার ইতিহাস। বহু কাল ধরেই অন্যান্য যে কোনও দেশের চেয়ে কম মেয়ে সংখ্যা এই ভারতে। ১৯০১ সালের আদমসুমারিতে দেখা যায় প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের সংখ্যা ছিল ১০০০ ছেলেয় মাত্র ৯৭২ মেয়ে। সেই থেকে বছর যত যাচ্ছে মেয়ের সংখ্যা আরও কমছে। ২০০১ সালে ৯৩৩। ১০০০ ছেলেয় ৭০ জন মেয়ে কম। হিসেব তা হলে এই, একশ কোটির দেশে সে বছর ৭ কোটি মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। এত বিশাল দেশ ভারত, এই ভারতের একটি রাজ্য নেই যেখানে মেয়েশিশু সংখ্যা হ্রাস পায়নি। কিছু কিছু রাজ্যে মেয়েশিশু সংখ্যা ৮০০র নিচে চলে গেছে। পাঞ্জাব হরিয়ানা হিমাচল প্রদেশ গুজরাট মহারাষ্ট্র। পাঞ্জাবের গুরদাসপুরে তো ১০০০ ছেলেয় ৭২৯ মেয়ে। গুজরাটের মেহসানায় ৭৫২। তামিলনাড়ুর সালেমে

যেখানে ৭৬৩, হরিয়ানার আমবালায় ৭৭২। উত্তর প্রদেশের সাহজাহানপুরে ৬৭৮। এসব অঞ্চলে ১০০০এ ২০০ করে মেয়ে বেপাত্তা। পাঞ্জাব হরিয়ানায় ১৯৯১ সালের পরেই বাজার কথা বিপদঘন্টি। কিন্তু কেউ হয়তো অনুমান করেনি দশ বছরে আরও কত নেমে যেতে পারে সংখ্যা। ১৯৯১ সালে কোনও রাজ্যেই ৮০০র কম মেয়ে ছিল না, কিন্তু দশ বছরের মধ্যেই মোট চারটে রাজ্যে মেয়ের সংখ্যা ৮০০র চেয়ে কম।

এনজিওগুলো বলে যে, নারী শিক্ষিত ও উপার্জনক্ষম হলে মেয়েশিশু বা মেয়েভ্রূণ হত্যা বন্ধ হবে। বেশির ভাগ মানুষের বিশ্বাস পরিকল্পিত মেয়েহত্যা বুঝি গরিব এবং অশিক্ষিতদের মধ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু ঘটনা তার উল্টো। ভারতে সবচেয়ে বেশি ছেলের অনুপাতে মেয়ে কম এখন দক্ষিণ দিল্লিতে, যেখানে শিক্ষিত এবং ধনীদের বাস। সবচেয়ে বেশি বিলুপ্তি ঘটেছে সেখানে। বড় বড় রাজনীতিবিদদের নাকের ডগায় ঘটছে হত্যাযজ্ঞ। ৯০৪ থেকে দশ বছরে ৮৪৫। ২৪,০০০ মেয়েশিশুকে এই দক্ষিণ দিল্লি থেকে প্রতিবছর উধাও করা হচ্ছে। গুজরাটের প্যাটেল বংশে বিস্ময়। ধনী কৃষক ওরা। অথচ মেয়ের চিহ্ন নেই ওদের গ্রামগুলোয়। চণ্ডিগড়ে ৮৫৩ মেয়ে। চণ্ডিগড় শহরে হার আরও কম, ৮৪৪। ভারতে দরিদ্র এবং অশিক্ষিত এলাকার চেয়ে ধনী এবং শিক্ষিত মানুষের এলাকায় মেয়েশিশুর হার কম। হত্যা বেশি হচ্ছে ওখানেই। মেয়েদের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে চলছে হলোকস্ট। গণহত্যা। পশ্চিমবঙ্গে অন্য যে কোনও অংশের চেয়ে কলকাতায় মেয়েশিশুর বিলুপ্তি বেশি।

১ কোটি মেয়েভ্রূণের গর্ভপাত হয়েছে ভারতে, গত দু দশকে। ১৯৯৭ সালে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির বছরে পাঁচ লক্ষ মেয়ে ভারতের মাটিতে জন্মানোর স্বাধীনতা পায়নি, যে ভারত কিনা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'গণতন্ত্র' নিয়ে গর্ব করে।

এ দেশে মেয়েরা খুব দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরে লালন করা নারী বিরোধী কুসংস্কার। বেশ কিছু সম্প্রদায়ে পুত্রদেরই সন্তান বলে মনে করা হয়, কন্যাদের নয়। ১৯৮০ সালের আগ অবধি মেয়েশিশুদের জন্মানোর পর হত্যা করা হত। তখন জরায়ুর ভেতরে থাকা অবস্থায় মারার চল শুরু হয়নি। ভ্রূণহত্যা যে হারে বাড়ছে, এটি নিষিদ্ধ করার পরও, এতে আশংকা হয় যে সমাজে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি না হওয়াতক এই হত্যাকাণ্ড, এই রক্তপাত রোধ করার কোনও উপায় নেই। উত্তর ভারত এমন ভয়াবহ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, যে, আশংকা করা হচ্ছে ২০২১ সালে বোধহয় মেয়ে বলতে কিছুই থাকবে না।

হত্যার মাধ্যমে মেয়েদের নানা ঝামেলা উপদ্রব নির্যাতন নিষ্পেষণ থেকে নিরাপত্তা দেওয়া, সেটা আজকের ঐতিহ্য নয়, বহু বছর ধরেই ছিল। দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরে মেয়েরা শিখে আসছে বেঁচে না থাকাটাই এই সমাজে তাদের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা। ব্রিটিশরা মেয়েহত্যা এলাকা চিহ্নিত করেছিল তাদের রাজত্বেই। ১৮০৫ সালে সৌরাষ্ট্রের জাদেজা রাজপুতদের মধ্যে মেয়েশিশুহত্যার চল ছিল, ওরা বার করেছিল। পূর্ব উত্তর প্রদেশে একটা গ্রাম ছিল তখন, কোনও মেয়েশিশু ছিল না

গোটা গ্রামে। ১৮০৮ সালে বরোদার শাসক আলেকজান্ডার ওয়াকার সমন পাঠিয়েছিল সব সম্প্রদায়ের প্রধানদের কাছে, সবাইকে বলেছিল মুচলেকা লিখে যাও যে মেয়েশিশু হত্যা আর করবে না। ১৮৭০ সালে মেয়েশিশুহত্যা রোধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৮৯৮ সালে সরকার মেয়েশিশুহত্যাকে অপরাধ বলে রায় দেয়। মেয়েশিশু হত্যা রোধ আইনও প্রণয়ন করা হয়েছিল, একসময় রাজনৈতিক কারণেই ওটি উঠে যায়।

নৃতত্ত্ববিদরা বলেন, সভ্যতার শুরু থেকে দেখা গেছে যখন খাদ্যের অভাব হয়েছে, মেয়ে আর শিশুদের হত্যা করা হয়েছে। ডারউইন বলেছেন, মেয়েদের হত্যা করা হত জন্মের সময়, এর কারণ কিন্তু তাদের মৃত্যুটা সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দরকার ছিল বলে নয়। কারণ পুরুষ শাসিত সমাজ মেয়েদেরকে বোঝা বলে মনে করতো।

ভারতে সেই উনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েশিশুহীন বেশ কয়েকটি গ্রামের কথা নথিপত্রে উল্লেখ আছে। কিছু এলাকায় ছিল ৩৪৩টি ছেলে, ৫৪টি মেয়ে। বোম্বেতে ১৮৩৮টি ছেলে, আর মেয়ের সংখ্যা ৬০৩। আরও পেছনে গিয়ে যদি খুঁজতে যাই, কী পাবো? মেয়েশিশুহত্যার চল হয়তো বৈদিক যুগ থেকেই ছিল। অথর্ব বেদের কথা, 'মেয়েশিশুকে অন্য কোথাও জন্মাতে দাও, এখানে জন্মাতে দাও ছেলেশিশুকে। পুত্র হল সম্পদ। পুত্র আশীর্বাদ। বৃদ্ধ বয়সে পিতাকে শক্তি দেবে পুত্র। পুত্র মুখাগ্নি করবে পিতার, তাই পিতা স্বর্গে যাবে। পুত্রই পিতাকে নরক থেকে মুক্ত করবে।'

নারীর ভূমিকা কী! নারী পুত্র সন্তান জন্ম দেবে। নারী হচ্ছে জমি, যে জমিতে পুরুষ তার বীর্য নিক্ষেপ করবে পুত্র উৎপন্ন হওয়ার জন্য। মনু বলেছেন, 'দিন রাত মেয়েদের নির্ভর করতে হবে পুরুষের ওপর।' বলেছেন, 'তার পিতা তাকে রক্ষা করে যখন সে শিশু, স্বামী যখন সে যুবতী, পুত্র যখন সে বৃদ্ধা। স্বাধীনতা নারীর জন্য নয়। নারী এর যোগ্য নয়।'

প্রথম মেয়েদেরকে 'পরনির্ভর' থাকতে বলা হচ্ছে, তারপর তাদের বলা হচ্ছে, তারা একরকম 'বোঝা'। তবে সত্য এই, মেয়েদের সেই আদিকাল থেকে এই এখন অবধি পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে রাখা হয়েছে।

দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরে মেয়েশিশু হত্যা করে এসে এখন মেয়েশিশুর গর্ভপাত ঘটানো ঐতিহ্যের বাইরের কোনও কাজ নয়। এ অনেকটা আগাছা তোলার মতো পুত্রউৎপাদনের জন্য রাখা জরায়ুর মাটি থেকে মেয়ে তুলে ফেলে দেওয়া। এমন পুত্রপিপাসু জাতির জন্য কন্যাহত্যা তো আশ্চর্যের কিছু নয়।

রামচন্দ্রের পিতা রাজা দশরথ পায়েশ খাওয়ালো তিন স্ত্রীকে, অমনি স্ত্রীরা জন্ম দিয়ে দিল চারটে পুত্রসন্তান। পুরাণের সেই জাদুর পায়েশ ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের কোথাও কোথাও এখনও স্ত্রীদের খাওয়ানো হয়, যেন পুত্র জন্ম দেয়।

কারও কারও মতে, সীতা এই সমাজের মেয়েশিশুহত্যাযজ্ঞের শিকার, পরে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। রাজা জনক সীতাকে মাটির তলায় পুঁতে রাখা একটা হাঁড়িতে পেয়েছিল। যেখানে পাওয়া গিয়েছিল, সেখানকার ঐতিহ্য হল — হাঁড়িতে জীবন্ত মেয়েশিশুকে পুরে, এক টুকরো গুড় আর একটু সুতো সঙ্গে দিয়ে হাঁড়ির ঢাকনা শক্ত

করে লাগিয়ে মাটির তলায় পুঁতে চেঁচিয়ে লোকে বলতো, 'গুড় খা, ওখানেই থাক, কখনও ফিরে আসিস না, তোর ভাইকে পাঠিয়ে দে।' সম্ভবত, 'রাম এবং সীতা দুজনই সেক্স সিলেকসানের প্রাচীন ফর্মের প্রডাক্ট।'

পুত্র পিপাসায় ধর্মে জাতিতে কোনও ভেদ নেই। বাদশা আকবর পুত্র চেয়ে শেখ সেলিম চিশতির আশীর্বাদ নিল। পুত্র হল। পুত্রের নাম রাখা হল সেলিম আর ফতেপুর সিক্রি নামের চমৎকার একটি শহর তৈরি করা হল পুত্রের জন্ম উৎসব করার জন্য।

এ দেশের আনাচে কানাচে গলি ঘুপচিতে আছে ধর্মশালা, যেখানে গিয়ে পুত্র কামনা করা যায়। হিন্দু, শিখ, মুসলিম, বৌদ্ধ সবারই প্রয়োজন পুত্রের। ভারত ছেয়ে যাচ্ছে বাবায়। বাবাদের দ্বারে ধর্না দেওয়া হয়েছে, ফকির কোবরেজ অনেক হয়েছে। ভগবান, বাবা এরা এখন কেউই আর এত পারফেক্ট নয়। বিজ্ঞান পারফেক্ট। বিজ্ঞান এখন মানুষকে ঝাঁড় ফুক তুকতাক ভগবান বাবা থেকে উদ্ধার করতে এসেছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেও, নানা পুজো আর্চা করেও এত ভালো ফল কোনওদিন পাওয়া যায়নি, বিজ্ঞান যে ফলটি তাদের দিচ্ছে। বিজ্ঞান আসাতে এখন দেখে নেওয়া যাচ্ছে পেটের ভেতর বাচ্চাটির লিঙ্গ, লিঙ্গ পছন্দ না হলেই লিঙ্গসহ বাচ্চাকে হাওয়া করে দেওয়া হচ্ছে। ট্রেডিশান আর টেকনোলজির এমন সমন্বয় পৃথিবীর অন্য কোথাও এত বীভৎস ভাবে নেই।

'অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভ বিদেয় করা যায় বিজ্ঞানের মাধ্যমে', বিজ্ঞানের লোকেরা এমন দাবিও করেছিল শুরুতে। স্ক্যান তো আছেই, এলো অ্যামনিওসেনথেসিস। ভ্রুণে কোনও অস্বাভাবিকতা বা ডিফরমিটি বা পঙ্গুত্ব আছে কি না দেখার জন্য। কিন্তু সে উদ্দেশে ভারতে এই পরীক্ষাটি করা হয় না। করা হয় লিঙ্গ দেখার জন্য। যেই না স্ত্রীলিঙ্গ, অমনি গুডবাই। এদেশি মানসিকতায় তবে ভ্রুণের অস্বাভাবিকতা লিঙ্গেই লুকিয়ে আছে, পঙ্গুত্ব লিঙ্গেই। স্ত্রীলিঙ্গেই।

দুরকম গর্ভপাত আছে। বৈধ এবং অবৈধ। বৈধ এবং অবৈধের মধ্যে সূক্ষ্ম সুতোর ব্যবধান। গর্ভপাত করা বৈধ, কিন্তু লিঙ্গ নির্ণয়ের পর গর্ভপাত অবৈধ। একজন মেয়ে তার গর্ভপাত বৈধভাবে ঘটাতে পারে যদি ভ্রুণে কোনও অস্বাভাবিকতা পায়। কিন্তু স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিকের মধ্যে পার্থক্যটা কী? ডাক্তারি বিজ্ঞানে যে ভ্রুণকে অস্বাভাবিক ভ্রুণ বলে সেটি আর সুস্থ স্বাভাবিক মেয়েভ্রুণ — এ দুটো এক অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। সামাজিকভাবে দু ভ্রুণই অনাকাঙ্ক্ষিত।

অস্বাভাবিক বা পঙ্গু ভ্রুণ এবং মেয়ে ভ্রুণ এ দুটোকে জন্মাতে দিলে অনেক খরচ। মানসিক সুস্থতা আর থাকবে না, অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। তার চেয়ে এদের না জন্মাতে দেওয়াই ভালো। এই হল মেয়েভ্রুণহত্যায় বিশ্বাসীদের মত।

গর্ভপাতের ক্লিনিকগুলো একটা বিজ্ঞাপন দেয়। 'পাঁচশ টাকা খরচা কর, ৫০,০০০ টাকা বাঁচবে।' অর্থাৎ 'একে মার। এ বেঁচে থাকলে তোর পঞ্চাশ হাজার টাকা যাবে পণে।' এক ২০০৫ সালেই আলট্রাসাউন্ডএর কারখানাই গড়া হয় ৫০০ কোটি টাকার। পুত্রপিপাসুদের জন্য লিঙ্গনির্ণায়ক ক্লিনিকগুলো হল আধুনিক মন্দির।

গর্ভপাতের অধিকারের জন্য ইওরোপ আমেরিকায় দীর্ঘ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে মেয়েদের। গর্ভপাতের অধিকার পাওয়া নারীস্বাধীনতার পক্ষে বিরাট ঘটনা। কিন্তু ভারতবর্ষে একটি বিশেষ লিঙ্গের কারণে যখন গর্ভপাত ঘটানো হয়, এবং সে লিঙ্গটি স্ত্রীলিঙ্গ, তার সঙ্গে তখন আর নারীস্বাধীনতার সম্পর্ক তো থাকেই না, বরং অঙ্গাঙ্গী যুক্ত থাকে নারীর পরাধীনতার করুণ কাহিনী।

ভারতীয়রা যে দেশেই বাস করতে যায়, এক টুকরো ভারতকে সঙ্গে নিয়ে যায়। ইওরোপ আমেরিকায় যেখানেই বাস করুক, পুত্রলিপ্সা তাদের মরে না। ওখান থেকে খরচ কম বলে ভারতে চলে এসে গর্ভপাত ঘটায়। আরও নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার হদিস পাওয়া গেছে, ভ্রুণের অসুখ দেখার আধুনিক পদ্ধতিগুলোর আশ্রয় নিয়ে গোপনে লিঙ্গ দেখছে তারা। ভ্রুণ যদি ভুল লিঙ্গের হয়, চোখ বুজে হত্যা। নিউ জার্সির ভারতীয় পরিবারে মেয়েশিশুর সংখ্যা পাঞ্জাব হরিয়ানার চেয়ে কিছু বেশি নয়। ভারতীয় মেয়েরা অনেকটা এখন বিলুপ্ত হতে যাওয়া প্রাণী। এনডেনজারড, বাঘের চেয়েও।

আইন দেখাতে গিয়েছিল কেউ কেউ। যে মেয়েরা মেরে ফেলছে নিজের সন্তান, তারা চেঁচিয়ে বললো, 'আইন? আইন আবার কী? আইন কি আমাকে সাহায্য করতে আসবে যখন আমি আরেকটি কন্যা জন্ম দিলে আমার স্বামী আমাকে তাড়িয়ে দেবে! আইন কি আমাকে সাহায্য করবে যখন আমার স্বামী আরেকটি বিয়ে করবে পুত্রসন্তানের আশায়? আইন কি সমাজের সেই চোখকে বদলাতে পারবে যে চোখ আমাকে মূল্য দেবে না যেহেতু আমার পুত্রসন্তান নেই!'

পুরোনো মেয়েশিশুহত্যার জায়গায় এখন আধুনিক সেক্স সিলেকটিভ অ্যাবরশান এসেছে। ডিএনএ টেস্ট, প্রি-জেনেটিক ডায়াগনোসিস টেস্ট। আরও হাই টেক। মেয়েবর্জিত সমাজ চাই, চাইই চাই। সমাজ তো প্রস্তুত নয় মেয়েসন্তানকে মর্যাদা দিতে। কিন্তু আইন বলছে মেয়েসন্তানকে হত্যা করা যাবে না। এদিকে মেয়েরা কারণ দেখিয়ে যাচ্ছে কেন তারা হত্যা করছে তাদের নিজের সন্তানকে। কারণ সমাজ পুত্র চায়, পরিবার পুত্র চায়। পুত্র না জন্ম দিলে জীবনে অশান্তি হচ্ছে। সোজা কথা, সমাজ যেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে, যেটা মানুষের অন্তরে, মুখে অন্য যা কিছু বলুক না কেন, যে, 'তোমার যদি দুটো পুত্র থাকে, তোমার দুটো চোখ আছে। যদি একটা পুত্র থাকে, এক চোখ অন্ধ। আর যদি তোমার দুটো কন্যা থাকে, তুমি সম্পূর্ণই অন্ধ।' আইন ভাঙা হচ্ছে। সবাই ভাঙছে। ডাক্তার, নার্স, ধাই, ল্যাবরেটরি, হাসপাতাল সবাই। ৯৪ সালে লিঙ্গ-দেখা পরীক্ষা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ হলেও কারও যেন কিছু যায় আসে না। মানুষের মানসিকতা না পাল্টালে আইন প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার মানসিকতাও পাল্টাবে না যতক্ষণ না আইন প্রণয়ন হবে। কিন্তু এই মানসিকতা, এই নারীবিরোধী মানসিকতা নিয়ে কি মানুষ জন্মায়? তা তো নয়, এ তৈরি করা।

সমাজে অপরাধ যখন বাড়তে থাকে, মেয়ের মূল্যও হু হু করে কমতে থাকে। স্ক্যান মেশিনগুলো যে হয়ে উঠবে এক একটি মানুষ মারার অস্ত্র, তা কে জানতো! পাঞ্জাব হরিয়ানায় মেয়েশিশুহত্যা ইদানীং ফিরে আসছে। যেহেতু মেয়েভ্রুণহত্যা এখন

দিনকে দিন কঠিন হচ্ছে। বেআইনি, তার ওপর এনজিওগুলো ওত পেতে আছে অপরাধী ধরার জন্য। যে সব গ্রামে মেয়েশিশুর সংখ্যা কম, সেসব গ্রামে নার্স বা ধাই মানেই কিন্তু ভয়ংকর। বুঝে নিতে হবে, এই জীবনের দূতগুলোই আসলে মৃত্যুর দূত।

কেন তারা গর্ভপাত ঘটাচ্ছে, কেন মেয়েশিশুকে বাঁচতে দিচ্ছে না। মেয়েরা বলেছে, 'কেন আমরা বাঁচতে দেব? আমরা কোনও মেয়ে চাই না। কেন আমরা মেয়েদের জন্মাতে দেবো আমরা যে কষ্ট পাচ্ছি তা পাওয়ার জন্য?' তারা বলে, 'বেঁচে থেকে আমাদের কী লাভ হচ্ছে? দুঃসহ জীবন শুরু হওয়ার আগেই মরে যাওয়া ভালো। দুনিয়ায় লাত্থি গুতো খেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সোজা স্বর্গে যাওয়াই ভালো।'

তারা কি ভুল বলে?

পাঞ্জাব হরিয়ানায় এখন ব্যাকল্যাশ শুরু হয়েছে। পাঁচ ভাই-এর এক বউ। বউ কোথায় পাবে, গ্রামে কোনও মেয়ে নেই। বড় ভাইয়ের বউকে বাকি ভাইয়েরা ব্যবহার করছে। এ ছাড়া উপায় নেই। 'দ্রৌপদী সিনড্রোম' যাকে বলে। ত্রিপালা কুমারি নামে ঝাড়খণ্ডের এক উপজাতি মেয়েকে এক লোক চাকরি দেবে বলে হরিয়ানায় নিয়ে যায়। সেখানে আজমের সিং নামের এক লোক তাকে বিয়ে করে এবং বলে তার আর ভাইয়ের সঙ্গে শুতে। মেয়ে রাজি হয়নি বলে তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল।

গুজরাটের প্যাটেল বংশে আর মেয়ে নেই। বিহার আর ওড়িষ্যা থেকে গরিব মেয়েদের কিনে নিয়ে আসা হচ্ছে এখন। এই মেয়েরা ক্রীতদাসী আর যৌনদাসী হিসেবে আর পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার যন্ত্র হিসেবে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

মেয়েদের মেরে ফেলে এখন মেয়ের অভাব এত তীব্র যে 'সাতা পাধ্যাতি' বলে একটি বিনিময়-নিয়ম চালু হয়েছে, 'আমার মেয়ে বিয়ে দেব ছেলের কাছে একটি শর্তে, বিনিময়ে ছেলের বোনকে চাই, আমার ছেলে যেন বিয়ে করতে পারে।'

নতুন প্রজনন প্রযুক্তি এসে গেছে। মেয়েভ্রূণহত্যা এখন হাই টেক ক্রাইম সবখানে। 'ভগবানের নিজের দেশ' কেরালাতেও। মেয়েরা কোথাও নিরাপদ নয়। রাষ্ট্রে, সমাজে পরিবারে কোথাও না। ভাবা হত মায়ের গর্ভ সবচেয়ে নিরাপদ। এখন, মায়ের গর্ভই মেয়েদের জন্য সবচেয়ে অনিরাপদ জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওখানে মেয়েশিশুর ভ্রূণ আছে, খবর পেলেই মেয়েদের নিরাপত্তা নষ্ট হচ্ছে।

ভারতের দক্ষিণও উত্তরের পথে হাঁটছে।

মেয়েরা শিক্ষিত হলে মেয়েভ্রূণহত্যা রোধ করা যাবে না। শিক্ষিত মেয়েরা অশিক্ষিত মেয়েদের চেয়েও তাদের গর্ভের ভ্রূণকে হত্যা করার পরিকল্পনা খুব ভালো নিতে পারে। শিক্ষিত মেয়েরা যারা দিব্যি আছে, তারাও কেন এ কাজ করছে! এর পেছনে কারণটি হল, 'আত্মবিশ্বাসের অভাব'। বহু শতাব্দী ধরে হীনমন্যতার চর্চা চলেছে মেয়েদের মধ্যে, ফলে মেয়েদের রক্তে মাংসে মজ্জায় জিনে ঢুকে গেছে এটি।

প্রচলিত শিক্ষা দিয়ে এটি নির্মূল করা যায় না। মেয়েরা যদি রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান না হতে পারে, ওইসব তথাকথিত শিক্ষা মেয়েদের ক্ষতে আরও নুন ছিটোবে, আর কিছু নয়।

পুরুষেরা শিক্ষিত স্ত্রী চায় আজকাল। তাই মেয়েরা শিক্ষিত হচ্ছে, বিয়ের বাজারে ভালো বিকোবার জন্য। শিক্ষিত স্ত্রী হলে দোকানপাট করা, বিল মেটানো, বাচ্চাদের পড়াশোনা, ইস্কুলসমস্যা নিজে মেটাতে পারে। এক লোকতো এভাবেই বললো, 'আমার স্ত্রীর পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি আছে অংকে, ভালো যে সে বাচ্চাদের এখন হোমওয়ার্কে সাহায্য করতে পারে। টিউটর রাখার দরকার পড়ে না তাই। আর স্ত্রী কেন বাইরে চাকরি করবে? সংসারে আমাদের তো বাড়তি টাকার দরকার নেই। তার প্রচুর কাজ পড়ে আছে ঘরে।'

শিক্ষিত নারীদের হাল এই হয় অবশেষে। তাদের উপার্জিত টাকার নাম 'বাড়তি টাকা'। বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বড় ডিগ্রি নিজের বাচ্চাদের হোমওয়ার্কে সাহায্য করার কাজে আসে, আর কিছুতে নয়। মধ্যবিত্ত মেয়েরা বিয়ের পর চাকরি করবে না, এরকমই চল। মেয়েদের কাজ হল ঘর সংসার করা। শুধু সেই মেয়েরা বাইরে কাজ করার অনুমতি পায়, যাদের বেঁচে থাকার জন্য টাকার ভীষণ প্রয়োজন হয়।

হায় শিক্ষা! শিক্ষিত মেয়েদেরই পণ বেশি দিতে হয়। বেশি শিক্ষিত মেয়েরা বেশি শিক্ষিত স্বামী দাবি করে। শিক্ষিত স্বামী পেতে হলে পণের পরিমাণও যায় বেড়ে। পণ বেশি দিলে অনেকে ভাবে যে বুঝি মেয়েদের মান বাড়লো। পণ দিলে মেয়েদের মর্যাদা কখনও শ্বশুরবাড়িতে বাড়ে না, বরং কমে। যত বেশি পণ দেবে, তত বেশি কমবে। বরের পণ দেওয়ার নিয়ম নেই, যতই শিক্ষিত হোক, যত বড় চাকরিই মেয়ে করুক না কেন। এদেশি পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনই বুঝিয়ে দেয় মেয়েরা এই সংসারে কী মূল্য নিয়ে আছে। ফর্সা, দেখতে সুন্দর, শিক্ষিত, ভদ্র পরিবারের ঘরোয়া মেয়ে চাই। ঘরোয়া মেয়ে মানে যে চব্বিশ ঘন্টা ঘরসংসার করবে শুধু, বাইরে চাকরি বাকরি করতে যাবে না। ভদ্র পরিবারের মেয়ে মানে যে পরিবার ভালো পণ দেবে। বর সমৃদ্ধ পরিবারের হলে পণ কম দিলেও চলবে তা নয়, বরং আরও বেশি দিতে হয়। এই যদি হয় অবস্থা কেন তবে মানুষের বিশ্বাস হবে না যে মেয়ে জন্মালে খরচ বেশি? মেয়েরা নিচুজাত, এই বিশ্বাস ভারতের নারী পুরুষ সবার মস্তিষ্কে ঢুকে গেছে। নিচুজাত বলে দূর করতে বা পার করতে পণের প্রয়োজন হয়।

পুরুষও যখন কোনও মেয়েকে টাকা দিয়ে বিয়ে করে, তখন সংসারের জন্য একটি ক্রীতদাসী কেনে সে। আর, কোনও মেয়ে যদি টাকা দিয়ে পুরুষকে বিয়ে করে, মেয়ে নিজের মানমর্যাদাহীন একটি হীন অবস্থান কেনে। মেয়েদের মুক্তি নেই কিছুতে।

পণ প্রথা আইন করে নির্মূল হয়নি। ততদিন পর্যন্ত এটি নির্মূল হবে না, যতদিন পর্যন্ত পরিবারের সবাই বিশ্বাস করবে যে একটি মেয়ে কখনও একটি ছেলের মতো অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয় না।

সমাজের অনেক বদল দরকার। মেয়েরা যে পরিবারের খুব মূল্যবান সদস্য,

কেবল পণের বোঝা নয়, পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র নয়— তা সমাজকে বুঝতে হবে। মেয়েদের আত্মবিশ্বাস সবচেয়ে বেশি জরুরি। নারী পুরুষ উভয়ে মিলে সমাজ বদলের চেষ্টা না করলে মেয়ে ভ্রুণ হত্যা চলতেই থাকবে সমাজে।

'সমাজটা মেয়েদের জন্য মন্দ, তাই মেয়েদের জন্ম দেওয়াই ঠিক নয়।' এই যুক্তিটা অনেকটা, 'খুব চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে, নয়েজ পলুশান হচ্ছে, তাই মাথা ধরছে, সুতরাং মাথাটা কেটে ফেলা'র মতো। অনেকে বলে মেয়েরা নিজেরা লিঙ্গ পছন্দ করে শিশুর জন্ম দিলে অনেকগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভ থেকে বাঁচবে। মেয়েরা কিন্তু এতে শেষ পর্যন্ত বাঁচে না, বরং মরে। কতটুকু অসহায় হলে নিজের জরায়ুর ভেতর বাড়তে থাকা ভ্রুণটির ওপর নিজের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না! সামাজিক এবং পারিবারিক চাপের কাছে মেয়েদের বাধ্য হতে হয় গর্ভপাত ঘটাতে। অনেকগুলো অনাকাঙ্খিত গর্ভ কী আর ভয়ংকর, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর মেয়েদের নিতান্তই এই নিঃস্ব, নিরীহ, নিরুপায়, এই মানমর্যাদাহীন অবস্থা।

এভাবে চললে, যেভাবে চলছে এখন দেশ, খুব বেশি দশকের দরকার হবে না, যখন দেখতে হবে দেশে একটিও মেয়ে নেই, কেবল পুরুষ। ভালো, যে, নির্যাতনের জন্য, নিষ্পেষণের জন্য, ধর্ষণের জন্য, হত্যা করার জন্য পুরুষ আর মেয়ে পাবে না। তখনও সম্ভবত বোধোদয় হবে না পুরুষের।

এ লজ্জা ভারতের, আর কারও নয়। যতদিন না ভারতের নারীরা এ রাষ্ট্রে নির্বিঘ্নে জন্ম নেওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার না পাবে, ততদিন ভুল হবে এ রাষ্ট্রকে গণতন্ত্র বলে মানা।

সূত্র: *ডিসঅ্যাপিয়ারিং ডটারস*, গীতা আরাভামুদান

কট্টরপন্থীদের কোনও দোষ নেই

সেদিন পাকিস্তানের এক নারীমন্ত্রীকে আলিঙ্গনারত অবস্থায় দেখে মুসলমান মৌলবাদীরা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে, পরপুরুষকে আলিঙ্গন করা ইসলাম বিরুদ্ধ, সুতরাং নারীমন্ত্রী নিলুফার বখতিয়ারকে যেন মন্ত্রীত্ব থেকে বাদ দেওয়া হয়। খবরটি সারাবিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল। নিলুফার বখতিয়ার বলেছেন, এসব ফতোয়া তিনি মানেন না।

কিছুদিন পরই একইরকম ঘটনা ঘটলো ভারতে। বলিউডের নায়িকা শিল্পা শেঠিকে আলিঙ্গন করে হলিউডের নায়ক রিচার্ড গিয়ার গালে চুমু খেয়েছেন। হিন্দু কট্টরপন্থীরা এখন চেঁচাচ্ছে, এটি ভারতীয় সংস্কৃতি বিরুদ্ধ, সুতরাং জ্বালাও পোড়াও। মুসলমান এবং হিন্দু, কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। উভয়ের মধ্যেই ধর্মধ্বজী, সংস্কৃতি রক্ষক, নারীবিরোধী লোকের অভাব কিছু কম নেই।

একবার আমি ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম, নিলুফার বখতিয়ার এবং শিল্পা শেঠি দুজন যদি মেয়ে না হয়ে পুরুষ হতেন, কোনও কি অসুবিধে হত, তাঁরা যা করেছেন, তা করলে? লোকে কি ধর্ম গেল, সংস্কৃতি গেল রব তুলতো? মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করার হুমকি দিত? আদালতে যেত? না। পুরুষ হলে অপরাধ হত না। দেশি বিদেশি যে কোনও মেয়েকে আলিঙ্গন করা চুমু খাওয়া পুরুষের জন্য বীরত্ব ব্যতীত কিছু নয়। আমাদের বুঝতে হবে, নিষেধাজ্ঞা কেবল নারীর বেলায় ঘটে, নারী যে ধর্মেরই হোক না কেন, যে বর্ণ বা শ্রেণী বা গোষ্ঠীরই হোক না কেন!

এই ধার্মিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মনে করে যে নারী এই সমাজের সম্পত্তি। নারী কার সঙ্গে মিশবে, কাকে চুমু খাবে, কাকে আলিঙ্গন করবে, কী খাবে, কী পরবে, কীভাবে পরবে, কার সঙ্গে শোবে, কটি সন্তান জন্ম দেবে, পুত্র কটি কন্যা কটি, কার অধীনে থাকবে, কার আদেশ মানবে, কখন বাইরে বেরোবে, কখন না, কী কাজ করবে, কী করবে না — সব কিছুরই সিদ্ধান্ত সমাজ নেয়। একটু এদিক ওদিক হলেই তাই সর্বনাশ হয়। সর্বনাশ প্রতিনিয়ত হচ্ছে মেয়েদের।

যে মেয়েরা নাম করেছে, মন্ত্রী হয়েছে বা অভিনেত্রী হয়েছে, কট্টরপন্থীদের নাগালের বাইরে যারা, তাদের তো আর পিষে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়, তাই তাদের বিরুদ্ধে নিন্দার ঢেউ ওঠে, রাস্তায় কুশপুতুল পোড়ে, মিছিল বেরোয়। আর, আমরা এসব খবর যত শুনি, তত শিউরে উঠি। ভুলে যাই যে নাম না করা মেয়েরা নির্বিচারে

নিষ্পেষিত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে, নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। তাদের ওপর ধর্মের, সংস্কৃতির, পুরুষতন্ত্রের রীতিনীতির বুলডোজার চলছে, সে কি আজ থেকে! নীরবে নিভৃতে মেয়েরা অনেক কেঁদেছে। এখন অনেকে কাঁদতেও ভুলে গেছে। মুখ বুজে সইছে, এই সওয়াটাকেও মেনে নিয়েছে নিয়ম বলে। মরছে, মরাটাকেও মেনে নেয় নিয়ম বলে।

নিলুফার আর শিল্পা তাদের অবস্থান থেকে প্রতিবাদ করতেই পারেন, আপাতত তাঁদের ওপর মিডিয়ার নিরাপত্তা আছে। কিন্তু মন্ত্রীত্ব এবং অভিনেত্রীত্ব চলে গেলেই তাঁরা যে কোনও মেয়ে, তাঁরা ক খ গ ঘ ঙ। তাঁরা নিরাপত্তাহীন। তাঁরা এখন কট্টরপন্থীদের অবজ্ঞা করার নিরাপত্তা পাচ্ছেন, যেহেতু মন্ত্রী বা জনপ্রিয় অভিনেত্রী হবার উচ্চতায় তাঁরা উঠেছেন। উচ্চতা সবসময়ই, এ সমাজের চোখে, পৌরুষের সমার্থক। যা কিছু ভালো গুণ জগতে আছে, সবকিছুকেই বলা হয় পুরুষালি। আর যা কিছু মন্দ, মেয়েলি। নিলুফার বা শিল্পা যে মানুষের সমর্থন পাচ্ছেন, তা তাদের পৌরুষিক উচ্চতার কারণে। মেয়ে হওয়ার কারণে নয়। যতটুকু নিগৃহীত তাঁরা হয়েছেন, হয়েছেন মেয়ে হওয়ার কারণে। ওই উচ্চতাটুকু না থাকলে তাঁরা আরও নিগৃহীত হতেন। যে মানুষেরা নিলুফার বা শিল্পাকে সমর্থন করেছেন, তাঁরা ক'জন সমর্থন করতে যান সেই সাধারণ মেয়েদের, যাদের কিছুরই নিরাপত্তা নেই?

সাধারণ মেয়েরা তাদের পিতা পুত্র, এবং তাদের স্বামীকেও নিরাপত্তা বলে ভাবতে শিখেছে। এরাই নিরাপত্তার নামে নারীর অধিকার হরণ সবচেয়ে বেশি করে। নিরাপত্তার নামে এরাই নিগ্রহ করে নারীকে সবচেয়ে বেশি। এরাই পুরুষতন্ত্রের পাহারাদার। পিতা তার অনাকাঙ্ক্ষিত কন্যাটিকে সেই যত্ন দেয় না, যে যত্ন সে তার পুত্রকে দেয়। পিতা তার কন্যাকে এমন শিক্ষা দেয় না, যে শিক্ষা পেলে কন্যা সমানাধিকার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে, যে শিক্ষা পেলে সচেতন হতে পারে মানুষ হিসেবে নিজের অধিকারের ব্যাপারে, যে শিক্ষা পেলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, পরমুখাপেক্ষী হয়ে পরাশ্রয়ে সারাজীবন বেঁচে থাকতে হয় না। পুত্রও ঠিক তাই তাই করে, যা সে তার পিতার কাছে শেখে, তার দাদু ঠাকুরদার কাছ থেকে শেখে, সমাজের আর দশটা পুরুষের কাছ থেকে শেখে। শেখে নারীমাত্রই দুর্বল, তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। নারী শিক্ষিত হলেও, প্রাপ্তবয়স্ক হলেও, স্বনির্ভর হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। শেখে তাদের করুণা করতে হয়। ভাত কাপড় ওষুধ পত্র দান করে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়। শেখে নারী তার জীবন উৎসর্গ করে সংসার সেবায়, এই নারীকে করুণা করা পুরুষের কর্তব্য। দুর্বলের জন্য, পঙ্গুর জন্য, অথর্বের জন্য, শিশুর জন্য, মানসিক প্রতিবন্ধীর জন্য মানুষের যে করুণা, একই করুণা নারীর জন্য পুরুষের। এই করুণার নাম নাকি নিরাপত্তা। স্বামীকে নারীর সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা বলে ভাবা হয়। অথচ এ জগতে স্বামী দ্বারাই সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হয় নারী। স্বামীই তাদের অধিকার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে, স্বাধীনতার গায়ে কুড়ুল মারে, চার দেয়ালের তথাকথিত সাংসারিক নিরাপত্তায় তাদের বন্দি রাখে, শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচারে জীবন তাদের দুর্বিসহ করে। স্বামীর যা কিছু তাই করার বস্তু হয়ে

ওঠে নারী। এই স্বামী নামক নিরাপত্তার কাছে নির্যাতিত হতে আসার জন্য আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে পণ দিতে হয় নারীকে। নারীর শরীরের কোনও অংশই নারীর নয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত যা আছে, সব পুরুষের। স্বামীর এবং সমাজের। শিল্পা নামের নারীকে কেউ স্পর্শ করলে বা তার গালে চুমু খেলে তাই সমাজের রাগ ওঠে। কারণ শিল্পার বুক পেট তলপেট, শিল্পার গাল ঠোঁট শিল্পার নিজের নয়, এগুলো সমাজের সম্পত্তি। সমাজের সম্পত্তি, শিল্পার কোনও অধিকার নেই যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করার। সমাজের অনুমতির বাইরে শিল্পার শরীর নিয়ে কিছু করার অধিকার শিল্পার নিজের নেই। নিলুফারেরও নেই। নিলুফারের বুক পেট তলপেট, পা পায়ের পাতা, মাথা সবই সমাজের সম্পত্তি। জন্ম নেবার পর থেকেই একটি মেয়ে হয়ে ওঠে সমাজের সম্পত্তি। মেয়ের জীবনের কিছুই আর ব্যক্তিগত থাকে না, নিজের বলে কিছু থাকে না।

নিলুফার আর শিল্পাকে নিয়ে যখন কট্টরপন্থীরা শোরগোল করে, কট্টরপন্থীদের দোষ দিয়ে দিব্যি বসে থাকি আমরা। যেন কট্টরপন্থীরা খুব মন্দ, বাকি সব বেজায় ভালো। দোষ কিন্তু কট্টরপন্থীদের নয়। দোষ মূলে। সমাজে। কাঠামোয়। কট্টরপন্থীরা মাঝে মাঝে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কাঠামোটির কথা, এই যা। এই কাঠামো নিয়ে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের কোনও আপত্তি নেই। এই কাঠামোর ওপরই তারা গড়ে তুলেছে তাদের সুরম্য সংসার, সমাজ।

লোকে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন ইহুদি পারসি ইত্যাদি ধর্মীয় গোষ্ঠীর পার্থক্য নিয়ে বড় বড় কেতাব লিখে ফেলছে। কিন্তু, আমার মতে এদের মধ্যে সত্যিকারের কোনও পার্থক্য নেই। সব ধর্ম এবং সমাজই পুরুষতান্ত্রিক এবং খুব সংগতকারণে তাই নারীবিরোধী। ধর্মগুলোর মধ্যে ওপরে ওপরে কিছু পার্থক্য আছে, ধর্মীয় উৎসবগুলোর আচার আচরণেও কিছু পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু এসবের প্রকৃতি এক, ভেতরে ভেতরে সবই এক। কোনও একটা অদৃশ্য শক্তিকে ভয় পেতে হবে, তাকে প্রার্থনায় পুজোয় তুষ্ট রাখতে হবে, এবং মনুষ্যসমাজে মেনে চলতে হবে এই নিয়ম, যে, পুরুষ প্রভু, নারী দাসী। দাসী শব্দটি শুনলে আজকাল উচ্চশ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত নারীরা খুব বিরক্ত হয়। কিন্তু এই শব্দটি ছাড়া আর কোনও জুতসই শব্দ আমি খুঁজে পাই না নারীর জন্য। আপাতদৃষ্টিতে দাসী বলে মনে না হলেও পুরুষতন্ত্রের কাঠামোটি যে নারীকে দাসী করে রেখেছে, তা তলিয়ে যে দেখতে না পারে, সে অন্ধ ছাড়া আর কী! নারীকে অবশ্য অন্ধ না হলে চলে না। চোখ খোলা মেয়ের এই সমাজে কোনও ঠাঁই নেই।

মেয়েদের যখন চোখ খুলতে থাকে, তখনই সমাজের রক্ষকরা সেই চোখ অন্ধ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। সমাজের এই রক্ষকদের কট্টরপন্থী বলে কেউ অসম্মান করে না। তারা খুব সম্মানীয় লোক। ভদ্রলোক। বুদ্ধিমান। কালচার্ড। কট্টরপন্থীরা রাস্তায় বাঁদরের মতো লাফায়। অশ্লীলতা করে। জ্বালায় পোড়ায়। ওরা বোকা। আনকালচার্ড। ওরা আসলে ভদ্রলোকদের চেয়ে কম কট্টরপন্থী। ওরা অতটা ক্ষতি করতে পারে না মেয়েদের, যত করতে পারে ভদ্রলোকেরা। নরমপন্থীরা।

কট্টরপন্থীদের দেখলে চেনা যায়, তাদের কাছ থেকে সাবধান হওয়া যায়। বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের পরাস্ত করা যায়। কিন্তু পরাস্ত করা যায় না শিক্ষিতদের। ভদ্রলোকদের। বুদ্ধিমানদের। বাইরে থেকে দেখলে তাদের চেনার কোনও উপায় নেই। তারা প্রগতিশীল, তারা সমতায় বিশ্বাসী — এরকমই সবার ধারণা। তাদের নিজেদেরও তাই ধারণা। কিন্তু তারাই প্রচণ্ড বুদ্ধির জোরে কুট-কৌশলে টিকিয়ে রাখছে এই পুরুষ শাসিত সমাজ। নারী বিরোধী ঐতিহ্য, সনাতন সংস্কৃতি আগের চেয়ে আরও জাঁক করে পালন করার আয়োজন করছে তারা।

রাস্তায় কুশপুতুল পোড়ানো, ফতোয়া দেওয়া কট্টরপন্থী বা উগ্রপন্থীদের সংখ্যা ভদ্রলোকদের তুলনায় অনেক কম। এই সংখ্যালঘুদের কোনও ক্ষমতা নেই পুরুষতন্ত্র টিকিয়ে রাখার। টিকিয়ে রাখছে ভদ্রলোকেরা, যারা নরমপন্থী, চালাক চতুর। কট্টরপন্থী বলে তাদের কেউই মনে করবে না, আসলে সত্যিকার কট্টরপন্থী তারাই। পুরুষতন্ত্রের কাঠামোটিকে অক্ষত রাখার জন্য যা করার সবই তারা করছে। তারা যদি বুদ্ধিবলে শক্তিবলে পুরুষবলে টিকিয়ে না রাখতো পুরুষতন্ত্রকে, তবে এটি টিকে থাকতো না এত দীর্ঘকাল।

জনগণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হলেই নারী নিরাপত্তা পাবে

কেরালা আর কর্ণাটক রাজ্যদুটোতে মেয়েদের অবস্থা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে ভালো। এই ভালো-রাজ্য কর্ণাটকে হঠাৎ কিছুদিন আগে ৪৬ বছরের পুরোনো একটি আইন (দোকান এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৬১) প্রয়োগ করা হল। আইনটি হল, 'মেয়েরা রাত আটটার পর কোথাও কাজ করতে পারবে না, অর্থাৎ রাত্রিভাগে তাদের কাজ নিষিদ্ধ। আইন অমান্য করলে শাস্তি, ছ মাসের কারাদণ্ড এবং নগদ দশ হাজার টাকা।' হঠাৎ যেন ভারতবর্ষে ঝড়ের মতো নেমে এলো এক টুকরো মধ্যযুগ।

আসলেই কি নেমে এলো? মধ্যযুগ কি বিরাজ করছে না প্রকাশ্যে অনেক অঞ্চলেই, এবং গোপনে গোপনে প্রায় সর্বত্র? মানসিকতার কি উত্তরণ ঘটেছে যথেষ্ট? রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, চমৎকার চমৎকার আইনের প্রণয়নও হচ্ছে, সংখ্যালঘুর জন্য না হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠর জন্য সমানাধিকারের ব্যবস্থা হচ্ছে, গৃহ নিগ্রহের বিরুদ্ধেও আধুনিক একটি আইন আনা হল, জাতপাতের বিরুদ্ধে তো কঠোর কঠিন আইন আছেই, পণপ্রথার বিরুদ্ধেও। তাতে কী? সমাজে জাতপ্রথা নেই? পণ দেওয়া নেওয়া হরদম চলছে না? শিকার হচ্ছে না মেয়েরা প্রতিদিন,এই প্রথার, এই ভারতবর্ষে? বধূহত্যা, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, নারীপাচার, বেশ্যাপ্রথা সবই সতীদাহের আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলছে, জানান দিচ্ছে তারা আছে। তারা আইন মানে না।

এই মধ্যযুগের মধ্যেই মেয়েরা অনেকে শিক্ষা আর স্বনির্ভরতার আধুনিকতার দিকে যখন এগোচ্ছে তখন পুরোনো নথিপত্রের গা থেকে ধুলো ঝেড়ে কর্ণাটকের সরকার আইন বের করেন খুঁজে, মেয়েদের পায়ে শেকল পরাতে চান। মেয়েদের ওপর রাতে রাতে আক্রমণ বাড়ছে, সুতরাং মেয়েদের ঘরবন্দি করো। 'মাথা ব্যথা হচ্ছে, সুতরাং মাথা কেটে ফেলো'র মতো সমাধান। দিনের বেলায় যদি আক্রমণ হয় তাহলে তো দিনের বেলাতেও ঘরের বাইরে বেরোনো মেয়েদের বন্ধ হবে। মেয়েদের ওপর আক্রমণ কখন না হয়? রাতে হয়, দিনে হয় না? দিন রাতের কোনও ভাগেই নিরাপদ নয় মেয়েদের জীবন। কেন নয়, সে কারণটি খুঁজে বের করা উচিত কর্ণাটক সরকারের। সমস্যার মূল কারণটিকে নির্মূল করা হলে সমস্যা নিয়ে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

যদিও নারীবাদীদের চাপে রাতের চাকরিতে মেয়েদের নিষিদ্ধ করার বিষয়টি

এখন স্থগিত রেখেছেন কর্নাটক সরকার, কিন্তু চাকরিরত মেয়েদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের একটি চেষ্টা অন্তত হয়েছিল, তা ভুলে গেলে চলবে না। আজ কর্নাটকের মতো রাজ্যে নিজেদের নিরাপত্তা ঘরে বন্দি হয়ে থেকে যদি মেয়েদের দিতে হয়, তবে অন্য অনগ্রসর রাজ্যগুলোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যেতে বাধ্য এই নিয়ম। মেয়েদের জন্য সবচেয়ে ভালো, ঘর থেকে না বের হওয়াই। তাহলে ভীষণ নিরাপত্তার মধ্যে মেয়েরা রইল। আর, বাইরে যদি বেরোতেই হয়, নিরাপত্তার চরমতম ব্যবস্থাটিই গ্রহণ করা উচিত। চলমান কারাগার, যার আরেক নাম বোরখা, ব্যবহার করতে হবে যেন মন্দ লোকের নজর না পড়ে। অন্ধকারের দিকে চিরকাল মানুষ এভাবেই হেঁটেছে। অন্ধকার চিরকাল মানুষকে এভাবেই গ্রাস করে নিয়েছে।

মানুষ তো আলোর দিকেও যায়। মনকে আলোকিত করার কিছুই কি নেই এই ভারতবর্ষে? মায়াবতীর বিজয় হচ্ছে একদিকে, ঘর থেকে বেরিয়ে আসা মেয়ে, দিন রাত্তির পরিশ্রম করে সাফল্য পাওয়া মেয়ে, আর অন্যদিকে চলছে মেয়েদের পঙ্গু বানাবার, পরাজিত আর পরনির্ভর বানাবার পাঁয়তারা।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞান এবং ধর্মের যেমন সহাবস্থান চলে, নারীর জয় এবং পরাজয়েরও তেমন। আলো আর অন্ধকার পরস্পরকে উষ্ণ আলিঙ্গন করে আছে দেখলে বড় আশংকা হয়। যদি অন্ধকারের হাঁ মুখে ঢুকে যায় সব আলো, সব জয়, সব বিজ্ঞান, সব যুক্তি, সব মুক্তি, সব সমতা, সব মানবতা, তবে? অন্ধকারের শক্তি কম নয়।

নারীকে রক্ষা করার জন্য, নারীর সম্ভ্রম বা ইজ্জত বাঁচানোর জন্য আলাদা কোনও আইনের কোনও প্রয়োজন নেই। নারী নাগরিক রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের দায়িত্ব তার সকল নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করা। রাষ্ট্র যদি তার সব নাগরিককে বা জনগণকে নিরাপত্তা দেয়, তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনীয় সব নিরাপত্তা নারী পেয়ে যাবে। রাষ্ট্র কি তা করে? যদি করতোই তবে সরকার অনুমোদিত বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি আইনি বৈষম্যের শিকার নারীকে হতে হত না, যদি করতোই তবে দিনে কেন, রাতেও নারী নিশ্চিন্তে রাস্তাঘাটে কর্মক্ষেত্রে চলাফেরা করতে পারতো, কোনও নিগ্রহের শিকার তাকে হতে হত না। যদি করতোই, তবে ঘরে ঘরে নারী শান্তিতে স্বস্তিতে বাস করতে পারতো।

নারীর নিরাপত্তা কোথাও নেই! নিরাপত্তার জন্য নানা আইনের প্রণয়ন হয়েছে, কোথাও কোথাও সেসব প্রয়োগও হচ্ছে। কিন্তু সত্যিকার নিরাপত্তা নারীর জুটছে না। একা আইন দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। পুরুষ যদি এখন নারীকে আক্রমণ না করে, তবে সে আইনের ভয়ে। কিন্তু পুরুষ যেদিন থেকে নারীকে আক্রমণ করবে না, কারণ নারীকে সে মানুষ হিসেবে সম্মান করবে, সেদিন সমস্যার সত্যিকার সমাধান হবে। তার আগে নয়। শ্রদ্ধা ও সম্মান ভেতর থেকে আসে। ভেতর থেকে না এলে বাইরে থেকে আরোপ করে কৃত্রিম উপায়ে যে শিল্প বা সংস্কৃতিই নির্মাণ করা হোক না কেন, তুড়িতে ভেঙে পড়ে সব।

আইনের ভয় আজ থাকে, কাল থাকে না। ভয় দিনে দিনে দূর হয় লোকের। দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে ভয় বলে শেষ অবধি কারও কিছুই থাকে না। বুক ফুলিয়ে সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে পারে যে কেউ। আইনের ভয় দেখিয়ে নারী নির্যাতন বন্ধ করা যায় না, যাবে না। একমাত্র উপায় নির্যাতন বন্ধ করার, পুরুষের মানসিকতা বদলানোর। নারীকে দুর্বল ভাবার, যৌনবস্তু ভাবার, খেলনা ভাবার, দাসী ভাবার, মনোরঞ্জনের জিনিস ভাবার, উৎপাদনের যন্ত্র ভাবার মানসিকতা না বদলালে কোনওদিনই নারী তার নিরাপত্তা এ সমাজে পেতে পারে না।

প্রশ্ন হল পুরুষের এই মানসিকতা তৈরি করছে কারা? তৈরি করছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, আইনি ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রতিটি ব্যবস্থাই পুরুষতান্ত্রিক, পুরুষকেন্দ্রিক। এক মায়াবতী দিয়ে রাজনৈতিক জগতে চমক ফেলা যায়, কিন্তু সমাজ পরিবর্তন করা যায় না। সমাজে আরও অনেক মেধার প্রয়োজন, আরও মায়াবতীর প্রয়োজন। আরও আরও রুখে ওঠা মানুষের প্রয়োজন। সমতার জন্য আরও আরও লড়াইএর প্রয়োজন।

নারীর প্রতি শ্রদ্ধা কি নারীরই আছে! হিসেব করলে দেখা যায়, নেই। কারণটি হল নারী নিচুশ্রেণীর জীব — এ কথা বাচ্চা বয়স থেকে সবাইকে শেখানো হয়, নারী পুরুষ উভয়কেই। উভয়ের মস্তিষ্কেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এই বিদ্যে। নিচুশ্রেণীর জীবকে শ্রদ্ধা বা সম্মান করা খুব দুরূহ ব্যাপার। তাই নারীবিরোধী অপরাধ বন্ধ হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই কোথাও।

নারীকে মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা ও সম্মান যেদিন নারী ও পুরুষ উভয়ে করতে শিখবে, সেদিন নারীবিরোধী কোনও কার্যকলাপ, নারীবিরোধী কোনও আইন, কোনও কুসংস্কার এই সমাজে টিকে থাকতে পারবে না। তখন নারীর নিরাপত্তার জন্য ঘন ঘন আইন প্রণয়ণেরও প্রয়োজন হবে না। শ্রদ্ধা করলে কেউ নারীকে ধর্ষণ করে না, কেউ নারীপাচার করে না, সম্মান করলে কেউ নারীকে বেশ্যাবৃত্তিতে ঠেলে দেয় না, তাকে আগুনে পোড়ায় না।

আইন কি কম আছে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে? ক'জন নির্যাতনকারী শাস্তি পায়? ক'জন নারী এ সমাজে সত্যিকার অর্থে নিরাপত্তা পায়? রোগের চিকিৎসা না করে রোগের উপসর্গের চিকিৎসা করা হচ্ছে। রোগ কী করে সারবে তবে!

রাত আটটার পর পুরুষরা যদি অসভ্য, অভব্য, অগণতান্ত্রিক, অমানুষ হয়ে ওঠে, তবে সেই পুরুষদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হোক, মেয়েদের কেন শাস্তি দেওয়া হবে! মেয়েরা যদি রাত্রিভাগে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়, তবে তারা চাকরির সুবিধে থেকে বঞ্চিত হবে। এক ক্ষতি ঠেকাতে গিয়ে আরও একটি বিরাট ক্ষতির আয়োজন ছাড়া এ কী আর কিছু! আর, এ কথাও সকলের জেনে রাখা প্রয়োজন, যে পুরুষ রাত আটটার পর বদমাইশি করতে পারে, সে দিন দুপুরেও অবলীলায় তা পারে। যে বদমাইশি করে না, সে রাত গভীর হলেও করে না।

বদমাইশি আলো আর অন্ধকারের ওপর নির্ভর করে না। করে মানসিকতার ওপর। মানসিকতা নির্ভর করে সুশিক্ষার ওপর। সুশিক্ষা নির্ভর করে শিক্ষা-ব্যবস্থার

ওপর। শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্ভর করে রাজনীতির ওপর। পুরুষতন্ত্রের আর বৈষম্যের রাজনীতির জয়জয়কার এখন। সমতায় বিশ্বাসী নারী-পুরুষ যতদিন না বৈষম্যের মূলোৎপাটন করছে, যতদিন ব্যবস্থাগুলোর আমূল পরিবর্তন না হচ্ছে, ততদিন নারীকে ইঁদুরের মতো বেঁচে থাকতে হবে। বিপদ দেখলে গর্তে লুকিয়ে পড়তে হবে। ইঁদুরের গর্তেই কি ইঁদুরের নিরাপত্তা আদৌ আছে! নিরীহ ইঁদুরের যেমন নেই, নারীরও নেই।

মেয়েরা যেন না মেনে নেয় অপমান

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ইন্দ্রাণী দত্ত চৌধুরীর দিকে নজর পড়েছে তাঁর বিভাগীয় প্রধানের। আমরা জানি পুরুষের নজর যখন পড়ে কোনও মেয়ের ওপর, কী হয়। ইন্দ্রাণীর দিকে সকাল সন্ধ্যে যৌনগন্ধময় বাক্য ছুড়ে দিতে লাগলেন তীর্থংকর দাস পুরকায়স্থ। নির্ভয়ে এবং নির্ভাবনায় এই কাজ তিনি করেন, তাঁকে নিরস্ত করে, সাধ্য কার! ইন্দ্রাণীকে যে ইশারাই বা যে ইঙ্গিতই করেন তীর্থংকর, ব্যর্থ হন। যত ব্যর্থ হন, তত তিনি ব্যাগ্র হন। ভেতরে বাইরে গর্জন করেন। সব জেনে বুঝেও লোকে শেষ অবধি ইন্দ্রাণীকে দোষ দেয়। যেহেতু মেয়েদের দোষ দেওয়া খুব সহজ এবং এই সংস্কৃতিটি খুব জনপ্রিয়, লোকে ধর্ষককে দোষ না দিয়ে যেমন ধর্ষিতাকে দেয়, ধর্ষিতার পোশাক বা চাহনি বা চালচলন নাকি ইন্ধন জুগিয়েছিল ধর্ষণ করতে। এও ঠিক তেমন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষকে তীর্থংকরের আচরণ নিয়ে অভিযোগ করেছেন ইন্দ্রাণী। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। উপাধ্যক্ষ নিজে পুরুষ। পুরুষেরা সাধারণত পুরুষের পক্ষই নেয় বিপদ দেখলে। কারণ পুরুষের চরিত্র তো পুরুষ চেনে। রতনে রতন যেমন চেনে। এক রতন ফাঁদে পড়লে আরেক রতন যদি না বাঁচায় তবে সেই রতনকে বিপদে বাঁচাবার জন্য এই রতন তো এগোবে না। অলিখিত একটি চুক্তি এদের মধ্যে থাকেই যে পরস্পরের প্রয়োজনে এরা এগিয়ে আসবে এবং এগিয়ে আসে বলেই আজ রতনে জগত ভরে গেছে। রতনদের ভিড়ে মেয়েরা পথ চলতে পারছে না। চলতে গেলেই ধাক্কা খাচ্ছে, পিছলে পড়ছে।

ইন্দ্রাণী যেহেতু সাড়া দেননি তীর্থংকরের প্রস্তাবে, শুধু তাই নয়, গোপনে কী কী বলেছেন এবং করেছেন, তা রাষ্ট্র করে দিয়েছেন, সেহেতু রেগে আগুন হয়ে আছেন তীর্থংকর। প্রচার করার চেষ্টা করছেন যে তাঁর জন্য দুর্দম্য আকর্ষণ ইন্দ্রাণীরই ছিল, ইন্দ্রাণীই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। এইসব মিথ্যে প্রচারের কাছে হেরে যাওয়ার মেয়ে ইন্দ্রাণী নন। তিনি অপমান মেনে নেবেন না বলে পণ করেছেন। তীর্থংকর গোষ্ঠী আশা করেছিলেন যে চরিত্রে ইচ্ছেমতো কালি কলঙ্ক লেপন করলে ইন্দ্রাণী এই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যেতে বাধ্য হবেন। আপদ বিদেয় হবে। এ শুধু আশায় বসতি। ইন্দ্রাণী বিশ্ববিদ্যালয় পাল্টাবেন না, আরও এই জন্য পাল্টাবেন না যে তিনি অপরাধ করেননি, অপরাধ করেছেন তীর্থংকর। মাথা নত করে যদি কাউকে বিদেয় নিতে হয়, নেবেন তীর্থংকর, ইন্দ্রাণী কেন! আর পিছু হঠলে দুষ্টু

লোকের দেওয়া অপবাদকে সত্যি বলে মনে হবে, নিজের স্বস্তি বলে যে জিনিসটির প্রয়োজন খুব, সেটিও তো থাকবে না! পিছু হঠার কোনও কারণ ইন্দ্রাণীর নেই, কারণ তিনি খুব ভালো করেই জানেন যে তিনি কোনও অপরাধ করেননি। সুতরাং মাথা উঁচু করে ইন্দ্রাণী দাঁড়িয়ে আছেন, এবং অপরাধীর শাস্তি দাবি করছেন।

নারীর বিরুদ্ধে নিগ্রহ নির্যাতনকে, নিরন্তর যৌন হেনস্থাকে এখনও অন্যায় ভাবতে বেশির ভাগ মানুষই পারে না। কারণ সমাজে এসব যেমন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, তেমনই গা সওয়া, সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেকে ভাবছেন, তীর্থংকর তো আর ইন্দ্রাণীকে ধর্ষণ করেননি বা ধর্ষণের কোনও চেষ্টাও করেননি, তবে ইন্দ্রাণী কেন শাস্তি দিতে চাইছেন তাঁকে। শাস্তি দিতে চাইছেন এটা বোঝাতে যে 'মেয়েরা ইয়ার্কি ফাজলামির জিনিস নয়।' মেয়ে দেখলেই যৌনগন্ধযুক্ত কথা বলার অধিকার পুরুষেরা মনে করে তাদের আছে, কিন্তু তাদের নেই। তারা ইচ্ছে করলেই মেয়েদের নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে না।

সমাজ প্রচণ্ডভাবে পুরুষতান্ত্রিক হওয়া সত্ত্বেও সামান্য সভ্যতার আইন কানুন ইদানীং যা আমদানি হচ্ছে, তাতে অপকর্মের জন্য পুরুষের শাস্তি পাওয়ার একটি ব্যবস্থা, খুব আশার কথা যে, হচ্ছে। যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে আইন ভারতবর্ষে আছে, পুরুষেরা জানলেও বেশির ভাগ মেয়েই এ কথা জানে না। জানলেও নীরবে লজ্জাবনত মুখে সয়ে যায় সব রকম লাঞ্ছনা। ঘুরে দাঁড়াতে পারে ক'জন?

ইন্দ্রাণী দাঁড়িয়েছেন। তীর্থংকরের বিরুদ্ধে তিনি যে মামলা করেছেন, তা আমি একশ ভাগ সমর্থন করি। প্রতিটি মেয়েরই ইন্দ্রাণীর মতো নিজের ব্যক্তিত্ব এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকা উচিত। মেয়ে দেখলেই যে পুরুষেরা টিকাটিপ্পনি করে, অশ্লীলতা করে, তাদের ধর্ষণ করার দরকার হয় না, ধর্ষণের স্বাদ তারা এসব থেকেই নেয়। তাদের অপরাধকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মেয়েরা বহুকাল দেখে আসছে। এবং এভাবেই তারা পুরুষকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছে। পুরুষ এখন মনে করে মেয়েদের সঙ্গে বদমাইশি করা তাদের জন্মগত অধিকার। নির্বোধ মেয়েরাও আদুরে গলায় বলে, 'পুরুষ তো, একটু ওরকম তো হবেই। ওদের তো ইয়েটা বেশি।'

ইয়েটা কী টা? যদি জিজ্ঞেস করি, বলবে, 'ওই সেক্সটা।'

এ কথা এক ফোঁটা সত্য নয়। নারী পুরুষের মধ্যে যৌন তাড়নার কোনও কম-বেশি নেই। যদি থাকে, সে মেয়েদের। শরীর-বিজ্ঞান মতে মাল্টিঅরগাজম পাওয়ার মেয়েদেরই আছে। কিন্তু পুরুষদের বদমাইশি করার ইয়েটা আবার এ সমাজে বেশি। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে 'এই ইয়েটা আবার কী?' খুব সোজা উত্তর, 'সুযোগটা'।

সমাজটা পুরুষ শাসিত। এই সমাজে পুরুষরা বদমাইশি করার সুযোগ পাবে না তো কি মেয়েরা পাবে? এই বদমাইশি পুরুষরা তাদের সঙ্গে করছে, যাদের সঙ্গে তাদের বাস করতে হয়, যাদের ছাড়া তাদের চলে না। এক বাড়িতে, এক অফিসে, এক পথে, এক ট্রেনে যাদের সঙ্গে চলতে হয়, তাদের সঙ্গেই করছে। এখানে আসলে পুরুষেরা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে ইয়ার্কি করছে না, জাতটার সঙ্গে করছে।

মেয়েজাতটার সঙ্গে। কারণ এই জাতটা সম্পর্কে তাদের ধারণা এই, যে, ‘এই জাতটাকে যাঁতা যায় কারণ এই জাতটা যা তা। জাতটা কলঙ্কের ভয়ে কাঁপে আর কথায় কথায় কাঁদে। জাতটা জীবনভর মার খায়, যার মার খায় তারই গুণ গায়। জাতটা আসলে কোনও জাতের না।’

ইন্দ্রাণীকে দেখে, যেহেতু ইন্দ্রাণী মেয়ে, মেয়েদের সম্পর্কে মস্তিষ্কে যে ধারণা বাসা বেঁধে আছে তীর্থংকরের , সেটি স্বাভাবিকভাবেই সুড়সুড় করে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে যখন আসে, তখন ইন্দ্রাণী দত্ত চৌধুরী তীর্থংকর দাস পুরকায়স্থের সহকর্মী নন, আগাগোড়া কেবলই তিনি মেয়ে। সমাজ যেরকম ভাবে, সেরকমই, ‘এক শরীর মাংস আর এক মাথা আবর্জনা।’

এই ধারণা গভীরে বলেই অত সহজে তীর্থংকর পেরেছেন ইন্দ্রাণীকে অপমান করতে। তিনি জানেন যে, অপমানের জবাব একটি পুরুষ হলে দিতে পারে, মেয়ের দেবার ক্ষমতা নেই। সুতরাং অসুবিধে কী! তাছাড়া অপমানিত পুরুষের পক্ষে মানুষ দাঁড়ায়, অপমানিত মেয়ের পক্ষে নয়। কারণ মেয়েরা অপমানিত আর পদদলিত হতে জন্মেছে বলেই সবার বিশ্বাস। মেয়েরা অপমানের শোধ নিতে চাইলে ‘শুভাকাঙ্ক্ষীরা’ চিরকালই একে বাড়াবাড়ি বলে বিবেচনা করেছে, প্রতিবাদে প্রেরণা দেওয়ার বদলে পিছিয়ে থাকতে বলেছে। মেয়েদের নাকি মানায় না গলা চড়ানো, চোখ রাঙানো, তেজ দেখানো। বাহ, পুরুষের জন্য এর চেয়ে চমৎকার ব্যবস্থা আর কীই বা হতে পারে। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষকে ইন্ধন জোগায় নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে মেয়েদের যৌন হেনস্থা করে যেতে।

মেয়েদের বিচক্ষণতা, দক্ষতা, মেধা, প্রতিভা— এসবের আজও কোনও দাম নেই। একটি মেয়ে মালি হলেও মেয়ে, মালিক হলেও মেয়ে। সুপার থেকে সুইপার অবধি তার শরীর নিয়ে মজা করে। পুরুষের শ্রেণী আছে। উঁচু শ্রেণী, নিচু শ্রেণী। পুরুষের জাত আছে। উঁচুজাত নিচুজাত। মেয়েদের কোনও শ্রেণী নেই। কোনও জাত নেই। একটিই শ্রেণী তাদের, একটিই বর্ণ। মেয়েবর্ণ। মেয়েজাত। উঁচুশ্রেণী বলে বা উঁচু জাত বলে বা শিক্ষিত বলে, বা স্বনির্ভর বলে, বা প্রতিভাবান বলে মেয়েদের ক্ষমা নেই। এই পুরুষতন্ত্রে সব মেয়েই সমান। সব মেয়েই ‘মাল’, সব মেয়েই ‘ইয়ার্কি মারার জিনিস’।

সমাজের সর্বত্র থিকথিক করছে তীর্থংকরে। যদি মেয়েরা সব ইন্দ্রাণী হত, মেনে না নিত অপমান! যদি মাথা না নোয়াতো। যদি আত্মবিশ্বাস থাকতো তাদের, ইন্দ্রাণীর যেমন আছে! যদি বদ পুরুষদের ক্ষমা না করতো, পাছে লোকে কিছু বলের ভয় যদি না থাকতো! পৃথিবী বদলে যেত।

কবে হবে মেয়েরা নিজেই নিজের পরিচয় ?

কলকাতায় বসবাস করার শুরুতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। সংসারের কাজে আমাকে সাহায্য করার জন্য তখন কাউকে চাই আমি। খুঁজছি কাকে পরিচারিকার চাকরিটি দেওয়া যায়। এক বন্ধু বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, ওখান থেকে দৌড়ে এসে বললো, 'তোমার পাশের বাড়ির দিকে একটা বউ যাচ্ছে, ওকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

আমি ঠিক বুঝে পেলাম না কী বলছে বন্ধুটি, বললাম, 'কে যাচ্ছে বললে?'

বললো, 'বউ।'

'বিয়ে হচ্ছে নাকি পাশের বাড়িতে! বরকেও দেখলে?'

আমি বারান্দায় এলাম দেখতে কী ঘটছে। না, যেমন ছিল চারদিক, তেমনই আছে। কোনও বাড়িতে বাড়তি হৈ চৈ নেই, সানাই বাজছে না কোথাও। বর বধূ বেশে কাউকেই দেখলাম না উঠোনে। বন্ধুটি জোরে হাসছে তখন। এপ্রিল মাসের পয়লা তারিখও নয় যে আমাকে বোকা বানাবে কেউ। কিন্তু টের পাই যে আমি বোকা বনে আছি।

না, একদিনে হয়নি। কয়েক মাস আমার লেগেছিল বুঝতে যে, যে মেয়েরা অন্যের বাড়ি কাজ করে, সে মেয়েরা যদি বিবাহিত হয়, তবে তাদের বউ বলে ডাকা হয়। এই মেয়েদের বর বা স্বামীর সঙ্গে কারও চেনা পরিচয় থাকতে হবে, তার কোনও মানে নেই।

'আর যে পুরুষেরা অন্যের বাড়ি কাজ করে, তারা যদি বিবাহিত হয়, তবে কি তাদের বর বা স্বামী বলে ডাকা হয়?'

আমার এই প্রশ্নকে উদ্ভট বলে লোকেরা বিবেচনা করে। কিন্তু আমার প্রশ্ন অতি সরল, এবং সহজ। বুঝতে কারও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তারপরও কাউকে আমি বোঝাতে পারি না।

না। এই বউ বলে ডাকার চলটি একেবারে যে কথ্য ভাষায়, তা নয়। শুদ্ধ ভাষায় এর চল বেশ আছে। রাজ্যের পত্রিকাগুলোয় প্রায় প্রতিদিনই পড়ছি, 'ঝাঁপ দিয়ে বধূর আত্মহত্যা।' 'বধূ খুন'। 'বধূ ধর্ষণ'। বধূদের নিয়ে কিছু না কিছু খবর থাকেই। বধূ কারা? ওই একই উত্তর। মেয়ে। মেয়েদের বধূ বলা হচ্ছে কেন? যেহেতু তারা

বিবাহিত। মেয়েরা কি বিয়ে করলে আর মেয়ে থাকে না? বধূ হয়ে যায়? পুরুষরা তো বিয়ের আগে এবং পরে পুরুষই থাকে। খবর কোনওদিন এরকম পড়িনি, বরের আত্মহত্যা। বর খুন। বর ধর্ষণ। বা 'স্বামীর আত্মহত্যা'। 'স্বামী খুন'। 'স্বামী ধর্ষণ'। নাম দিয়ে নয়, লিঙ্গ দিয়েও নয় অর্থাৎ মেয়ে মহিলা নারী রমণী কিছু দিয়ে নয়, তার শিক্ষা দীক্ষা, কাজ কর্ম দিয়ে নয়, প্রতিভা পারদর্শিতা দিয়ে তো নয়ই, মেয়ের পরিচয় পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক দিয়ে।

বাজার করতে গেলে, যে মাছওয়ালারা আমাকে চেনে না, ডাকে বৌদি বলে। আমি যদি তাদের বৌদি, তবে তাদের দাদাটা কে, একদিন জানতে চেয়েছিলাম। না, কোনও দাদাকে তারা চেনে না। মহিলা দেখলেই গণহারে বৌদি ডাকে তারা। অভ্যেস। শুধু মাছওয়ালাকে দোষ দিই কেন, যত ওয়ালা আছে, সবাই ওই একই পথের পথিক। টেলিভিশনের রান্নাবান্নার অনুষ্ঠানে যে মহিলাই আসুক রান্না করতে, মধুর হেসে সবাইকেই বৌদি বলে সম্বোধন করা হয়। কোনও এক পুরুষ-দাদার বউ সে, এই হল মহিলার পরিচয়।

অভ্যেস। অভ্যেসটা না হওয়ার কোনও কারণ নেই বলে অভ্যেসটা হয়েছে। মানুষ তো তার পরিবার পরিজন থেকে, চারপাশের চারজন থেকে শেখে। তারা শিখেছে যে মেয়েদের সবসময় কোনও না কোনও পুরুষ-প্রভু থাকতে হয়, পুরুষ-প্রভুরা মেয়ে নামক প্রাণীগুলোর নিরাপত্তা। শিখেছে যে মেয়েদের পণ দিয়ে পুরুষ-প্রভুদের নিয়ন্ত্রণে পরাশ্রয়ী লতার মতো বেঁচে থাকতে হয়। শিখেছে মেয়েদের কোনও পৃথক অস্তিত্ব থাকতে নেই।

সাধারণত স্বামীর ওপর সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল মেয়েরা। তবে সত্য এই, মেয়েরা যতদিন না রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুরুষের সঙ্গে সমান হচ্ছে, ততদিন তাদের নিজের পরিচয়ে নিজের বাঁচাটা নিশ্চিতই দুরূহ। যতদিন না তারা শারীরিক স্বাধীনতা অর্জন করছে, ততদিন তাদের মানসিক স্বাধীনতাও কচু পাতায় জলের মতো, এই থাকে তো এই থাকে না।

মেয়েরা কী করে নিজের পরিচয় নিজেই হবে যদি বিয়ে করলে নিজের বাড়ি তাকে ছাড়তে হয়, অন্যের আশ্রয়ে, অন্যের করুণায় তাকে বাস করতে হয়, অন্যের ঠিকানাকে নিজের ঠিকানা করতে হয়, অন্যের নামকে নিজের নাম? মেয়েরা নিজে তখন নিজের আর পরিচয় নয়। স্বকীয়তা তো ওখানেই শেষ। অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বের তো ওখানেই মৃত্যু। তখন যা বেঁচে থাকে, তা হল পুরুষের সঙ্গে যে সম্পর্কে মেয়েরা সম্পর্কিত, সেটি। স্বামী পুরুষটির পরিচয়ে একটি মেয়েকে বাকি জীবন বাঁচতে হয়। অনেকে আবার স্বামীর পদবী না ধারণ করে বিরাট একটা নারীবাদী কাজ করে ফেলেছে বলে মনে করে। স্বামীর পদবী না ধারণ করে যে পদবীটি ধারণ করে আছে, সেটি তো পিতার পদবী। এ নিয়ে গৌরবের শেষ নেই নারীবাদীদের। কেন গৌরব? পিতা কি পুরুষ নয়? পিতার পদবী মেনে নেওয়া কি পিতৃতন্ত্রকে মেনে নেওয়া নয়?

যে সমাজে একটি মেয়েকে পণ দিয়ে বিয়ে করতে হয়, আইনত নিষিদ্ধ হওয়ার পরও পণপ্রথার রমরমা সামান্যও যেখানে কমেনি, সেখানে একটি মেয়ে নিজের পরিচয় কোথায় পাবে? পরিচয় তো পয়দা হয় না মাঠে ঘাটে! রাস্তাঘাটে বিজ্ঞাপন দেখি পণপ্রথার বিরুদ্ধে। ভেবেছিলাম, হাতে গোনা কিছু অশিক্ষিত অসৎ লোক ছাড়া বুঝি পণের মতো মন্দ জিনিস কেউ আর নেয় না। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে, ভুল আমার তত ভাঙছে। ধর্ম, কুসংস্কার, পুরুষতন্ত্র এত গভীরভাবে এই সমাজে প্রোথিত এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে এত ভয়ংকরভাবে নানা তন্ত্র মন্ত্র দ্বারা আক্রান্ত যে আমি সত্যিই আতঙ্কিত।

আমার গাড়ির চালক তরুণ ভুঁইয়া কয়েকদিন আগে আমার কাছে বিরাট অংকের টাকা ধার চাইলো।

'কেন টাকা কেন?'

'বোনের বিয়ে দিচ্ছি, তাই পণ দিতে হবে।'

'পণ? পণ দেবে কেন? পণ তো নিষিদ্ধ।'

তরুণ হো হো করে হাসলো। হাসির অর্থ করলে এই দাঁড়ায় যে, আমার মতো বোকা সে আর দেখেনি আগে। পণ আবার নিষিদ্ধ হল কবে, পণ তো পুরোদমে চলছে! আমি হাঁ হয়ে থাকি। তরুণ বর্ণনা করে, সেও পণ নিয়েছিল। আশি হাজার টাকা। রঙিন টেলিভিশন, ফ্রিজ ফার্নিচার সেও নিয়েছিল। গয়না গাটিও সেও। যে ছেলের সঙ্গে বোনের বিয়ে হচ্ছে, সে ল-ইয়ার।

'লইয়ারেরও পণ চাই?'

তরুণ আবার হাসলো। 'চাই মানে? নিশ্চয়ই চাই। বোন সুন্দরী বলে কিছু কম টাকায় রফা হয়েছে।'

'ছেলে লইয়ার, তার কি টাকা নেই নাকি, মেয়ের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে!'

'হ্যাঁ নিচ্ছে। এরকমই নিয়ম।'

তরুণকে বললাম, 'এই যে দেড় দুলাখ টাকা খরচ করছো পণ দিতে। তারচেয়ে টাকাটা বোনের লেখাপড়ার খরচের জন্য ব্যয় করো, উচ্চ মাধ্যমিক পড়ছে। এ কোনও বিয়ের বয়স হল? বোনকে লইয়ার বানাও। তাহলে তো আর পণের প্রয়োজন পড়বে না। আর যে বাড়িতে পাঠাচ্ছো বোনকে, ওখানে কেমন হবে তার পরনির্ভর জীবন, সে তো জানো না! হয়তো অত্যাচার করবে, প্রতিরাতে পেটাবে, হয়তো তাড়িয়ে দেবে, তখন? পরনির্ভর মেয়েটিকে বাপের বাড়ি ফিরে আসতে হবে, সেখানেও পরনির্ভরতা। উঠতে বসতে কথা শুনতে হবে। দুর্ভোগের তো সীমা থাকবে না। তার চেয়ে মেয়ে লেখাপড়া করুক, নিজের পায়ে দাঁড়াক। কারও আশ্রয়ের আশায় বসে থাকতে হবে না। মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে।'

তরুণ এবার আগের চেয়ে আরও জোরে হাসলো। আমার মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ ইহজীবনে সে দেখেনি। আমি বাস্তববুদ্ধিবর্জিত কিছু, এ তার বদ্ধ ধারণা।

'তোমার বোন কি লেখাপড়া বন্ধ করে দেবে? পড়বে না আর?'

তরুণ বললো, 'এখন শ্বশুরবাড়ির ইচ্ছে। ওরা যদি লেখাপড়া করাতে চায়, করাবে। না করাতে চাইলে করাবে না।'

'তোমার বোনের ইচ্ছের কোনও দাম নেই?'

তরুণ আবারও হাসলো। হাসতে হাসতে বললো, 'এ আবার কী! ও তো মেয়ে!'

অনেকক্ষণ চুপ থেকে অথবা স্তব্ধ হয়ে থেকে বললাম, 'মেয়েটা কি স্বামী শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি হয়ে উঠবে নাকি?'

তরুণ একগাল হেসে বললো, 'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই । এরকমই তো নিয়ম।'

আমি যে সমাজের নিয়ম নীতি সম্পর্কে মোটেও ওয়াকিবহাল নই, এ ব্যাপারে তরুণ নিশ্চিত। আমার জন্য একরকম করুণাই হল তার।

আর কিছুদিন পর তরুণের বোন কারও বউ, কারও বৌদি, কারও কাকিমা, কারও মামিমা হয়ে জীবন শুরু করবে। বিলীন হয়ে যাবে তার জীবন অন্য জীবনে। তার অস্তিত্ব অন্য অস্তিত্বে। এভাবেই তরুণের বোনের মতো মেয়েরা প্রতিদিনই নিঃশেষ হচ্ছে, নিজের একটি পরিচয় নির্মাণ করার বদলে আত্মাহূতি দিচ্ছে পুরুষতন্ত্রের আগুনে। নিজের সমস্ত সম্ভাবনাকে দাউ দাউ করে পুড়িয়ে অন্যের আশ্রয়ে অন্যের অনুগ্রহে অন্যের ভিক্ষেয় বেঁচে থাকে মেয়েরা। এই বেঁচে থাকাকে আর যাই বলি আমি, বেঁচে থাকা বলি না।

কে দোষী? পুরুষ না পুরুষতন্ত্র?

"Male domination is so rooted in our collective unconscious that we no longer even see it. It is so in tune with our expectations that it becomes hard to challenge it. Now, more than ever, it is crucial that we work to dissolve the apparently obvious and explore the symbolic structures of the androcentric unconscious that still exists in men and women alike."
Pierre Bourdieu

সেদিন কলকাতা টিভির একটি অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে কবি লেখক এবং সাধারণ পাঠকদের কিছু সদ্য সংগ্রহ করা মন্তব্য ছিল। প্রথম মন্তব্যটি নবনীতা দেবসেনএর। নবনীতার আমি অনুরক্ত। বিশেষ করে তাঁর রসবোধের। অসাধারণ তাঁর রসবোধ। কিছুদিন আগে দিল্লিতে একটি নারীবাদী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দুজনই একসঙ্গে কলকাতায় ফিরেছি। আমাদের সেই ফেরাটি যেমন জ্ঞানে মানে সমৃদ্ধ ছিল, তেমনি রসে ছিল টইটম্বুর। সময় উড়ে গেছে পলকে। সেই নবনীতা, যিনি অনেকবারই বলেছেন আমার লেখা তাঁর ভালো লাগে, বিশেষ করে পুরুষতন্ত্রের সমালোচনা করে যেগুলো লেখা। মনে আছে মাত্র ক'দিন আগে তেমনই একটি লেখা আমি নিজেই পড়ে শুনিয়েছিলাম, আমার বাড়িতে বসেই তিনি সেটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, সেই নবনীতা দেখলাম কলকাতা টিভিতে আমার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন, 'তসলিমার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হল, আমরা পুরুষতন্ত্রের বিরোধী, ও তা নয়। মানে আমরা সিসটেমের সমালোচনা করি, কিন্তু তসলিমার ব্যাপারটা ভিন্ন, ও তা করে না, ও পুরুষতন্ত্রবিরোধী নয়, ও হল পুরুষবিদ্বেষী।' এই মন্তব্য শুনে আমি অনেকক্ষণ বাকরুদ্ধ বসে ছিলাম। এই যে দু দশক ধরে নারীর অধিকারের পক্ষে দাঁড়িয়ে ধর্ম, মৌলবাদ এবং পুরুষতন্ত্রের সমালোচনা করছি, এ নিয়ে বইএর পর বই লিখছি, এ কারণে নিজের দেশ থেকেও যুগ পার হয়ে গেল নির্বাসিত, আর একজন নমস্য নারীবাদী বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে কি না আজ এই প্রতিদান পেলাম! আমার জীবন নিয়ে তিনি কী ক্রূর রসিকতাই না করলেন!

আমি বিশ্বাস করি না যে নবনীতা দেবসেন আমার কোনও বই পড়েননি। কোনও বই বা কোনও লেখা না পড়ে মন্তব্য করার লোক যে সমাজে নেই, তা নয়। কিন্তু

তাদের কাতারে আমি তাঁকে ফেলবো কেন! তিনি দায়িত্বান মানুষ। নিজে যখন বক্তব্য পেশ করছেন, নিশ্চয়ই দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো তা করেননি। আমি জানি তারাই এই ধরনের মন্তব্য করে যারা আমার লেখা পড়েনি অথবা পড়লেও বোঝেনি। বাংলাদেশেও লোকে করেছে, পশ্চিমবঙ্গেও করে। কিন্তু নবনীতা দেবসেনএর মাপের কোনও লেখকের কাছ থেকে এমন অপবাদ আমার জোটেনি কোনওদিন। এ অনেকটা চরিত্রহননের মতো। আমি আমার মানববাদী আদর্শ আর নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকি যদি, সত্য বলার সততাকে যদি খুইয়ে ফেলি, আমি নিজেই বলবো চরিত্র বলে কিছু নেই আমার। কিন্তু আমি যা নই, আমাকে যদি বলা হয় আমি তা, তবে তা চরিত্রহনন ছাড়া আর কী! আমার সংজ্ঞায় চরিত্রহীনতার সঙ্গে যৌনতার কোনও সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে শঠতা, নীচতা, অসততা, মিথ্যে, প্রতারণা, ছলনা, চাতুরির সঙ্গে।

ইটিভির পরম্পরায় নবনীতা দেব সেন এবং আমাকে নিয়ে দুটো অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। আরও অনেক কবি সাহিত্যিক শিল্পী যাদের ডাকা হয়েছিল পরম্পরায়, তাদের অনুষ্ঠান প্রচার হয়ে গেছে। কিন্তু কী এক রহস্যময় কারণে নবনীতা-তসলিমা জুটির দুটি অনুষ্ঠানের একটিও, বছর পার হয়ে গেছে, আজও প্রচার হয়নি। ওখানে আমি আবার জানতে ইচ্ছুক ছিলাম নবনীতা দেবসেনএর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের স্বামীর পদবী ধারণ করার কারণ। সই নামে তাঁর নারীলেখক সংগঠনে আর যে নারীলেখকেরই যোগ দেওয়ার অধিকার আছে, আমার কেন নেই, এ নিয়েও জানতে চেয়েছিলাম। দুটো অনুষ্ঠানই বেশ বিদগ্ধ নারীবাদী অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু বেছে বেছে নারীবাদের ওপরই কাঁচি চালানোর প্রবণতা আজকাল প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের।

অনেককাল যাবৎ ধর্ম ও পুরুষতন্ত্রের সমালোচনা করে লিখছি, বলছি। কারণ মানবাধিকারে বিশ্বাসী আমি। যেহেতু মানবাধিকারে বিশ্বাসী, সেহেতু নারীর অধিকারে বিশ্বাসী। আমার কাছে মানব বলতে নারী পুরুষ উভয়ে । নারী যেহেতু সমাজে নারী হওয়ার কারণে নিগৃহীত হচ্ছে, নিষ্পেষিত হচ্ছে, যেহেতু নারীর স্বাধীনতা এবং সমানাধিকার পাওয়ার বিরুদ্ধে নানারকম পুরুষতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র বিরাজমান, তাই এসব নারীবিরোধী নিয়মনীতি আর কুটিল জটিল ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করি। করি বলেই কেউ আমাকে নারীবাদী বলে, কেউ বলে মানববাদী। আর মূর্খরা নিশ্চিন্তে বলে যায় যে আমি নাকি পুরুষবিদ্বেষী।

পুরুষবিদ্বেষী শব্দটি ভয়ংকর। ভালো কলঙ্ক লেপন হয়। হই রই করে তেড়ে আসে লোক। ঘেন্না দেয়। নারীকে যারা পুরুষের অধীন করে রাখতে চায়, তারা সুযোগ পেলে আমাকে প্রায় কাঁচা খেয়ে ফেলে। খেতে না পারলে প্রায় খাওয়ারই মতো একটি জিনিস করে, পুরুষবিদ্বেষী অপবাদ দেয়। দীর্ঘদিন যাবৎ অপবাদের শিকার আমি। মৌলবাদী এবং একই সঙ্গে যৌগবাদীরাও ঘেন্নায় থুতু ছুড়েছে আমার দিকে। 'ও

সাহিত্য জানে না, ও প্রচার চায়' — এরকম মুখরোচক নিন্দা বাতাসে ভাইরাসের মতো ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে সত্যের জন্য সাম্যের জন্য আমার লড়াইকে মানুষের চোখে গুরুত্বহীন করার রাজনীতি চলেছে। এ নতুন নয়।

'পুরুষ ভালো, পুরুষতন্ত্র মন্দ।' এই হল সোজা কথা, সাফ কথা এবং সবার কথা। এটি শুনতে চমৎকার। কিন্তু আমার প্রশ্ন একটি, সবার কাছে এবং নিজের কাছেও, পুরুষতন্ত্র কি আকাশ থেকে পড়েছে? পুরুষতন্ত্র একটি তন্ত্র যেখানে পুরুষের স্বপক্ষে আইন কানুন, পুরুষের স্বপক্ষে সামাজিক এবং পারিবারিক বিধি ব্যবস্থা, সমাজ সংসারে যাবতীয় যা কিছু সবই পুরুষের স্বপক্ষে, সবই পুরুষকেন্দ্রিক। না, এই তন্ত্রটি আকাশ থেকে পড়েনি, এটি পুরুষের তৈরি, এবং পুরুষেরা এই তন্ত্রের সুযোগ সুবিধে সব ভোগ করছে, বেশির ভাগ নারীর ভূমিকা হল, পুরুষদের এটি ভোগ করতে সাহায্য করা। পুরুষতন্ত্রের সমালোচক আমি, কিন্তু আমি দাবি করতে পারি না পুরুষতন্ত্রের জনক পুরুষ নয়। যখন বলি, আমাকে সত্য কথা বলতেই হয়, যে, আমরা যখন সভ্যতার বড়াই করছি, উন্নত প্রযুক্তি এবং নানাবিধ শিল্প সংস্কৃতি দর্শন বিজ্ঞানের সাফল্যের পাশাপাশি মহাসমারোহে বেঁচে থাকছে একটি অসভ্য বর্বর প্রথা, পুরুষতন্ত্র যার নাম। এটিকে কে টিকিয়ে রাখছে? হাওয়া? না হাওয়া নয়, সত্যি বলতে গেলে পুরুষ। নারীও। নারী হলেই যে নারীবাদী হবে তা নয়। আমি অনেক পুরুষকে দেখেছি, যারা অনেক নারীবাদীর চেয়েও বেশি নারীবাদী। আবার এমন অনেক নারীর দেখা আমি পেয়েছি, যারা প্রচণ্ডভাবে পুরুষতন্ত্রের ধারক ও বাহক।

সমতার জন্য বিশ্বজুড়ে কম আন্দোলন হয়নি। আন্দোলনের ফলে বৈষম্য টিকিয়ে রাখে এমন অনেক পুরোনো প্রথা নির্মূল হয়ে গেছে, কিন্তু পুরুষতন্ত্রের গায়ে কোনও আঁচড় আজ অবধি লাগেনি। এর কারণ কী বলে মনে হয়? আকাশ থেকে পড়া পুরুষতন্ত্রটির গা গতর লোহায় গড়া বলে? নাকি এটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করে বলে? যারা করে, তাদের কি দোষ দেওয়া অন্যায় নাকি অন্যায় নয়? পুরুষতন্ত্র যেহেতু নারীবিরোধী একটি প্রথা, নারীর অধিকারের সঙ্গে যেহেতু পুরুষতন্ত্রের জন্ম জন্মান্তরের বিরোধ, আমাকে তাই মানবাধিকারের কথা বলতে গিয়ে পুরুষতন্ত্র এবং একই সঙ্গে এই তন্ত্রকে যারা টিকিয়ে রাখছে তাদের কথাও বলতে হয়। তা না হলে ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো ব্যাপারটি দাঁড়ায়। আমাকে দেখিয়ে দিতে হয় যে নারীর স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তিগুলো ঠিক কী কী।

'পুরুষতন্ত্র মন্দ, পুরুষ ভালো' — এই কথাটি ঠিক সেই কথার মতো, 'পুঁজিবাদ মন্দ কিন্তু পুঁজিবাদীরা ভালো।' আমাকে যদি পুরুষবিদ্বেষী বলে অপবাদ না দেওয়া হত, তা হলে হয়তো পুরুষতন্ত্রের সমালোচনা যেমন করছিলাম, তেমনই করে যেতাম, এর হোতাদের সন্ধান করতাম না। যারা হোতাদের আদর আহ্লাদ দিয়ে খুশি রেখে শুধু তন্ত্রকে ঢিল ছোঁড়ে, তারা কি জানে না তন্ত্রের কোনও শরীর নেই, নিজস্ব কোনও বোধ বুদ্ধি নেই! তন্ত্র কথা বলতে জানে না? তারা কি জানে না যে তন্ত্র 'তন্ত্র' চালায় না, চালায় মানুষ! তারা কি জানে না ঢিল ছুঁড়লেও তন্ত্র যেমন বহাল তবিয়তে

আছে, তেমনই থাকবে। তন্ত্রকে চালায় যারা, তাদের যদি অক্ষত অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়, কলকব্জায় তেল ঢেলে তাদের যদি আরও সক্রিয় করা হয়, তবে পুরুষতন্ত্রের জয়জয়কারে জগতের সর্বনাশ হতে বেশি বাকি নেই!

আমার সন্দেহ, যারা শুধু সিস্টেমের ওপর রাগ দেখায়, সিস্টেম প্রস্তুতকারক, ও সিস্টেম রক্ষাকারককে ক্ষমা করে দেয়, তারা আসলে পুরুষশাসন এবং শোষণটাই ছলে কৌশলে চায় যে বজায় থাকুক।

না, আমি পুরুষবিদ্বেষী নই, কোনও কালেও ছিলাম না। ব্যক্তি পুরুষের ওপর রাগ করে, পুরুষের ওপর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে আমি এই সংগ্রামে লিপ্ত হইনি। পুরুষদের মধ্যে আমার প্রেমিক আছে, প্রাণের বন্ধু আছে, সহমর্মী, সহযোদ্ধা সবই আছে। আমি শুধু সেই পুরুষদের চিহ্নিত করতে চাই যে পুরুষেরা পচা পুরোনো পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কিছুই বদলাতে দেবে না, নিজেদের নারীবিরোধী মানসিকতাও সামান্য পাল্টাবে না, যারা নারী পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে না, যারা পুরুষতন্ত্রকে দুধকলা দিয়ে পুষছে, যারা নারীকে পায়ের তলায় জীবনভর পিষবে বলে পণ করেছে। আমি চাই তারা মানুষ হোক। সেই নারীরাও মানুষ হোক, যারা পুরুষতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেতনভাবেই সব রকম সহযোগিতা করছে, চাই তারা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকে অস্বীকার করুক, সততায় আর সাম্যে প্রবলভাবে বিশ্বাসী হোক। মানবতন্ত্রে সত্যিকার বিশ্বাসী হলে, মানবতন্ত্র জীবনে চর্চা করলে, নারী পুরুষের অধিকারে কোনও ফারাক থাকে না।

বধূ নির্যাতন আইনের প্রয়োগে মেয়েরা কেন দ্বিধাগ্রস্ত?

ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়। রুদ্রনীল ঘোষ। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।। কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য। সুমন ভট্টাচার্য। এরা শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তার মানে এই নয় এরা এই সমাজের মানুষ নয়। পুরুষ শাসিত সমাজের পুরুষ এরা। যে পুরুষেরা গান গায়, কবিতা লেখে, বাজনা বাজায়, অভিনয় করে — অর্থাৎ শিল্প সাহিত্য চর্চা করে, সেই পুরুষেরা, ভাবা হয় যে মানুষ হিসেবে বুঝি খুব উন্নত, মানবতায় বা মানবাধিকারে বিশ্বাস করে, নারী স্বাধীনতাকে সমর্থন করে। এটি একশ ভাগ ভুল একটি তথ্য। শিল্প সাহিত্যের বাইরের লোকদের মধ্যে যে পরিমাণ ভালোত্ব এবং মন্দত্ব আছে, ভেতরের লোকদের মধ্যে তা একই পরিমাণ আছে। গ্রামের একটি কৃষক-পুরুষ নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হতে পারে, একটি নামকরা নায়ক তাতে একবিন্দু বিশ্বাসী নাও হতে পারে। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যেও নারী নির্যাতন প্রশ্নে কোনও দ্বিমত নেই। বরং শিক্ষিতদের মধ্যে দেখা যায় পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা তুলনায় বেশি। এর কারণ, শিক্ষিতরা ভালো শিখতে পারে তন্ত্র মন্ত্র। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে শিখে নিতে পারে নিয়ম কানুন, পুরুষতন্ত্রের পুঙ্খানুপঙ্খ। অশিক্ষিতদের পক্ষে এত শেখা সম্ভব হয় না।

পুরুষেরা যারা কৃষক, যারা শ্রমিক, ছোট চাকুরে, বড় চাকুরে, ব্যবসায়ী, উকিল, বিচারক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, শিল্পপতি, শিল্পী, সাহিত্যিক বা অন্য কিছু, ধনী হোক, দরিদ্র হোক, শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক — দেখা যায় তারা নারী নির্যাতনে প্রায় একইরকম সিদ্ধহস্ত। ধন যাদের যেরকমই থাকুক, এক সমাজেই তাদের বাস, সে সমাজটা পুরুষতান্ত্রিক। পুরুষের নিয়মে, পুরুষের আধিপত্যে, পুরুষের বংশবৃদ্ধিতে যে সমাজটা চলে। শিক্ষিতরা নির্যাতন কিছু কম করে না। শিক্ষিত হলেই নারীকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেবে, ভাবাটা ঠিক নয়। প্রচলিত যে শিক্ষা, ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষাটা পাচ্ছে ছেলেমেয়েরা, তার সঙ্গে পুরুষতন্ত্রের কোনও বিরোধ নেই। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনও বাক্য আমাদের ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা পড়ে না কোনও বইয়ে। পাঠ্যপুস্তকে নারীর সমানাধিকারের পক্ষে কোনও জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা নেই। প্রচলিত এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নিয়ে বড় হতে সবরকম সহযোগিতা করে। শিশুরা ঘরে বাইরে চোখ রেখে দেখে, শেখে, বোঝে, যে, নারীর স্থান গৃহে, সংসার পালনে, শিশু যত্নে, স্বামী সেবায়, এবং পুরুষের বাস বিশাল বিস্তৃত বহির্জগতে, বিদ্যায়, বিজ্ঞানে,

বৈভবে, বিপ্লবে, বিদ্রোহে, বিদ্বেষে, বিজয়ে। নারী বিদুষী হোক নিরক্ষর হোক, ধনী হোক দরিদ্র হোক, শহরে বা গ্রামে যেখানেই তার বাস হোক, পুরুষ শাসিত সমাজের নারীবিরোধী সংস্কৃতির সামনে সমান অসহায়।

এসব তথ্য কোনও মানুষের অজানা থাকার কথা নয়। বোধবুদ্ধি থাকলে কেউ এসব নিয়ে তর্ক করে না। কিন্তু কলকাতার কিছু লেখাপড়া জানা পুরুষ দেখলাম, বলছে, বধূ নির্যাতন এবং নারী নিগ্রহ আইন ভারতবর্ষের সবার জন্য মানানসই নয়। কেন নয় জিজ্ঞেস করায় খুব গম্ভীর কণ্ঠে একজন বললো, মুর্শিদাবাদের গ্রামের কোনও মেয়ের জন্য যে আইন খাটে, গড়িয়াহাটের বহুতল ফ্ল্যাটের মেয়ের জন্য সে আইন খাটে না। কেন খাটে না জানতে চাইলে যা বললো তা হল, যেভাবে গ্রামের অশিক্ষিত মেয়েদের ওপর অত্যাচার হয়, সে রকম অত্যাচার তো শহরের শিক্ষিত মেয়েদের ওপর হয় না। গ্রামের মেয়েদের মেরে আধমরা করে ফেলে রাখলেও কই ওরা তো মামলা করতে যাচ্ছে না, কিন্তু শহুরে শিক্ষিত মেয়েরা সামান্য মার খেলেই ফোর নাইনটি এইট দেখিয়ে দেয়। হাঁ হয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। আমার ওই বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই গড়গড় করে বলে গেল, মেয়েরা খুব অপপ্রয়োগ করছে এই আইনের। এই আইন পুরুষবিরোধী আইন। মার খেলে মেয়েরা থানায় ডায়রি করতে পারে। কিন্তু ফোর নাইনটি এইট কেন? অনেক নিরপরাধ পুরুষকে এই আইন ব্যবহার করে হয়রানি করা হচ্ছে। শহরের লোকেরা এখন কাহিনী বুঝে গেছে। তাইতো ব্যাকল্যাশ হচ্ছে। রাগে পুরুষগুলোর চোখ জ্বলছিল। মেয়েদের প্রতি ঘৃণা ঠিকরে বেরোচ্ছিল ভেতর থেকে।

আমার কেবলই মনে পড়ছিল সরকারি সমীক্ষার কথা, ভারতবর্ষের দুই তৃতীয়াংশ বিবাহিত মেয়ে ডমেস্টিক ভালোলেন্স বা গৃহ নিগ্রহের শিকার। খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল দুই তৃতীয়াংশের ক'জন বধূনির্যাতনের মামলা করেছে? সংখ্যাটি আমার জানা নেই। কিন্তু অনুমান করতে পারি, যে, এক বা একাধিক লাখ নির্যাতিত মেয়ের মধ্যে একজন হয়তো আইনের আশ্রয় নেয়। যারা মামলা করে না তাদের নানারকম কারণ আছে মামলা না করার। কারণগুলো এই ১. জানে না বধূ নির্যাতন আইন বলে কোনও আইন আছে। ২. স্বামীর ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করলে স্বামী ভাত কাপড় দেওয়া বন্ধ করে দেবে, অথবা তাড়িয়ে দেবে। তখন কোথায় যাবে, কী খাবে, কী পরবে, এই দুশ্চিন্তা। ৩. নিজে উপার্জন করছে। কিন্তু বিচ্ছেদ ঘটলে একার উপার্জনে সচ্ছল জীবন যাপন সম্ভব নয়। ৪. মামলা করলে স্বামী মেরে হাড়গোড় ভাঙবে। প্রাণেও মারতে পারে, এই ভয়। ৫.মামলা করলে লোকে মন্দ বলবে। ৬. ডিভোর্স হলে ছেলেমেয়েগুলো কষ্ট পাবে। ৭. স্বামীর মানসিকতা যদি পাল্টায় ভবিষ্যতে, তার অপেক্ষা। ৮. ডিভোর্স হলে দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হবে। ডিভোর্সি মেয়েদের এই সমাজে দুর্ভোগের শেষ নেই। ৯. অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হলে সেই পুরুষও হয়তো একই চরিত্রের হবে। তাই কী দরকার! ১০. সমাজটাই তো এমন। কত মেয়ে নির্যাতন সইছে। তারা যদি মুখ বুজে থাকতে পারে, সে পারবে না কেন! ১১. বাপের বাড়ি থেকে মামলার বদলে আপোস করতে উপদেশ দিচ্ছে।

১২. ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন এই জুটি, এই জুটি ভাঙা মানে ভগবানের বিরুদ্ধে গিয়ে পাপ কামানো।

মূলত এসবই অত্যাচারী স্বামীর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন মামলা না করার কারণ। ভয়। দ্বিধা। দ্বিধা ভয় কাটিয়ে যে মেয়েরা এই মামলা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে পুরুষেরা যে ক্ষেপে আগুন হয়ে আছে, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

বধূ নির্যাতন আইন মেয়েদের পক্ষের এবং পুরুষের বিপক্ষের কোনও আইন নয়। এটি অন্যায় অত্যাচার নির্যাতন ইত্যাদির বিরুদ্ধে আইন। মেয়েদের ওপর নিয়ত নির্যাতন চলছে, শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বলে মেয়েদের মার খেতে হচ্ছে। কে তাদের সবল হওয়ার পথে বাধা ! আমরা তা জানিনা তা নয়।

সমাজের ব্যবস্থা এমন যে এই পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষেরা কর্তার ভূমিকায় এবং মেয়েরা দাসীর ভূমিকায়। দাসী শব্দটি শুনতে খারাপ লাগে, কিন্তু দাসী না বলে কর্ত্রী বললেও ভূমিকার কোনও হেরফের হয় না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের যে স্থানে রাখা হয়েছিল আদিকাল থেকে এখনও সেই স্থানেই মেয়েরা রক্ষিত আছে। মেয়েদের স্থান পরিবর্তন হয়নি। এখনও বিয়ে হলে মেয়েরা নিজের বাড়ি বা বাপের বাড়ি থেকে স্বামী বা শ্বশুরবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

এই মামলা করে মেয়েদের অর্থকড়ি জোটে না, বা কোনও অর্থেই লাভজনক কিছু নয় এটি, মামলা করলে পুরুষদের নয়, উল্টে মেয়েদেরই সামাজিকভাবে একঘরে করা হয়, তাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে সম্পর্ক স্থাপনে পুরুষেরা উদ্যোগি হয় না, এত সব ঝুঁকি নিয়েও যখন একটি মেয়ে মামলা করে, আর কোনও উপায় থাকে না বলেই করে। এই মামলা করে মেয়েরা মূলত নিজের প্রাণ বাঁচায়, নিজের মান সম্মান বাঁচায়। প্রতিদিনের অসহ্য অপমান থেকে, অকথ্য অবজ্ঞা থেকে, মর্মান্তিক মৃত্যু থেকে নিজেকে বাঁচায়। আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মান থাকলে মার খেয়ে বাঁচতে চায় না কেউ। বিশেষ করে তার মার, যার কি না জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু, সবচেয়ে বড় সহমর্মী হওয়ার কথা।

পুরুষেরা বধূ নির্যাতন আইনটির বিরোধী। কারণ স্ত্রীর সঙ্গে যথেচ্ছাচার করায় এখন বাধ সাধছে এই আইন। স্ত্রী হচ্ছে নিজের অধিকৃত জিনিস, নিজের এই জিনিসটিকে যদি লাথি গুঁতো দিয়ে, চড় থাপ্পড় দিয়ে, কিল ঘুষি দিয়ে বশে রাখা না যায়, তবে আর কাকে যাবে! সঙ্গমে রাজি না হলে ধর্ষণ করা যদি না যায় তবে কোথায় যাবে পৌরুষ! পুরুষের পৌরুষে ঘা মেরেছে এই আইন। তাই তারা চায় গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত নির্যাতিত মেয়ের মতো শহুরে শিক্ষিত মেয়েরাও হোক। মুখ বুজে পিঠ পেতে সব অনাচার সইতে শিখুক। না সইলে রাগ হয় পুরুষদের। গা বড্ড জ্বলে।

পুরুষেরা চায় না মেয়েরা তাদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হোক। মেয়েরা স্বাধীনতার অর্থ বুঝুক। মেয়েদের কোনও আত্মসম্মানবোধ থাকুক। তাই কায়দা করে

আইনের অপপ্রয়োগ হয় এই অভিযোগ করে ইনিয়ে বিনিয়ে আইনের বিরুদ্ধেই কথা বলছে।

এ নতুন নয়। পৃথিবীর সব দেশেই নারীর ওপর পুরুষের অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে যখনই কোনও আইন প্রণয়ন হয়েছে, এভাবেই নারীঅধিকার বিরোধী পুরুষেরা রাগ করেছে, ফুঁসে উঠেছে, চেঁচিয়েছে। এবং এদের মধ্যে সবধরনের লোক ছিল, বরং চাষাভুষোর চেয়ে শহরের তথাকথিত শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা ছিল বেশি।

যখনই কোনও মেয়ে মার খেতে খেতে কুঁজো হয়ে থাকা পিঠটাকে সোজা করে, মাথাটাকে উঁচু করে, আর মার খাবে না বলে পণ করে, তখনই পুরুষেরা সেই মেয়ের দিকে আঙুল তুলে বলে মেয়ে বাজে, মেয়ে খারাপ। এ নতুন নয়। সব দেশে সব সমাজেই এমন ঘটেছে। ঘটে।

দুই তৃতীয়াংশ বিবাহিত মেয়ে এই ভারতবর্ষে নির্যাতিত হচ্ছে স্বামী দ্বারা। যেদিন প্রতিটি নির্যাতিত মেয়েই অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ মেয়েই বধূ নির্যাতন মামলায় অত্যাচারী স্বামীদের জেলে ভরবে, সেদিনই বুঝবো মেয়েরা এই ভারতবর্ষে সামান্য হলেও সচেতন হয়েছে, সামান্য হলেও আত্মসম্মানবোধ তাদের আছে। যেদিন তাদের ভয় ঘুচে যাবে, দ্বিধা দূর হবে, সেদিন বুঝবো মেয়েরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আত্মসম্মানবোধ থাকলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপায় কিছু না কিছু বেরোয়।

আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, স্বামী দ্বারা মেয়েরা যত অত্যাচারিত হয়, যত লাঞ্ছিত হয়, যত অপমানিত হয়, তত আর কারও দ্বারা হয় না। ভুলে যাওয়া উচিত নয়, মেয়েদের হত্যাকারী অন্য কেউ তত হয় না, যত হয় স্বামী। ভুলে যাওয়া উচিত নয়, মেয়েরা সবচেয়ে বেশি যার কারণে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়, সে হল স্বামী।

যদি এর পেছনে রাজনীতি না থাকতো?

একটা পনেরো বছর বয়সী মেয়েকে পুরুষেরা ধর্ষণ করে জ্যান্ত পুড়িয়ে দিয়েছে। এই হল ঘটনা। ঘটনাটি সকলে জানে। জানে কারণ ঘটনার পেছনে রাজনীতি আছে, এবং রাজনীতির লোক আছে। তদন্তের পর অভিযুক্ত ধর্ষক এবং খুনীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এ খবর পত্রিকার প্রথম পাতায়, টেলিভিশনগুলোর ব্রেকিং নিউজে। কাকে কাকে ধরা হচ্ছে, কে তারা, কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত এসব নিয়ে হৈচৈ হচ্ছে চারদিকে।

আমি শুধু ভাবছি, এই তাপসী মালিক নামের মেয়েটির ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যদি রাজনীতি জড়িয়ে না থাকতো, যদি রাজনীতির কোনও লোক এর পেছনে না থাকতো! তবে কি এই হৈচৈটা হত? সিবিআই তদন্ত হত? কেউ ধরা পড়তো?

তাপসী মালিক অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের দরিদ্র মেয়ে। তার মতো দরিদ্র আরও লক্ষ মেয়ে এই রাজ্যেই আছে। তারা কী খাচ্ছে, কী পরছে, তাদের কোনও জমি আছে কি নেই, তাদের দুপয়সা উপার্জন আছে কি নেই, তার খবর কে রাখে! তারা লাথি ঝাঁটা কেমন খাচ্ছে, কে তাদের অপমান করছে, অসম্মান করছে, কে তাদের দিনে দুপুরে, বা রাতে রাতে ধর্ষণ করছে, কোনওদিন কেউ জানতেও চায় না। ঘরে ঘরে তাপসী মালিকের মতো লক্ষ মেয়ে গুমরে কাঁদে।

ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই এ দেশে মেয়েরা অধর্ষিত অবস্থায় জীবন যাপন করে। ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই যে এদেশে এবং এ রাজ্যে নারী তার সর্বময় অধিকার এমন ভোগ করে যে, হঠাৎ কোথাও কোনও ধর্ষণ জনিত দুর্ঘটনা ঘটলে তুলকালাম কাণ্ড বেধে যায়।

তাপসী মালিকের হত্যাকাণ্ডের পেছনে এবং হত্যাকাণ্ডের বিচার চাওয়ার পেছনে রাজনৈতিক দুটো দল যদি জড়িত না থাকতো এবং তারা যদি একে অপরের বিরোধী না হত তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ধর্ষণ এবং হত্যা প্রতিদিনের নারী-ধর্ষণ এবং হত্যার মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ খবর অথবা অখবর হয়ে পড়ে থাকতো। ভারতবর্ষে বিপুল সংখ্যক নারী বিক্রি হচ্ছে, পাচার হচ্ছে, প্রতারিত হচ্ছে, প্রতিদিনই বাধ্য হচ্ছে বেশ্যাবৃত্তিতে নামতে। ভারতবর্ষে বিরাট সংখ্যার নারী ধর্ষণ, হত্যা এবং আত্মহত্যার শিকার হচ্ছে, প্রতিদিন। অযুত নিযুত নারী অনাহার, অনাচার, অবিচার, অশিক্ষা আর অস্বাস্থ্যের শিকার। এবং এগুলোকে দেশের প্রধান অথবা গুরুত্বপূর্ণ কোনও সমস্যা

বলে কেউ মনে করে না। ক্ষমতাবান পুরুষেরা সে রাজনীতির ভেতরের হোক, বাইরের হোক, নারী সম্পর্কে একটি রাজনৈতিক ছক সযত্নে লালন করে, তা হল, পুরুষ হচ্ছে রাজার জাত আর নারী প্রজার জাত, যে সে প্রজা নয়, একটু নিম্ন জাতের প্রজা।

তাপসীর ধর্ষক এবং খুনী যেদিন ধরা পড়লো এবং মানুষ জানলো তাপসী আসলে আত্মহত্যা করেনি, তাকে ধর্ষণই করা হয়েছিল, ধর্ষণের পর খুন — সেদিন এই শহরের গণ্যমান্য এক পুরুষ নাক সিঁটকে ঠোঁট উল্টে বললো, 'ছি ছি, তাপসী একটা জিনিস হল ধর্ষণ করার? আমাকে সাতশ কোটি টাকা দিলেও তো ওটাকে ধর্ষণ করতে পারতাম না, ওকে দেখলে কি উত্তেজিত হওয়া যায়? ছি!' এই মন্তব্য শুনে আমি ভাবছিলাম এ কি বিখ্যাত ওই পুরুষটিরই মনের কথা, নাকি আরও পুরুষেরও মনের কথা এটি! আমার বিশ্বাস আরও পুরুষের।

কোনও মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে, এবং খুন হয়েছে, এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদটি নিয়ে দুঃখ করার বদলে পুরুষেরা মনে মনে মেয়েটির ধর্ষকের স্থানে নিজেকে বসিয়ে ধর্ষণটা উপভোগ করে তারপর ভোগ করে খুনটা। ভেতরে ভোগটা সারা হয়ে যায় বলে ধর্ষণ নিয়ে যে আহা আহাটা পুরুষেরা করে, তাতে অকৃত্রিমতা থাকে না। থাকলে ধর্ষণ ঘটতো না এত।

অধিকাংশ ধর্ষণের খবর চাপা পড়ে থাকে। গোপন রাখা হয়। নথিভুক্ত হয় না শতকরা সত্তরটি ধর্ষণের খবর। সরকারি হিসেবে, ভারতে প্রতি ঘন্টায় একজন মেয়ে ধর্ষিতা হয়।

কেন ধর্ষণ করে পুরুষেরা? গায়ের জোর আছে বলে করে, সবচেয়ে বড় জোর পুরুষ হওয়ার জোর। ধর্ষণকে আদিকাল থেকে অপরাধ বলে মানা হয়নি। এখন এটি আইনের চোখে অপরাধ। কিন্তু সমাজের চোখে নয়। সমাজের চোখে এটিকে অপরাধ বলে মানা হয় না বলে ধর্ষকদের ঘুরে বেড়ালেও চলে কিন্তু ধর্ষিতাকে মুখ লুকোতে হয়। ধর্ষণ নিয়ে ধর্ষকরা লজ্জা পাবে না, পাবে ধর্ষিতারা, এটাই সামাজিক বিধান। বিধান বলেই বেশির ভাগ ধর্ষিতা আদালতে যায় না, বেশির ভাগ ধর্ষিতাকে কোনও পুরুষই, এমনকী ধর্ষক-পুরুষও বিয়ে করতে রাজি হয় না। ধর্ষিতারা সমাজে ব্রাত্য। ধর্ষকরা নয়। অত্যাচারিতের পক্ষে থাকে না লোক, থাকে অত্যাচারীর পক্ষে। এ সমাজে অত্যাচারীদের সঙ্গে ক্ষমতার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। ক্ষমতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার এবং ক্ষমতার বশ হওয়ার ঐতিহ্য আজও ভীষণ রকম জীবন্ত।

তাপসীকে যে পুরুষেরা ধর্ষণ করেছে, এবং ধর্ষণের ছক যারা তৈরি করেছে, তাদের খুঁজে বার করা হচ্ছে। কোনও রাজনৈতিক দল বা ক্ষমতাবান দল সিবিআইএর তদন্তের দাবি যদি না তুলতো? কিছুই হত না। কেউই ধরা পড়তো না। ধনঞ্জয়ের বিচারের দাবিতে পথে যদি না নামতো ক্ষমতাবানরা? কিছু কি হত? এই কর্ষক-বর্ষক-ধর্ষকপ্রধান সমাজে নারীরা নীরব দর্শক ছাড়া আর কিছু নয়। পুরুষেরা পুরুষবলে নারীজমি কর্ষণ ক'রে বীর্য বর্ষণ ক'রে ধর্ষণ ক'রে পৌরুষ ফলায়।

লোকেরা ধর্ষিতার জন্য যতটা, তার চেয়ে বেশি নিজেদের স্বার্থে ধর্ষিতার পক্ষে দাঁড়ায়। সে ক্ষেত্রে ধর্ষিতা বেঁচে না থেকে খুন হলে তাদের দাবি দাওয়ার জন্য বিস্তর

সুবিধে হয়। যে ধর্ষিতা খুন হয়নি তার পক্ষে কি কোনও রাজনৈতিক দল স্বতস্ফূর্তভাবে মিছিল করে? এক মৃত্যু দিয়েই হয়তো ধর্ষণের বিচার পাওয়া সম্ভব, তাও সব ক্ষেত্রে নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রগুলোতে ক্ষমতা বা রাজনীতির কোনও যোগ আছে।

তাপসী হতদরিদ্র একটা মেয়ে। তাকে যে কেউ ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারতে পারতো। এতে কার কী বলার আছে? যেরকম বলা হয়েছিল যে তাপসী কেরোসিনের একটা জার হাতে বাইরে গিয়েছিল ভোরবেলা, ওরকমই হত বলা, বলা হত গায়ে কেরোসিন ঢেলে সে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাপসীর আত্মীয়রাও তাই বিশ্বাস করতো, পাড়ার লোকেরাও। মানুষ এরকমই জানতো যে অভাবে অসুখে ভুগতে ভুগতে নিজের গায়ে নিজে আগুন দিয়ে মরেছে তাপসী, যেমন মরে দেশের শত শত তাপসী।

আজ তাপসীকে নিয়ে যে কাণ্ড হচ্ছে তাতে তাপসী নামের হতদরিদ্র মেয়েটি কিন্তু মূল্যবান কিছু নয়। কদিন পরে লোকে ভুলেও যাবে তাপসী কে ছিল কী ছিল। বিখ্যাত সেই পুরুষটির মতো কেউ কেউ হয়তো মনে রাখবে তাপসী দেখতে কুৎসিত ছিল, ওকে ধর্ষণের ইচ্ছেও জাগে না এমন কুৎসিত।

পুরুষদের প্রেম যেন জাগে, এমন সৌন্দর্য মেয়েদের ধারণ করা জরুরি। পুরুষদের ধর্ষনেচ্ছা যেন জাগে, পুরুষেরা চায়, এমন সৌন্দর্যও মেয়েদের যেন থাকে। না থাকলে রক্ষে নেই। মরে গেলেও শ্লেষ বিদ্রুপ থেকে রেহাই পাবে না কোনও মেয়ে। তাপসীও পাচ্ছে না। তাপসী সম্ভবত মরে বেঁচেছে। অন্তত মরেছে বলে কারও যদি তার জন্য করুণা হয়! না মরে কেবল ধর্ষিতা হলে লোকে বলতো, ধর্ষক-দেবুকে তাপসীই ইন্ধন জুগিয়েছিল ধর্ষণ করতে। প্রাতঃক্রিয়া করতে বসেছিল বলেই তো দেবু উত্তেজিত হয়েছে। তাপসী সেটা না করলেই তো তাকে ধর্ষিতা হতে হয় না!

হতদরিদ্র মেয়ের ধর্ষিতা হলেই কী, না হলেই কী! তারা তো প্রতিদিনই কোনও-না-কোনওভাবে ধর্ষিতা হচ্ছে, প্রতিদিনই নিহত হচ্ছে বৈষম্য-লালন করা সমাজের নানা নিয়মে। ধর্ষিতা না হলে, তাকে জ্যান্ত না পোড়ানো হলে কী এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যত ছিল তার সামনে? হয়তো দেবু মালিকের মতোই কারও সঙ্গে তার বিয়ে হত, অমানুষিক অত্যাচার সইতে হত জীবনভর। অথবা তাকে বিক্রি করে দেওয়া হত, নারী পাচারের শিকার হত, কোনও বেশ্যালয়ের অন্ধকার খুপড়িতে বাকি জীবন পার করতে হত তার। এ ছাড়া আছে কী গ্রামের অসহায় দরিদ্র একটি মেয়ের ভাগ্যে? এই পশ্চিমবঙ্গেই তো পাচারের শিকার মেয়েরা এমনভাবে হচ্ছে যে অনেক গ্রামেই আর মেয়ে নেই। চাকরি বা বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে গ্রাম উজাড় করে মেয়েদের ধরে ধরে দেশের নানা বেশ্যালয়ে নিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। ওখানে তো প্রতিদিনই মেয়েদের ধর্ষিতা হতে হয়, জ্যান্ত পুড়ে মরার চেয়ে কিছু কম যন্ত্রণা মেয়েরা ভোগ করে!

বিশ্বের যে কোনও দেশের চেয়ে ভারতের কিশোরীরা আত্মহত্যা করে বেশি। কিশোরীরা এই যে এত আত্মহত্যা করে, তার পেছনের কারণগুলো কেউ তলিয়ে দেখেছে? কেন তাদের আত্মহত্যা করতে হয়? জীবনের শুরুতেই মরতে হয় কেন?

বিপুল পরিমাণে বাড়তে থাকা কিশোরী-আত্মহত্যার কটি সত্যিকার আত্মহত্যা, কটি হত্যা, তা-ই বা ক'জন জানে, বা জানতে চেষ্টা করে!

কেবল রাজনীতির যোগ থাকলেই যদি ধর্ষকের বিচার হয়, তবে ধর্ষণের বিরুদ্ধে সেটি কোনও বিচার নয়, সেটি কাউকে রাজনীতির সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার জন্য অথবা কাউকে অসুবিধেয় ফেলার জন্য বিচার। সেই বিচারকেই সত্যিকার বিচার বলে মনে করবো, যে বিচার রাজনীতির লোক বা বিত্তশালী বা ক্ষমতাবানদের চাপে হয় না। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হয়। হতদরিদ্র মেয়ের ধর্ষক যদি ধনী হয়, তারও সেই একই শাস্তি হয়, যে শাস্তি ধনী-মেয়ের দরিদ্র-ধর্ষকের হয়।

আত্মঘাতী নারী!

এই কলামে মেয়েদের অধিকার এবং স্বাধীনতা বিষয়ে দীর্ঘদিন হল লিখছি। পাঠকের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলাম একদিন, পত্রিকা অফিস থেকে জানিয়ে দেওয়া হল আমার লেখার সবচেয়ে বেশি নিন্দা করছে মেয়েরা। 'যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর।' নাহ, আমার জন্য এই দুঃসংবাদটিও নতুন কিছু নয়।

আমাকে অনেকে বলেছে, 'মেয়েদের দোষের কথা কিছু লেখো তো।' সবচেয়ে মজার কথা, মেয়েরাই বলেছে।

'মেয়েদের আবার দোষ কী?' আমি বলি।

'ওদের কোনও দোষ দেখ না?' চোখ কপালে তুলে মেয়েরা বলে।

'ভিকটিমদের আবার দোষ কী!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি।

ভিকটিমদের দোষ না লিখলে আমার উপায় নেই। পুরুষরাও বলছে, মেয়েদের দোষের কথা লিখতে। মেয়েরাও বলছে। কিছুদিন আগে নবনীতা দেবসেনএর সমালোচনা করে আমি যে লেখাটা লিখেছি, সেটির জন্য নারী ও পুরুষ উভয় পক্ষ থেকেই যত বাহবা আমি পেয়েছি, অন্য কোনও লেখার জন্য তত পাইনি। যারা মেয়েদের দোষের কথা আমি লিখি, চায়, সেই নারী এবং পুরুষের মধ্যে আমি কোনও তফাৎ করতে পারি না। তাদের ভাষা একই রকম, একই রকম ইঙ্গিত। নারী যখন পুরুষের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং পুরুষতন্ত্রের সমর্থক এবং সহায়কের ভূমিকায় সক্রিয়, তখন নারী আর পুরুষকে আলাদা করে চেনা যায় না। পুরুষতন্ত্র মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, নারীর এত সহায়তা না পেলে, এত সহযোগিতা আর সাহায্য না পেলে শুধু পুরুষের ষড়যন্ত্রে এবং চক্রান্তে, শুধু পুরুষের বুদ্ধিতে ও শক্তিতে টিকে থাকতে পারতো না।

বউ শাশুড়ির ঝগড়ার কথা ভারতীয় উপমহাদেশেই শুনি। যে সমাজে শ্বশুরবাড়িতে মেয়েরা থাকে না, এবং মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর, এবং লিঙ্গবৈষম্যের শিকার নয়, সেখানে বউ শাশুড়ির মধ্যে তো কোনও ঝগড়া হয় না!

ঝগড়ার পেছনে পরনির্ভরতা এবং পিতৃতন্ত্রের একটা বড় ভূমিকা আছে। এখানকার সংস্কৃতিটা হল বিয়ে হওয়ামাত্র স্বামীর সঙ্গে স্বামীর বাড়িতে বা শ্বশুরবাড়িতে জীবন যাপন করতে হবে মেয়েদের। শ্বশুরবাড়িতে, শ্বশুর তো বটেই, শাশুড়িও, যেহেতু তারা স্বামীর আত্মীয়, স্বামীর প্রতিনিধি। পুরুষের প্রতিনিধিত্ব যে

করে, মোষ হোক, মুষিক হোক, সমান জোর। পিতৃতন্ত্রকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পুত্র যদি অপারগ হয়, তবে পুত্রের হয়ে পুত্রের মা-ই তা সাধন করে। বউ হচ্ছে আপাতত দাসী। শুরুটা করতে হয় দাসত্ব দিয়ে। দাসত্ব যদি নির্ভুলভাবে করে যেতে পারে, তবেই হবে তার প্রতিনিধিত্বে উত্তরণ। কোনও কোনও সংসারে পুরুষেরা নিজের মায়ের বদলে স্ত্রীকে নিজের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, সেখানে কিন্তু শাশুড়ির হাল মোটেও সুবিধের নয়। ঝগড়াটা মূলত পুরুষটায় আমার অংশ বেশি তোমার অংশ কম, এ নিয়ে। যে সমাজে লিঙ্গবৈষম্য নেই, সে সমাজে পুরুষ নিয়ে কাড়াকাড়িটা হয় না। কারণ পুরুষ যে মূল্য ধরে, নারীও একই মূল্য ধরে। পরনির্ভর মেয়েদের লড়াই করতে হয়, যার ওপর নির্ভরশীলতা, তার মনোরঞ্জন করে খানিকটা অনুকম্পা বেশি পাওয়ার জন্য। এ অনেকটা বেঁচে থাকার লড়াই।

ভাই ভাইয়ের হিংসা, শ্বশুর জামাইয়ের ঝগড়া, ভায়রা ভাইদের দ্বন্দ্ব, কাকা ভাইপোর মারামারি, স্বামী প্রেমিকের তাণ্ডব — তুমুল হলেও এগুলো নিয়ে নিন্দা করার লোক নেই। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি হলেই ছিছিক্কার। যেন মেয়েদের হতে হবে এই জগতের বাইরের কিছু। মেয়েদের আমরা পাকে ফেলবো, পঙ্কে ডোবাবো, কিন্তু থাকতে হবে তাদের পূত পবিত্র। বলিহারি আহ্লাদ।

মেয়েদের হাই প্রোফাইল ঝগড়াটা (বউ শাশুড়ি) একধরনের প্রফেশানাল জেলাসি। পরনির্ভরতা যাদের প্রফেশন, তাদের তো ও করেই খেতে হয়। মেয়েদের পরনির্ভর প্রফেশনিটা কার চাপে হচ্ছে? পিতৃতন্ত্রের চাপে। পিতৃতন্ত্রের কাঠামোটা কাদের তৈরি? পুরুষদের! শুধু তাই নয়, বউ শাশুড়ির ঝগড়ার মূলেও ওই একই জিনিস, পুরুষ। জেলাসি বা ঈর্ষাটা যদি থাকতেই হয়, তবে কর্মক্ষেত্রে স্বনির্ভর মেয়েদের একে অপরকে ডিঙিয়ে ওপরে ওঠার প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকুক। সে ক্ষেত্রে পুরুষকে ডিঙিয়ে ওপরে ওঠার প্রতিযোগিতা এবং এই নিয়ে ঈর্ষা হলে তো কথাই নেই।

স্বনির্ভর না হলে, পুরুষের সমকক্ষ না হলে, পুরুষের নিচে অবস্থানকারীদের সঙ্গে মেয়েদের বচসা বেশি হয়। আর এ সমাজে পুরুষের নিচে অবস্থান সাধারণত মেয়েরাই করে, আর সে কারণে দেখা যায়, মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদেরই ঠোকর লাগছে বেশি। যে মেয়েরা পিতৃতন্ত্রের ধারকবাহক আর যারা পিতৃতন্ত্রের নিন্দুক, তাদের মধ্যে যুদ্ধ চলছে নিরন্তর। এই ঝগড়া, এই দ্বন্দ্ব এই মারামারি সত্যিকার অর্থে নারীতে নারীতে নয়, পুরুষে এবং নারীতে। একদল নারী নারীর অধিকারের বিরুদ্ধে, আরেক দল অধিকারের পক্ষে। একদল পুরুষের পক্ষে, আরেক দল নারীর পক্ষে।

'মেয়েরা মেয়েদের শত্রু', এই বাক্যটি পুরুষের তৈরি, এবং একে জনপ্রিয় করার পেছনে পুরুষের আছে বিরাট অবদান। পুরুষ কি পুরুষের শত্রু নয়? হিসেব যদি হয় কে কার শত্রু বেশি, মেয়েরা মেয়েদের যত, তার চেয়ে শতগুণ পুরুষেরা পুরুষদের।

এক মেয়ে যখন আরেক মেয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলে, পুরুষেরা খুশি হয়। সেই মেয়েটিকে খুব বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমতী বলে মনে করে। কোনও মেয়ের স্বল্প পোশাক, তার ছেলেবন্ধু, তার পুরুষগমন ইত্যাদি নিয়ে নিন্দা যখন মেয়েরা করে, পুরুষেরা

আনন্দ পায়। কারণ এ তাদেরই কথা, মেয়েদের মুখ দিয়ে বলতে শোনে এই যা। মেয়েগুলো তাদেরই মানসিকতা নিয়ে বড় হতে থাকা, তাদেরই কপি। কিন্তু ফিমেইল কপি। ফিমেইল বলে আনন্দ বেশি হয়। অন্য কোনও পুরুষ যদি মেয়ের নিন্দা করে, তাতে আনন্দ এত বেশি হয় না। ফিমেইল বলে যে আনন্দ, সেটা অনেকটা যৌনানন্দের মতো।

'বাড়ির পরিচারিকারা পুরুষের চেয়ে নারী দ্বারা অত্যাচারিত হয় বেশি' — বেশ জনপ্রিয় একটি অভিযোগ, পুরুষেরা যখন অত্যাচার করে পরিচারিকাদের, তা নিয়ে তত কথা হয় না, নারী হলেই ছি ছি ছ্যাঁ ছ্যাঁ। নারী তো নিয়ন্ত্রিত। নারীর নিয়ন্ত্রণ করার বেশি কিছু নেই। তাই তার নিচে যে আছে, যে পরিচারিকা তাকেই সে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এতে পরিতৃপ্তি কিছুটা হলেও পায়। কিছুটা হলেও তার উচ্চতাকে সে অনুভব করতে পারে। পরিচারিকার জায়গায় পরিচারক হলেও ওই একই ব্যাপার ঘটে। স্বামীর ধর্ষনেচ্ছা যদি পরিচারিকাকে দেখে জাগে, তবে স্ত্রী পরিচারিকাকেই অত্যাচার করে, স্বামীকে নয়। এখানেও সবলকে না পিটিয়ে দুর্বলকে পিটিয়ে যন্ত্রণা লাঘব করতে হয় নারীদের। সবলকে পেটানোর শক্তি এখনও তারা অর্জন করেনি।

নারীকে লজ্জাবতী মায়াবতী, করুণাময়ী স্নেহময়ী ইত্যাদি বিশেষণ এতকাল ধরে এত দেওয়া হচ্ছে যে, লোকে ভুলে যায় নারী রক্তমাংসের মানুষ, পুরুষের মতো অত যুদ্ধবাজ, হিংসুক, প্রতিশোধপরায়ণ, সংকীর্ণমনা, বদ, বদমাশ, নিষ্ঠুর, নির্মম, ভয়ংকর, হিংস্র, নীচ, অশ্লীল, কুটিল না হতে পারলেও নারী কিছুটা তো হতে পারে। নারী তো মানুষ! পুরুষের সঙ্গে এতকাল থেকে কিছুই কি শেখেনি! বাসে যেভাবে দুটাকার পকেটমারকে পুরুষেরা পিটিয়ে লাশ বানায়, তেমন ভাবে নারীরা পেটাতে না পারলেও, একেবারেই যে কাউকে পারেনা পেটাতে, তা ভাবার কোনও কারণ নেই।

নারীর নিষ্ঠুরতা দেখে কেন লোকে শংকিত হয়! যেহেতু নারীর কাছ থেকে আশা করা হয় যা প্রচার হয় তা, যে, নারী মাত্রই মমতাময়ী! যেহেতু এই ধারণা মস্তিষ্কে গাঁথা, তাই নিষ্ঠুরতা আগাগোড়া অপ্রত্যাশিত। তাই পুরুষের নিষ্ঠুরতা সইতে পারলেও নারীর নিষ্ঠুরতা অসম্ভব সওয়া!

নারীর স্বাধীনতা এবং সমানাধিকারের জন্য যে সংগ্রাম, তা একটি আদর্শের জন্য সংগ্রাম। এই আদর্শে নারী বিশ্বাসী হতে পারে, পুরুষেরা অবিশ্বাসী হতে পারে। আবার এর উল্টোও হয়। নারী এই আদর্শে বিশ্বাস একেবারেই করে না, কিন্তু পুরুষেরা করে। (পুরুষেরা যারা নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, তাদের সংখ্যাটা নিতান্তই কম, বিশ্বাসী হলেও স্বাধীনতার সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুকের সংখ্যা আরও কম।) বিষয়টি নারী সম্পর্কিত হলেও এ কখনই লিঙ্গের ব্যাপার নয়, এ আদর্শের ব্যাপার। সুতরাং আমার নারী-অধিকার বিষয়ক লেখাগুলো যদি সব নারীর পছন্দ না হয়, তবে তো বিস্ময়ের কিছু নেই। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এত আহম্মক নয় যে

সব নারীকে নারীর স্বাধীনতা বিষয়ে সচেতন করে তুলবে এবং তাদের স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করা মাত্র নারীরা হাত তুলে সমর্থন জানাবে। পরাধীন হয়ে থাকতে থাকতে বেশির ভাগ নারীই পরাধীনতাকে আশ্রয় বলে মনে করে, পরাধীনতার লোহার দেওয়ালের ফুটো গলে যে আলোটুকু আসে, ওটুকুই রোদ্দুর তাদের, ওটুকুই স্বাধীনতা। ওটুকুতেই তৃপ্ত তারা।

আমি মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলি, এটা অনেক মেয়ের কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। অনেকসময় মেয়েদের স্বাধীনতা বিষয়ে আমি যা বলি, তা মেয়েরা যত বোঝে, তার চেয়ে বেশি পুরুষেরা বোঝে। বোঝে, কারণ, স্বাধীনতা ভোগ করে পুরুষ অভ্যস্ত, স্বাধীনতার অর্থ তারা তাই জানে। পুরুষেরা আমার লেখার বিরুদ্ধে বলে, কারণ তারা ঠিক জানে আমি কী বলতে চাইছি। নারীরা আমার লেখার বিরুদ্ধাচরণ করে, করে, কারণ তারা ঠিক জানে না আমি কী বলতে চাইছি। দুজনের বিরোধীতার ভাষাটা এক, কারণটা ভিন্ন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী ভিকটিম। এ কথা যেমন ঠিক, নারী আত্মঘাতী এটাও ঠিক। আজ যদি নারীরা নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হতো, আত্মপরিচয়ের সংকটমোচনে নিজেরা বিচ্ছিন্ন না থেকে সংগঠিত হতো, নারীর সঙ্গে নারীর যোগাযোগ যদি আরও বেশি হত, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা যদি বাড়তো, যদি তারা আন্তরিকভাবে পরস্পরের হাতে সহযোগিতার হাত রাখতো, নারীর ক্ষমতায়নে এক নারী আরেক নারীর পাশে দাঁড়াতো, তবে চিড় ধরতো অথবা চুর চুর করে ভেঙে পড়তো পুরুষতন্ত্র। বাসযোগ্য হত জগৎ।

‘অনুরণন’ এবং ‘বং কানেকশান’ নামের দুই অত্যাধুনিক ছবিতে

পুরুষের স্ত্রী বা প্রেমিকা হওয়া ছাড়া মেয়েদের আর কোনও ভূমিকা নেই

দুটো বাংলা ছবি নিয়ে হৈ চৈ শহরে। চারদিকে বিজ্ঞাপন। লেখালেখি। পরিচালক এবং অভিনেতাদের সাক্ষাৎকার। বাংলা ছবিতে প্রচুর ইংরেজি সংলাপ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে ছবিগুলো শিক্ষিত এবং সচেতন শ্রেণীর জন্য, আধুনিক মনের মানুষদের, এবং নতুন প্রজন্মের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ছেলেমেয়েদের, যারা এক বাক্য বাংলা বললে পাঁচ বাক্য ইংরেজি বলে। উচ্চবিত্ত হলে অবশ্য বাংলা উচ্চারণ খুব বিচ্ছিরি রকম হওয়া চাই। অস্বীকার করার উপায় নেই নাগরিক নবীন নবীনাদের চাল চলন চেহারা এমনই। অনুরণনে রাহুল আর অমিতের তাই হয়েছে। রাহুল আর অমিত, অনুরণনের দুটো পুরুষই যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত, একজন স্থপতি, আরেকজন ব্যবসায়ী। আর তাদের বউ, ভীষণ স্মার্ট, শিক্ষিত। কী করছে? না, ‘হাউজওয়াইফ’। পরনির্ভর। কাজ বলতে সেজেগুজে থাকা, সুন্দর সুন্দর পোশাক পরা, স্বামীর সঙ্গী হওয়া, আর ফালতু ঘুরে বেড়ানো।

অনুরণনে এক পুরুষের সঙ্গে আরেক পুরুষের স্ত্রীর একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পুরুষটি রাহুল, আরেক পুরুষের স্ত্রীটি প্রীতি। প্রীতির জীবনটা এমন, স্বামীর প্রেম তো পাওয়াই হয় না, এমনকী শরীরের সাধ মেটানোর জন্যও স্বামীকে মেলে না। স্বামী দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে মেয়ে আরেক পুরুষের পানে ধায়। মেয়ের চোখের চাহনিতে আর মুখের হাসিতে সেই পুরুষের জন্য খেলা করে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়। খুব স্বাভাবিক, কারণ স্বামী তাকে মানসিক শারীরিক কোনও সুখই দিতে পারে না। স্বামীর সঙ্গে নয়, স্বামীর বন্ধুটির সঙ্গে অর্থাৎ রাহুলের সঙ্গে তার মনে মেলে। দুজনের মধ্যে কমন গ্রাউন্ডের পাহাড়। আবার রাহুলও সদ্য পাহাড়ে, দূরের সেই পাহাড়ে বন্ধুটির কাছে দিব্যি সে চলে যায়। এখানে ভাবার কোনও কারণ নেই যে সম্পর্কটি প্রেমে পরিণতি লাভ করবে না। পুরুষটি স্পর্শ করলেই মেয়েটি এলিয়ে পড়বে, এরকমই মুহূর্ত সৃষ্টি করা হয়েছে। দুর্বল চিত্রনাট্যের নিয়মই এই, বারবার চমক দেওয়ার চেষ্টা, দ্যাখো দ্যাখো, আই লাভ ইউ বলবে বলবে মনে হচ্ছে, কিন্তু বলছে না। শোবে শোবে, কিন্তু শুচ্ছে না। রাতে দুজন যার যার ঘরের দিকে যখন যাচ্ছে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে

মেয়ে পিপাসার্ত চোখে তাকিয়ে থাকে, এই বুঝি দুজন দু ঘরে না গিয়ে এক ঘরে ঢুকবে। না, তাও হল না। সেই রাতে না হোক, অন্য রাতে হবে, তার তো অমিত সম্ভাবনা রয়ে গেল। রাহুল যখন তার আদরের স্ত্রী নন্দিতাকে, যাকে সে কারণে অকারণে ফোন করে কলকাতায়, ফোনে জানাচ্ছে না যে অমিতের স্ত্রী প্রীতি পাহাড়ে তার কাছে গেছে, প্রীতিও যাওয়ার আগে, বা যাওয়ার পথে এবং পৌঁছেও জানাচ্ছে না নন্দিতাকে যে সে রাহুলের কাছে যাচ্ছে, তখন নিশ্চিতই রাহুল আর প্রীতির মধ্যে সম্পর্কটা সাদামাটা বন্ধুত্বের নয়। এবং কানাঘুষো যা হয়েছে, ঘেন্না যা পেয়েছে প্রীতি, কিছুই অপ্রত্যাশিত নয়। অন্য নারীর সঙ্গে বিবাহিত পুরুষের প্রেম বা যৌন সম্পর্ক হয়ে যাওয়ার পর পুরুষেরা ভারতীয় সিনেমায় স্ত্রীর ক্ষমা পেয়ে আসছে সে নতুন নয়, স্ত্রীরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে পুরো ব্যাপারটাকেই দেখে এবং স্বামীদের পরম আদরে বুকে তুলে নেয়। (অনুরণনে বুকে তুলে নেওয়ার ব্যাপারটি একটু অন্য ভাবে ঘটে, স্বামী যেহেতু বেঁচে নেই, স্বামীর বান্ধবী বা হতে যাওয়া প্রেমিকা প্রীতিকে বুকে তুলে নিয়ে স্বামীকে বুকে তুলে নেওয়ার কাজটিই পরোক্ষভাবে করে নন্দিতা।) অনেককাল ধরে দেখানো হচ্ছে এমন গল্প। মোদ্দা কথা, এই সমাজের পুরুষদের পলিগ্যামি অ্যাকসেপ্ট করার জন্য একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছাড়া এসব আর কিছু নয়। এর আগে ঋতুপর্ণ ঘোষের দোসর হয়েছে। আজকাল একটু টাফ হয়েছে অ্যাকসেপ্ট করা, তাই একজনকে মরতে হয়। দোসরে মেয়ে মরে, অনুরণনে ছেলে। কেউ মরলে দর্শকদের সহানুভূতি হু হু করে বেড়ে যায় বলে পরকীয়াকে সামাল দিতে সুবিধে হয়। আজকাল আধুনিকতা বোঝানো হচ্ছে, এই দেখিয়ে, যে, মেয়েরা স্বামীদের ক্ষমা করে বুকে তুলে নেওয়ার আগে একটু অভিমান করে বা একটু রাগ দেখায়। ক্ষমা করে দেওয়া ছাড়া পরনির্ভর নারীদের আর উপায়ই বা কী! পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত প্রেম এবং যৌনতাকে আরও গভীর করে মেনে নেওয়ার মন তৈরি করার জন্য আজকাল পুরুষ-পরিচালকরা অঢেল টাকা এবং বুদ্ধি খরচ করে হৃদয় ঢেলে চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন এবং সকলের বাহবা কুড়োচ্ছেন।

অনুরণনের তুলনায় বং কানেকশনএর গল্পের প্রেক্ষাপট ভালো। কিন্তু অতি অবাস্তবতা, অতি গল্প ছবিটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। বং কানেকশনে ওই একই ব্যাপার। অপু আর অ্যান্ডি দুই প্রধান পুরুষ-চরিত্র, একজন কমপিউটার সায়েন্স বা ইনফরমেশন টেকনোলজিতে নিজের কেরিয়ার গড়তে চাকরি নিয়ে বিদেশ যায়, এবং ওখানে বার বারই দেখা যায় যে সে অফিসের কাজে ব্যস্ত, আরেকজন বিদেশ থেকে দেশে আসে, মিউজিক নিয়ে প্যাশোনেটলি কাজ করতে সে ব্যস্ত। আর দুটো প্রধান নারীচরিত্রের জব কী? পুরুষের প্রেমিকা অথবা বান্ধবী হওয়া। কাজের ফাঁকে পুরুষদের যখন অবসর জোটে, তখন তারা পুরুষদের সঙ্গ দেয়, অনাবিল ভালো লাগা দেয়। এই দুই প্রধান নারীচরিত্র কিন্তু ইয়ং, ফাটাফাটি, হাল ফ্যাশনের পোশাক, চোস্ত ইংরেজি। কিন্তু তাদের পরিচয় একটাই, ভূমিকা একটাই, পুরুষের প্রেমিকা তারা। পুরুষ দেশ ও দশের গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে যারপরনাই ব্যস্ত, এবং মেয়েরা পুরুষের প্রেম পেতে ব্যস্ত, এবং পুরুষনির্ভর লতা হওয়ার জন্য নিজেদের তৈরি করতে ব্যস্ত।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে পুরুষ এবং নারীর ভূমিকা বরাবরই এমন। কিন্তু নতুন যুগের, নতুন সময়ের, আধুনিকতার কথা বড় গলায় বলে যখন চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়, তখন প্রত্যাশা থাকে যে সাহসী সংগ্রামী স্বনির্ভর এবং সচেতন মেয়েদের বুঝি আধুনিক হিসেবে দেখানো হবে। কিন্তু কোথায়? পুরোনো পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের ছবি যখন বলে কয়েই বানানো হয়, ওসব তত ভয়ংকর নয়, যত ভয়ংকর আধুনিকতার ঘোষণা দিয়ে আধুনিক হিসেবে খ্যাত পরিচালকদের আধুনিকতার মোড়কে বানানো প্রাচীনপন্থী ছবি। এরা আধুনিকতার সঠিক সংজ্ঞা পাল্টাতে বেশ বিপ্লব করছেন বটে।

আধুনিকতা মানে এখন এই সমাজে শুধু বহির্বাস, শুধু বুলি। যতই আধুনিকতার কথা বলা হোক না কেন, আধুনিকতার ছিটে ফোঁটা এসব ছবিতে নেই। তরুণ তরুণীর ফ্যাশনেবল জীবনযাপন দেখিয়ে মানসিকতা রাখা হয় সেই পুরোনো। আধুনিকতা তো পোশাকে থাকে না, বড় বড় বুলিতেও থাকে না। থাকে মননে, মস্তিষ্কে, মানসিকতায়। থাকে বোধে, বিবেকে, বৈদগ্ধে। বং কানেকশনের অন্যান্য মেয়েরা বাড়ির রান্নাবান্না, পরিবেশন, এবং পুরুষদের সেবায় দিনরাত্তির ব্যস্ত। নবীনারাও সেই পথে নিজেদের গোছাচ্ছে না কি? বা তাদের দিয়ে গোছানো হচ্ছে না কি?

অসমকামী নারী পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ খুব স্বাভাবিক। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব, প্রেম, আত্মীয়তা গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে যদি তা গড়তে হয়, তবে সেই সম্পর্ক কখনও সুস্থ সম্পর্ক নয়। সুস্থ সম্পর্ক সেই সম্পর্ক যে সম্পর্কে মানুষ হিসেবে একজন বেশি মূল্যবান, এবং আরেকজন কম মূল্যবান নয়। সুস্থ সম্পর্ক সেই সম্পর্ক যে সম্পর্কে কারও অধিকার বেশি, কারও অধিকার কম নয়। এবং অর্থনৈতিক নির্ভরতা কারওর ওপর কারওর নেই। থাকলেই একজন ওপরে, আরেকজন নিচে। থাকলেই একজন পাওয়ারফুল, আরেকজন পাওয়ারলেস। থাকলেই অসন্তোষ এবং আপোস।

আমাদের শিল্প সাহিত্য পুরুষতন্ত্রকে তোল্লাই দিয়ে যাচ্ছে চিরকালই। আর কতকাল নারীর অধিকারকে দাবিয়ে রেখে, তাদের পণ্য বানিয়ে শিল্পী সাহিত্যিকরা নিজেদের আধুনিক দাবি করবে! মূর্খামির তো শেষ হয়। কেবল এই উপমহাদেশেই বোধহয় এসব মহাসমারোহে রাজত্ব করে যায়।

মানুষ আর মানুষ নেই

খবরটা এরকম, 'অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ভাত বেড়ে দিয়েছিল। খেতে বসে স্বামী দেখলো, ভাতে একটা চুল। খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লো স্বামী আকের শেখ। স্ত্রী জ্যোৎস্নাবিবিকে চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দিল।' মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে ঘটেছে ঘটনাটা। শুনে আমার কিছু চেনা লোক বললো, 'মুসলমানরা মানুষ না। এরাই পারে এসব জঘন্য কাজ করতে।' তাকে আমি আর তাপসী মালিকের ঘটনা স্মরণ না করিয়ে বরং সেদিনেরই আরেকটা খবর বললাম, 'প্রেমিকা সুমনা বসু কথা শোনেনি, তাই তার গলায় ক্ষুর চালিয়েছে প্রেমিক অভিষেক চৌধুরী।' চেনা সেই লোকদের আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম, 'হিন্দু মুসলমানের ব্যাপার নয় এগুলো। এগুলো লিঙ্গবৈষম্যের ব্যাপার। নারীকে পুরুষের দাসী এবং যৌনবস্তু ভাবার যে মানসিকতা, সেই মানসিকতার ব্যাপার। সব ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যেই নারীকে অপদস্থ করা, অবহেলা করা, এবং অপমান করার সবরকম পরিবেশ আছে।'

চেনা লোকগুলো চলে গেল। আমার কথার তারা কতটুকু বুঝলো কী বুঝলো জানি না। যদি বাসটিতে ওরা থাকতো, আমার বিশ্বাস, ওরাও আর সবার মতোই আচরণ করতো, নীরবে দেখতো সব, কিছু বলতো না। সেই বাসটির কথা বলছি, যে বাসে একটি মেয়েকে যৌন হেনস্থা করছিল দুটো ছেলে, দেখেও বাসের কেউই প্রতিবাদ করেনি, শুধু জগন্নাথ আর শুভেন্দু নামের দুজন প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলে দুটো ছেলের সঙ্গে বাসের চারটে ছেলে যোগ দিয়ে জগন্নাথদের বীভৎস ভাবে মারছিল। মার যখন খাচ্ছে, বাসের সবাই চুপ করে বসে ছিল। প্রতিবাদ করেনি। এমনকী তখনও প্রতিবাদ করেনি যখন চোখের সামনে দেখলো যে ছটি ছেলেকে বাস থেকে জোর করে নামিয়ে দেওয়া হল এবং ভালো করেই বুঝলো যে নামিয়ে দিলে খারাপ ছেলেগুলো ভালোগুলোকে আরও নির্বিঘ্নে মারতে পারবে, এমনকী প্রাণেও মেরে ফেলতে পারে।

যৌন হেনস্থাকে এই ভারতীয় উপমহাদেশেই 'ইভ টিজিং' বলা হয়। সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বা যৌন হেনস্থার মতো ভয়াবহ কুৎসিত জিনিসকে 'ইভ টিজিং' আখ্যা দিয়ে একে রোমান্টিসাইজ করার পেছনের কারণটি কি এর ভয়াবহতা কায়দা করে কমিয়ে দেওয়া নয়? রোমান্টিক জুটি আদম-ইভএর ইভকে তুলে এনে তার সঙ্গে টিজ

বা খুনসুটি করাকে খুব মন্দ কিছু মনে হওয়ার কোনও কারণ নেই, বরং শুনলে যে কারও মনে হবে দারুন রোমান্টিক। রোমান্টিক বলেই তো ভারতীয় চলচ্চিত্রে নায়িকার পেছনে লাগা, শিস দেওয়া, চোখ টেপা, বিরক্ত করা পুরুষগুলোকে রীতিমত হিরো হিসেবে দেখানো হয়, এবং নায়িকার সঙ্গে দিব্যি তাদের প্রেমও হয়ে যায় আর অচিরে দুজন হাত পা ছুড়ে নাচতে শুরু করে আর কোটি কোটি ভারতীয় দর্শকের হৃদয়ে অনাবিল শান্তির বর্ষণ শুরু হয়। এই ভারতবর্ষে যৌন হেনস্থা কী কারণে অপরাধ বলে বিবেচিত হবে, শুনি? যে ছেলেরা যৌন হেনস্থা করছে, তারা তো একে 'স্বাভাবিক' জেনেই করছে, বাসভর্তি লোকেরা যখন প্রতিবাদ করে না, বরং দুচারজন এগিয়ে আসে যৌন হেনস্থাকারীর পাশে, তখন তো আরও তারা নিশ্চিত হয় যে, কাজটা তারা ভালো বই মন্দ করছে না। মুখ বুজে বসে থাকা যে একধরনের সমর্থন, তা যেমন হেনস্থাকারীরা জানে, তেমন মুখ বোজাগুলোও জানে।

ভদ্রলোকেরা বেশ অবাক বনছেন, বাসের কেউ কেন প্রতিবাদ করেনি! আমার বিশ্বাস প্রতিবাদ ওই বাসের পুরুষেরা করেনি, কারণ ছেলে দুটো ওই একলা মেয়েটিকে যখন হেনস্থা করছিল, ওরা খুব উপভোগ করছিল। উপভোগ করছিল বলে প্রতিবাদ করা হয়ে ওঠেনি। আর যে নারীরা প্রতিবাদ করেনি, তারা, খুব স্বাভাবিক যে নিজেরা হেনস্থা হওয়ার ভয়ে করেনি। এবং তারা হেনস্থা হলে বাসের ভেতর থেকে যে কোনও প্রতিবাদ হবে না, এ অনুমান করতে নিশ্চয়ই তাদের কোনও অসুবিধে হয়নি।

হেনস্থার প্রতিবাদ যে করে, সে নির্বিবাদে মার খায়। তার মার খাওয়ার বিরুদ্ধেও কেউ কিছু বলে না। 'সাহস হয় না' তা আমি মানি না। দেশের লোক নানা কাজে 'সাহস' দেখাচ্ছে। দেদারসে দুর্নীতি করছে, সাহস হচ্ছে না? সোনাগাছিতে লাইন দিচ্ছে? সাহস না থাকলে দিতে পারে? পরস্ত্রীর ওপর মারের ভয় না করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, সাহস নেই কে বলে? বাচ্চা মেয়েকে ফুসলিয়ে যৌন নির্যাতন করতে যে সাহসের দরকার হয়, সেটি তো আছে। আইনের চোখে অপরাধ জেনেও এই যে গৃহনিগ্রহ, নারী পাচার, গণধর্ষণ, শিশুধর্ষণ, যৌন হেনস্থা দিনের পর দিন করে যাচ্ছে পুরুষেরা, তা কি সাহস ছাড়া আপনাতেই হয়ে যাচ্ছে নাকি? এই পশ্চিমবঙ্গে নারীনিগ্রহের হার অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশি। আর বাসে বসা প্রতিবাদ না করা লোকগুলোকে কী কারণে ভাবা হচ্ছে যে তারা বউ পেটায় না, যৌন নির্যাতন করে না, নারী পাচারের সঙ্গে যুক্ত নেই এবং যৌন হেনস্থাকে তারা অপরাধ বলে মনে করে? আমার তো বিশ্বাস তারা ওই দুটো ছেলের সঙ্গে তো মনে মনে যোগ দিয়েছেই, বাসের অপরিসর জায়গায় সংঘবদ্ধ যৌন হেনস্থা সম্ভব হয়নি বলে বরং মনঃক্ষুণ্ন হয়েছে, এবং স্থান সংকুলান হলে হেনস্থা তো সাধ মিটিয়ে করতে পারতোই, আর, গণধর্ষণের আয়োজন হলে হাসিমুখে অংশগ্রহণ করতে একেক জন হয়তো মরিয়াও হয়ে উঠতো।

'সাহস নেই, ভীরু, ভীতু', ইত্যাদি গালি দিয়ে বদমায়েশিকে আড়াল করা হয়। এইসব গালি অনেকটা মায়ের মুখের মধুমাখা আদরের মতো। 'উফ আমার ছেলেটা

কী যে ভীতু, ঘরে একা ঘুমোতে পারে না। আমার মেয়েটার তো সাহস বলতে কিছু নেই, রাস্তায় কিছুতেই একা বেরোতে চায় না।' বা বন্ধুর সস্নেহ শাসনের মতো, 'আবে স্লা, মালটা নিজে এসে ধরা দিল, আর তুই কি না টাচ অব্দি করলি না, ভীরু মাইরি।' এইসব বিশেষণ মধুর বিশেষণ। সুতরাং মুখ বুজে থাকা বাসের লোকদের এত আদুরে বকুনি যারা দিচ্ছে, তাদেরই বরং মুখ বুজে থাকা উচিত। বোঝা উচিত যে এটা মর‍্যালএর প্রশ্ন। এই মর‍্যালটাই সমাজের বেশির ভাগ মানুষের নেই, যে, পুরুষকে পুরুষ হওয়ার কারণে লাঞ্ছিত করা যেমন অন্যায়, মেয়েদেরও মেয়ে হওয়ার কারণে লাঞ্ছিত করা একই রকম অন্যায়। মানুষ জানেই না যে স্বাধীনতা যেমন পুরুষের জন্মগত অধিকার, স্বাধীনতা মেয়েদেরও তেমন জন্মগত অধিকার। মেয়েরা অসম্পূর্ণ নয়, সম্পূর্ণ মানুষ, এবং মানুষ হিসেবে যতটুকু শ্রদ্ধা পাওয়া উচিত, সবটুকুই তাদের প্রাপ্য। ফুর্তি করার উদ্দেশে মেয়েদের দিকে যৌনগন্ধময় শব্দ বা বাক্য ছুড়ে দেওয়ার, তাদের নিয়ে মজা করার, তাদের অপমান করার কোনও অধিকার কোনও বানচোত পুরুষের নেই।

এখন শিকারটিকে শিকার করার চেষ্টা হচ্ছে। শিকার বাস ফসকে পালিয়ে গেছে। চোঙ বাজিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছে, 'শিকার তুমি যেখানেই থাকো, বেরিয়ে এসো। পুলিশের কাছে দুষ্টুরা কী কী করেছে সব বলো। শিকার তুমি না দেখা দিলে, তোমার চাঁদমুখ সাধ মিটিয়ে দেখতে না পেলে বঙ্গবাসীর প্রাণ জুড়োবে না। তুমি দেখা না দিলে অন্য শিকাররাও দেখা দিতে শিখবে না গো। সভ্যতার বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।'

শিকার চোঙের শব্দ শুনছে না। বংশীবাদকের বংশীর সুর শিকারের কর্ণকুহরে পৌঁছোচ্ছে না। শিকার হাতে পেতে খোঁজ খোঁজ রব চাদ্দিকে। আদালতে দাঁড়িয়ে জলজ্যান্ত মেয়ে নিজের মুখে নিজের হেনস্থার পুংখানুপুংখ বর্ণনা দেবে, ভেবেই অনেকে উত্তেজিত। মেয়েটি যেন দয়া করে একবারটি তার ইতিমধ্যে হয়ে যাওয়া সেলেব্রিটি ফেসটি জনগণকে দেখায়।

কিন্তু মেয়ে কেন এসব আহ্বানে ভুলবে? যথেষ্ট কি হয়নি তার নিজেকে দেখানো সেদিন? সেদিন যখন বাসে বসে সে কাঁদছিল! তার কান্না, তার যন্ত্রণা, তার হাহাকার, তার অসহায়তা কারও কি বাকি ছিল দেখার? কেন সে নিজেকে, নিজের চেহারাকে দেখাবে বাইরে? বাসের বাইরের মানুষ কি বাসের ভেতরের মানুষের চেয়ে ভিন্ন কিছু? কে গ্যারেন্টি দেবে যে বাসের বাইরের মানুষ তাকে একইভাবে হেনস্থা করবে না? ওই ভ্রাম্যমান গণআদালতটি তো মেয়েটির দেখা হয়ে গেছে, যেখানে জুরিরা শুধু নীরব দর্শক হয়ে বসেছিলেন। তার কি আর কোনও আদালত দেখার দরকার আছে?

ভদ্রলোকেরা বলাবলি করছেন যে এই মেয়েটিও ঠিক সেই মেয়েটির মতো পালিয়ে গেল, যাকে বাঁচাতে গিয়ে পুলিশ সার্জেন্ট বাপি সেনকে খুন হতে হয়েছিল। অনেকে মেয়েদের দোষ দিয়ে বলছে যে মেয়েরা নাকি পালিয়ে বাঁচার শিক্ষা পেয়েছে। আসলে, এই মেয়েরা শিক্ষা পেয়েছে যে, যৌন হেনস্থার শিকার হলে এবং তা প্রকাশ করলে তাকে আরও বেশি যৌন হেনস্থার শিকার হতে হয়। হেনস্থাকারী পুরুষের

বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করলে আরও বেশি হেনস্থার আশংকা থাকে। শিখেছে মামলা করলে ঝামেলা নিজেরই হয়, অন্যের নয়। সত্যি বলতে, হেনস্থাকারীর সত্যিকারের কোনও শাস্তি হয় না। শিখেছে বাঁচানোর কথা যারা বলে, তারা আসলে বাঁচায় না। তারাই করুণার ঘায়ে সপাং সপাং করে মেরে জীবন রক্তাক্ত করে। যতই নিরাপত্তার কথা বলা হোক, মেয়েদের নিরাপত্তা কোথাও নেই। ধর্ম, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার কোথাও কোনও মেয়েরই একবিন্দু নিরাপত্তা নেই।

মেয়েরা খুব ভালো করেই জানে যে, একবার যদি লোকে জেনে যায় বাসের মেয়েটি কোন মেয়ে ছিল, সকলে হামলে পড়ে তাকে দেখবে। ধরা না পড়া অপরাধীরাও দ্বিতীয়বার তাদের যৌনবস্তুটিকে দেখে নেবে। পাড়ার যৌন হেনস্থাকারীরা তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলবে, 'ওই যে দেখ, ইভ টিজিংএর শিকার যায়।' চেনা অচেনা প্রত্যেকে মুখে অথবা মনে মনে বলবে, বলবেই, 'বাসে বা রাস্তায় তো আরও মেয়ে ছিল, ওসব মেয়েদের পেছনে তো ছেলেরা লাগলো না, ওর পেছনে লাগলো কেন? নিশ্চয়ই ওর দোষ ছিল কোনও!'

মেয়েটি হেনস্থা হওয়ার হেনস্থা থেকে বাঁচতে চায় বলে মুখ দেখাচ্ছে না। হেনস্থাকারীর দিকে জগন্নাথ আর শুভেন্দুর অমন মারমুখো এগিয়ে যাওয়ার বোকামো নিয়ে নিশ্চয়ই সে আফশোস করছে। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে যে এভাবেই ঘরে বাইরে, বাসে, ট্রেনে, অটোয়, মাঠে ঘাটে হাটে অপমান সয়ে বাকি জীবন পার করতে হবে তা সে জানে। কেবল 'অপমানিত হয়েছি' এ কথা রাষ্ট্র করে নিজেকে দ্বিতীয়বার অপমান করার সুযোগটি সে দিতে চায় না। ডবল ট্রিপল অপমান থেকে নিজেদের বাঁচানোটাই মেয়েদের অত্যন্ত যুক্তিবুদ্ধি খাটিয়ে নিজেদের বাঁচানো।

এত যে সাহসী বলা হয় আমাকে, এই আমিও যদি ওই মেয়েটির জায়গায় হতাম, এই অশিক্ষিত নারীবিদ্বেষী সমাজের লোককে আমিও জানাতাম না, যে, বাসের মেয়েটি আমি ছিলাম।

নামে অনেক কিছু আসে যায়

উঁচু পদগুলো পুরুষের জন্য তৈরি, তাই পদগুলোয় 'পতি'র বাড়াবাড়ি। ভূপতি, রাষ্ট্রপতি, সভাপতি, দলপতি। পত্নীদের তো ঘরবন্দি রাখা হত এবং হয়, পত্নীদের তো শিক্ষিত হতে দেওয়া হত না এবং এখনও হয় না। এখন লিঙ্গ বৈষম্যের প্রকটতাকে একটু হালকা করার জন্য, সংরক্ষণ বা ওই জাতীয় কিছুর কারণে, দিব্যি লেখাপড়া শিখে 'কানে কলম গুঁজে আপিস যেতে থাকা গিন্নিদের' (নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে বাংলার শিক্ষিত পুরুষদের অনেক ব্যঙ্গোক্তির একটি), হঠাৎ করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় এমন এমন সব পদের সামনে, যে পদগুলোয় তাদের পা বাড়ানোর অধিকার নেই। প্রেসিডেন্ট পদে 'আনটাচেবল' হল, 'মাইনরিটি মুসলিম' হল, এখন ওদের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, অন্য অর্থে 'সর্বোৎকৃষ্ট আনটাচেবল' আর মাইনরিটি অর্থাৎ নারীকে ওই পদে বসিয়ে দিলে ভারত নামক রাষ্ট্রটির উদারনীতি নিয়ে বিশ্বে নাম ফাটবে। রাষ্ট্রের 'পতি' হতে যাবেন একজন নারী। পতি তো পুরুষ, পুরুষের জন্য তৈরি করা পদটিতে কেন নারী আসীন হবেন? পুরুষের জন্য 'পদ' তৈরি করা হয়ে গেছে, এখন নারী সেই পদের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন বলে পদটির নাম বদলে যাবে, এ কথা না মানার লোক প্রচুর। এর মধ্যে বুদ্ধিজীবী আছেন, 'বাঘা বাঘা নারীবাদী'ও আছেন। আমার মতে, উঁচু পদগুলো অধিকার করার অধিকার যে কেবল পুরুষের নয়, তা যে নারীরও, সে কথা পদ তৈরি করার সময় কোনও পুরুষেরই মাথায় আসেনি, আসেনি বলে আজ তার প্রায়শ্চিত্য হোক। 'পতি' পদের অবলুপ্তি হোক, নয়তো নারী-পদ অর্থাৎ লিঙ্গ-নির্দিষ্ট পদ তৈরি হোক। সবচেয়ে ভালো নয় কি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য পদ অর্থাৎ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ পদ রচিত হওয়া? অনেকে সেটায় রাজি নন, পুরুষপদটিই যেমন আছে, তেমন রেখে দিতে চান, 'তা নাহলে স্ট্যাম্প-প্যাড ইত্যাদি পাল্টাতে হবে, খুব 'প্র্যাকটিক্যাল' নয় নাকি ব্যাপারটা। পুরোনো জিনিস দিয়ে চালিয়ে নিলে 'প্র্যাকটিক্যাল' হয়। পুরুষের পদটা অ্যাকসিডেন্টালি অধিকার করেছে নারী, এমন তো আর সচরাচর ঘটবে না, সুতরাং পদটি যে নামে আছে, সে নামেই থাকুক।' ব্যয় সাপেক্ষ, বাড়তি ঝামেলা এসব যুক্তি দেখিয়ে পুরুষের নামেই পদটি বহাল থাকুক, তা পুরুষবাদী নারী পুরুষ সকলেরই মনের কথা।

আমি এটি মানি না। 'ব্যয়' এবং 'বাড়তি ঝামেলা' এই ক্ষেত্রে বহন করাটা অত্যন্ত

জরুরি। অনেক অপ্রয়োজনীয় খাতে রাষ্ট্রের অর্থব্যয় হয়। এই অর্থব্যয়টি মানবতার স্বার্থে যুগান্তকারী সংস্কারের জন্য। আর, নতুন করে অফিসের কাগজপত্রে পদের নাম পরিবর্তন করা এমন কিছু আহামরি খরচ নয় যে ভারত সরকার তা বহন করতে পারবে না। কত কত শহরের নাম পরিবর্তন করা হল। ওগুলোর ঝামেলা কি কিছু 'অবাড়তি' ছিল? বোম্বে যখন মুম্বই হয়, মাদ্রাজ যখন চেন্নাই হয়, ক্যালকাটা যখন কলকাতা হয় শুধু কি আর সীল প্যাড ইত্যাদি পাল্টাতে হয়? আরও লক্ষ রকম জিনিস পাল্টাতে হয়। আর এ তো শহরের নাম পাল্টানোর মতো রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ নয়, এ হচ্ছে হাজার বছর ধরে লালন করা পুরুষতন্ত্রের-মদতে-লিঙ্গবৈষম্যের-জয়জয়কারের বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষে একটি আন্দোলন। যে মানবতা নারী এবং পুরুষকে সমান চোখে দেখে, যেটি পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে এবং মানুষের চিন্তা চেতনায় প্রবেশ না করালে সমাজে বৈষম্য দিন দিন প্রকটই হবে।

'নারী পুরুষ উভয়ে আসীন হতে পারেন এই পদে, রাষ্ট্রপতি নেহাতই একটা পদের নাম' — এরকম যারা বলছেন, তাদের জন্য আবারও বলছি, এটি একটি পদের নাম বটে, তবে এটি পুরুষের পদের নাম। এই পদে নারী আসীন হতে পারেন, নিশ্চয়ই পারেন, কিন্তু তারপরও পদটি কিন্তু পুরুষেরই পদ। ইতিহাস ভাষাবিজ্ঞান পুরুষতন্ত্র সবই নির্দ্বিধায় তা বলবে।

লিঙ্গ-নিরপেক্ষ শব্দের জন্য আন্দোলন অন্য ভাষাভাষীর দেশেও হয়েছে। ফায়ারম্যানকে এখন ফায়ারফাইটার বলা হয়। বারম্যানকে বারটেন্ডার। স্টুয়ার্ড বা স্টুয়ার্ডেসকে ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট। মেইলম্যানকে মেইল কেরিয়ার, চেয়ারম্যানকে চেয়ারপারসন বা চেয়ার। হি (He) এবং শি (She)-র বদলে এখন সিঙ্গুলার দে (They) ব্যবহার করার চল শুরু হয়েছে। ইওরোপ আমেরিকায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনকী প্রচুর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানেও লিঙ্গ বৈষম্যের কোনও রকম চিহ্ন আছে এমন শব্দ কোনওভাবেই ব্যবহার করা যাবে না বলে নির্দেশ জারি করা আছে। এটি খুব ভালো উদ্যোগ। যারা এই উদ্যোগে বিশ্বাসী নয়, তারা মানবাধিকারে, আধুনিকতায় এবং বিবর্তনে বিশ্বাসী নয়।

লিঙ্গবৈষম্য প্রকাশ পায় এমন শব্দের ব্যবহার নিয়ে আপত্তি জানালে বিরোধীদল ছুটে এসে বলবে, 'এসব কসমেটিক পরিবর্তনে পুরুষতন্ত্রের সত্যিকার কোনও পরিবর্তন হবে না।' বলবে 'অকারণে ভাষার ওপর অত্যাচার হচ্ছে।' বলবে 'দেশে এর চেয়ে অনেক গুরুতর সমস্যা আছে, সেগুলো সমাধানের চেষ্টা হোক।'

কোনও সংস্কারে বা সংশোধনে, বিশেষ করে তা যদি নারীর পক্ষে হয়, বাধা দিতে কোনওকালেই লোকের অভাব হয়নি। কিন্তু মানবাধিকারে যারা বিশ্বাস করে, তারা জানে এটি রক্ষা করতে হয় সর্বক্ষেত্রে, এমনকী মুখের ভাষাতেও। তুচ্ছ একটি শব্দেরও মূল্য অনেক। আর রাষ্ট্রপতি? সে তো মহামূল্যবান।

নারীর ক্ষেত্রে পদটির নাম 'রাষ্ট্রনেত্রী' বা এই ধরনের কিছু হতে পারে। লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হলে 'রাষ্ট্রপ্রধান' শব্দটি চমৎকার। কী শব্দ ব্যবহার করা উচিত তা পারিভাষিকবৃন্দ এবং ভাষাবিদরা আরও চিন্তাভাবনা করে বলবেন। আমি শুধু বলছি

রাষ্ট্রপতির স্থলে কোনও লিঙ্গনির্দিষ্ট (Gender-specific) বা লিঙ্গনিরপেক্ষ (Gender-neutral) শব্দ অতি অবশ্যই দরকার।

এই পদটি যদি 'রাষ্ট্রপতি' না হয়ে আদি থেকে 'রাষ্ট্রনেত্রী' হত, এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ এই পদটি পাওয়া থেকে পুরুষদের কৌশলে বঞ্চিত রাখা হত, তবে কি পুরুষেরা পারতো রাষ্ট্রনেত্রী পদটি মাথা পেতে নিজেদের জন্য বরণ করতে? না। ঝাড়ুদারদের যদি ঝাড়ুদারনি নামে ডাকা হয়, তারা সহ্য করবে? সেখানে রাষ্ট্রপতির মতো বিরাট লোককে 'রাষ্ট্রনেত্রী' নামে ডাকলে একই রকম অসহ্য বোধ করবে। রাষ্ট্রপতি পদটি যেহেতু 'পুরুষের পদ', তাই নারীর জন্য রাষ্ট্রপতি পদটি যথাযথ শুধু নয় আকর্ষণীয় এবং লোভনীয় বলে রায় দেওয়া হচ্ছে। এই সমাজে পুরুষের অবস্থান নারীর চেয়ে ওপরে বলে 'পুরুষের পদ' পেলে নারীর পদোন্নতি হয় বলে মনে করা হয়। ছেলেদের পোশাক পরলে মেয়েদের স্মার্ট ভাবা হয়। সম্পাদিকা/লেখিকা ব্যবহার না করে সম্পাদক/ লেখক ব্যবহার করায় অনেকে আধুনিকতা খুঁজে পান। অ্যাকট্রেসকে এখন তো অ্যাকটর বলা হচ্ছে। ঠিক এর উল্টোটা কি হতে পারে? তাবৎ অভিনেতাদের যদি প্রস্তাব দেওয়া হয় যে তোমরা এখন থেকে 'অ্যাকট্রেস'? মানবে কেউ? প্রশ্নই ওঠে না, বরং হেসে কুটিকুটি হবে। ম্যাডোনার একটি গান এখন মনে পড়ছে—

'Girls can wear jeans
And cut their hair short
Wear shirts and boots
'Cause it's okay to be a boy
But for a boy to look like a girl is degrading
'Cause you think that being a girl is degrading'

মেয়েদের পোশাক পরলে ছেলেদের মান সম্মান হানি হয়। মেয়েদের পদ গ্রহণ করলে ছেলেদের পদাবনতি হয়। এই হল সমাজ। এই সামাজিক পরিস্থিতিতে দেশের নারী-প্রেসিডেন্টকে 'রাষ্ট্রনেত্রী' বা 'রাষ্ট্রপ্রধান' না বলে 'রাষ্ট্রপতি' বলা, পদটিকে ম্যাসকুলিন করে রাখার ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। নারীকে পতির আসনে বসালে, ভাবা হচ্ছে, বিরাট স্মার্ট কিছু হয়ে গেল বুঝি, মান সম্মান বাড়লো বুঝি, পদোন্নতি হল বুঝি। এই ভাবনাটা যে প্রচণ্ড পুরুষতান্ত্রিক ভাবনা এতে কোনও সংশয় থাকার কথা নয় কারওর।

যে দেশ দীর্ঘ ষাট বছর সময় নিয়েছে একজন নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান বানাতে, সে দেশ আরও কত বছর নেবে দ্বিতীয় কোনও নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত করতে, তা দেশই জানে। 'পতি'দের দাপট এত বেশি যে পতি নামটি বর্জন করার বুকের পাটা কারও নেই। পতি পদের গদিতে বসতে পতিদের অর্থাৎ পুরুষদের খুব আরাম হয়। পতি পদটি সংসারে সবার ওপরে, পতিরা সমাজপতি হিসেবে সমাজেও সবকিছুর ওপরে, রাষ্ট্রের পতি হলে তো আর কথাই নেই। সবার ওপরে পতি সত্য,

তাহার ওপরে নাই। কিন্তু, সতীরা না বুঝলেও পতিরা বোঝে যে, সতীদের পতি হতে বলার পেছনে যে রাজনীতি কাজ করছে, সেটি সতীদের অর্থাৎ নারীদের কোনও গতি করবে না, বরং ক্ষতিই করবে।

পুরুষের পদে লীন হয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব নেই। বরং নিজের পদের নাম পুরুষ থেকে আলাদা করে আলাদা অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াটাই কাজের কাজ। নারীর পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করার চল এই সমাজে নেই। এই 'নেই'টিকে চ্যালেঞ্জ করা উচিত। নামে কিছু আসে যায় না? নামে অনেক কিছু আসে যায়। নামের কারণে নিজের পৃথক অস্তিত্বকে জানান দেওয়ার মতো বিরাট ঘটনা ঘটে। এটি কি কম? যদি নারী নারী হয়ে এবং নারী-পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্মান না পায়, সম্মান পেতে হলে যদি তাকে পুরুষের মতো হতে হয় বা পুরুষের পদে আরোহন করতে হয়, তবে সেটি নারীর জন্য সম্মান তো নয়ই, বরং ঘোর অপমান।

অনেকে বলছে 'রাষ্ট্রনেত্রী' শব্দটা নতুন, এটা লোকে নেবে না। ঠিক নয়। গার্লহুড বোঝাতে লিঙ্গ-নির্দিষ্ট কোনও শব্দ বাংলায় এতকাল ছিল না। ওটা বোঝাতে বয়হুড অর্থাৎ 'ছেলেবেলা'র আশ্রয় নিতে হত। যেই না আশির দশকে 'মেয়েবেলা' শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করেছি, অমনি লুফে নিল মানুষ। পদ তৈরি করতে হলে পদ একটু বাড়াতে হয়। নতুন পদক্ষেপ রচিত না হলে নতুন পদ কী করে রচিত হবে! মানসিকতার বদল কী করে হবে! বদল না হলে পদের বদলও যে হয় না!

লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বাংলা ভাষার প্রয়োজন

বাংলা ভাষাকে দারিদ্র্যমুক্ত এবং বৈষম্যমুক্ত করে একে আরও সমৃদ্ধ করা যাঁদের দায়িত্ব তাঁরা নিশ্চয়ই খুব বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, জ্ঞানী এবং গুণী মানুষ। আমি অনুমান করতে পারি, তাঁরা অধিকাংশই পুরুষ। পুরুষ হলেই যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা বহন করবেন, তা আমি মনে করি না। তাঁদের এবং সাধারণ জনগণের কাছে লিঙ্গ নিরপেক্ষ ভাষার উদ্ভাবন এবং প্রচার শুরু করার অনুরোধ করছি। বিশ্বের সভ্য দেশগুলোয় যেখানে নারীকে 'মানুষ' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, সেসব দেশে ভাষাকেও করা হচ্ছে লিঙ্গ নিরপেক্ষ। এই বাংলায় যদি সেটির কোনও উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তবে বুঝতে হবে, বাঙালি নারী যেভাবে মার খেয়ে যাচ্ছে আদিকাল থেকে, আচার আচরণে আইনে ঐতিহ্যে ধর্মে সংস্কৃতিতে ভাবে ভাষায়, তেমন খেয়েই যাবে। ইংরেজি ভাষাকে লিঙ্গনিরপেক্ষ করার জন্য যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে বা হচ্ছে, সেসবের সামান্য কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

যা ছিল	যা হয়েছে/হচ্ছে
ম্যান	হিউম্যান বিং
ম্যানকাইণ্ড	হিউম্যানকাইন্ড, হিউম্যানিটি
ম্যান্স অ্যাচিভমেন্ট	হিউম্যান অ্যাচিভমেন্ট
ম্যানফুলি	ভ্যালেন্টলি
ম্যানপাওয়ার	ওয়ার্কফোর্স, হিউম্যান এনার্জি, হিউম্যান রিসোর্সেস
ম্যান মেইড	হিউম্যান ইনডিউজড
ব্রাদারহুড অব ম্যান	হিউম্যান ফেলোশিপ, হিউম্যান কিনশিপ
ব্রাদারলি	ফ্রেণ্ডলি
ম্যান অ্যান্ড ওয়াইফ	হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফ
বিজনেসম্যান	বিজনেস ম্যানেজার

যা ছিল	যা হয়েছে/হচ্ছে
ক্যামেরাম্যান	ফটোগ্রাফার, ক্যামেরা অপারেটর, ক্যামেরা ক্রু
ক্রাফটসম্যানক্রাফটওয়ার্কার, আর্টিসেন	
ক্রাফটম্যানশিপ	ক্রাফট, ক্রাফট স্কিল্‌স
ফেলো কান্ট্রিম্যান	কমপ্যাট্রিয়ট
ফোরম্যান	সুপারভাইজার
জেন্টেলম্যানস অ্যাগ্রিমেন্ট	অনারেবল অ্যাগ্রিমেন্ট
ল্যান্ডলর্ড	ওউনার, প্রোপ্রাইটর
লেম্যান	লেপারসন, নন প্রফেশনাল
অমবুডসম্যান	মেডিয়েটর
পুলিসম্যান	পুলিস, পুলিস অফিসার
সেল্‌সম্যান	সেল্‌স অ্যাসিসটেন্ট
স্পোক্সম্যান	স্পোক্সপারসন
স্পোর্টসম্যান	অ্যাথলেট, স্পোর্টসউওম্যান (প্রয়োজনে)
ওয়ার্কম্যান লাইক	ওয়েল একজেকিউটেড
জন অ্যান্ড মেরি হ্যাভ ফুল টাইম জব্‌স, হি হেল্পস হার উইদ দ্য হাউজওয়ার্ক	জন অ্যান্ড মেরি হ্যাভ ফুল টাইম জব্‌স, দে শেয়ার হাউজওয়ার্ক
ট্রান্সপোর্ট উইল বি প্রোভাইডেড ফর ডেলেগেট্‌স এণ্ড দেয়ার ওয়াইভস	ট্রান্সপোর্ট উইল বি প্রোভাইডেড ফর ডেলেগেট্‌স অ্যান্ড ফর দেয়ার স্পাউসেস অর পারসন্স অ্যাকোমপ্যানিং দেম
দ্য ডকটর .. হি	ডকটরস... দে
দ্য নার্স.. শি	নার্সেস... দে
উওম্যান ডক্টর, মেইল নার্স	ডক্টর, নার্স
মাদারিং	প্যারেন্টিং, নার্চারিং, চাইল্ড রিয়ারিং
হাউজওয়াইফ	হোমমেকার
ফোরফাদার্‌স	অ্যানসেসটর্‌স

যা ছিল	যা হয়েছে/হচ্ছে
ফাউন্ডিং ফাদার্স	ফাউন্ডার্স
উওম্যান ড্রাইভার	ড্রাইভার
গানম্যান	শুটার
দ্য কমন ম্যান	দ্য অ্যাভারেজ পারসন, অরডিনারি পিপল

বাংলা ভাষাটিকে লিঙ্গ নিরপেক্ষ (এবং প্রয়োজনে লিঙ্গ-নির্দিষ্ট) করা হলে ভাষা একটি সভ্য ভাষা হবে, নয়তো এটি পুরুষতান্ত্রিকই রয়ে যাবে, যেমন আছে। অভিধান সংশোধন করতে হবে সবার আগে।

শারীরিক যে পার্থক্য পুরুষ নারীতে আছে, তা তো আছেই। তার বদলের কথা হচ্ছে না। নারী আর পুরুষের ভূমিকা এক এক সমাজে এক এক সময়ে এক একরকম ছিল। নারী ও পুরুষ হওয়ার কারণে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধে হেরফের করা হয়। নারী এবং পুরুষদের কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এই ভাগটি করেছে পুরুষেরা। নারীকে দেশের লোকনীতি, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত-নির্মাণ — এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিতে বাধা দেওয়া হয়। লৈঙ্গিক সাম্যের কথা বললে অনেকে ভাবে পুরুষ ও নারীকে বুঝি এক করে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তা নয়, পুরুষ হোক নারী হোক, সুযোগ সুবিধে যা পাবে, সমান পাবে — এই হল দাবি।

'অবলা' যে অর্থে ব্যবহার হয়, সেই অর্থে 'অবল' শব্দটি ব্যবহৃত হতে হবে। পুরুষ যদি বলহীন এবং দুর্বল হয় তবে তাদের অবল বলে ডাকতে হবে, যেমন ডাকা হয় নারীদের অবলা। কুমারী, সতী, রক্ষিতা, পতিতা, বারাঙ্গণা, বারবণিতা, গণিকা, বেশ্যা, ডাকিনী, কলঙ্কিনী, কুলটা, উপপত্নী, মাগ, মাগী, অসতী, দ্বিচারিণী, রূপোপজীবিনী, দেহোপজীবিনী, ছিনাল, খানকি ইত্যাদির পুং প্রতিশব্দ প্রস্তুত করা হোক, নয় এই শব্দগুলোর ব্যবহার বন্ধ করা হোক।

যে অর্থে কুমারী এবং সতী শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়, সেই একই অর্থে কুমার আর সৎ ব্যবহৃত হয় না। শব্দে নতুন অর্থ স্থাপন করারও খুব প্রয়োজন। সতী/অসতী শব্দদ্বয়ের পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ তৈরি করতে হলে সত/অসত-এর কথা ভাবা যায়। সৎ-অসৎ যেমন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে, তেমনই হবে। জানি জোর করে কোনও নতুন শব্দ ভাষায় ঢোকানো যায় না। কিন্তু মানুষের মধ্যে সচেতনতা এলেই নতুন শব্দ এবং বাক্যের ব্যবহার হয়, এবং এর প্রচলন শুরু হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বাংলা ভাষাটিকে অত্যন্ত নারী বিরোধী ভাষায় পরিণত করেছে। গালিগালাজ আর যৌন রসাত্মক কৌতুক বাজারে যা চিরকালই চলছে, প্রায় সবই নারী-বিরোধী। নারীকে ভয়ংকরভাবে অপমান করেই হো হো করে তুমুল হেসে ওঠে সমাজ।

যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশে নারীরা বাস করছে, কোনওদিনই সেখানে নারী তার সমানাধিকার পাবে না, যদি এই পরিবেশটি নারীকে বর্জন করে কোনওভাবে।

চলতে ফিরতে আমি পুরুষতান্ত্রিক বাক্যের সম্মুখীন হই প্রতিদিন। ধরা যাক সুব্রত আমাকে নেমন্তন্ন করলো, আমি যাবো, সিদ্ধান্ত নিলাম সঙ্গে আমার এক বন্ধু অমিতকে নেব আমি, যেই না বললাম অমনি সুব্রত অমিতের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চাইবে, বলে দেবে অমিত যেন আমাকে অমুক ঠিকানায় সুব্রতর বাড়িতে নিয়ে যায়। অমুক ঠিকানা অমিত তার বাপের জন্মে চেনে না। যদি চেনে কেউ, সে আমার গাড়ির ড্রাইভার, আর গাড়িতে যে ম্যাপ আছে, সেই ম্যাপ দেখে ঠিকানা খুঁজে বার করতে পারি আমি, যেটি অমিতের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। আমার গাড়িতে আরাম করে বসে অমিত গান শোনে। আর, হয় ড্রাইভার নয় আমি ঠিকানা খুঁজে বার করি। সুব্রতর বাড়িতে যাওয়ার পর সুব্রত এবং তার বাড়ির সকলে আর তার বন্ধুরা এই খবরটি জানে এবং লোককে জানায় যে অমিত নামের একটা ছেলে আমাকে তার বাড়ি নিয়ে গেছে।

কোথাও নেমন্তন্নে গেলে যেখানে প্রচুর লোক লক্ষ্য করেছি একলা মেয়েদের জিজ্ঞেস করে, 'কার সঙ্গে এলে বা কে নিয়ে এলো তোমাকে?' একলা ছেলেদের এ কথাটা জিজ্ঞেস করে না কে নিয়ে এলো। মেয়েরা একা কোথাও যেতে পারে না এই বিশ্বাস থেকে ভাষার এই ব্যবহার।

দৈনন্দিন জীবনে প্রতিদিনই পুরুষকে প্রধান করে যেসব বাক্য ব্যবহার হচ্ছে, কারও কানে বা মনে কোনো খটকা লাগে না শুনে। 'সুব্রত এই মাত্র তার বউকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।' এর বদলে বলা তো যায় 'সুব্রত আর ঋতুপর্ণা এই মাত্র বেরিয়ে গেল!'

'দে আর মেকিং লাভ' বাংলা কথ্যভাষায় এমন শব্দ প্রচলিত নয়, যা প্রচলিত তা হল 'ছেলেটা মেয়েটাকে করছে।' এতে দুজনকে দিয়ে কোনও কাজ করানো হচ্ছে না। তাতে দুজনের ইনভলভমেন্ট নেই। একজনকে অ্যাকটিভ, আরেকজনকে প্যাসিভ ধরা হচ্ছে।

কবি আর মহিলা-কবি, এরকম বলা হচ্ছে অনেক যুগ। নারী পুরুষ উভয়ের জন্য 'কবি' শব্দটি ব্যবহার করা জরুরি, কিন্তু তা না করে মেয়েদের যদি 'মহিলা-কবি' বলা হয়, তবে পুরুষদের শুধু কবি না বলে 'পুরুষ কবি' বলা উচিত। একই রকম সাংবাদিক আর মহিলা সাংবাদিক। হয় দুজনের জন্য সাংবাদিক। নয় একজন পুরুষ-সাংবাদিক, আরেকজন মহিলা-সাংবাদিক।

'তোমরা ক-পুরুষ বাস করছো এখানে?' না বলে, 'তোমরা ক-প্রজন্ম বাস করছো এখানে?' 'তোমার পূর্ব পুরুষ কোথায় বাস করতো?' র বদলে 'তোমার আগের প্রজন্ম কোথায় বাস করতো?'

'আমার কর্তা কলকাতায় নেই' না বলে 'আমার স্বামী', বা যদি নাম হয় কল্যাণ

তবে ‘কল্যাণ কলকাতায় নেই।’ স্বামীকে ‘অ্যাই, অ্যাই শুনছো, কই গো, পিংকির বাবা কোথায় গেলে’ এভাবে না ডেকে সোজা নাম ধরে, যদি নাম হয় অভীক, ডাকতে হবে অভীক।

বাংলাকে লিঙ্গ নিরপেক্ষ ভাষা করার ক্ষেত্রে একটা বড় সুবিধে আছে। সুবিধেটি হল ইংরেজির হি এবং শি বাংলায় ‘সে’। হিম/হার/হিজ/ সবই তার/তাকে। নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে এই একই শব্দের ব্যবহার ভাষাটিকে লিঙ্গ নিরপেক্ষ হওয়ার পক্ষে ব্যাপক সম্ভাবনা দিচ্ছে।

সব সময় স্বামী-স্ত্রী ব্যবহার করা কেন? স্ত্রী-স্বামীও তো ব্যবহার করা যায়। উত্তম-সুচিত্রার জায়গায় সুচিত্রা-উত্তমও বলা চলে বিকল্প হিসেবে।

ভাষাকে শুদ্ধ করার কথা এই কারণেই বলা হচ্ছে, যে, ভাষা শুধু যে আমাদের মানসিকতার প্রতিফলন তাই নয়, ভাষা আমাদের মানসিকতাকে গঠন করেও বটে। এমন ভাষা যদি সারাক্ষণ ব্যবহার করা হয়, যে ভাষা নারীকে দুর্বল, পরনির্ভর, নিচুশ্রেণীর জীব হিসেবে চিহ্নিত করে, তাহলে এই ধারণাটি মানুষের মানসিকতার মধ্যে অজান্তেই ঢুকে বসে থাকে নারীরা বুঝি সত্যিই দুর্বল, পরনির্ভর, নিচুশ্রেণীর জীব।

আধুনিক হচ্ছে জগত। সাম্যের আর সমানাধিকারের বোধ বাড়ছে মানুষের মধ্যে। নারী শেকল ছিড়ে বাইরে বেরোচ্ছে। আমাদের চিন্তাভাবনা ধ্যান ধারণার বিবর্তন হচ্ছে, তবে ব্যবহৃত ভাষাটির বিবর্তন নয় কেন?

ভাষা খুব শক্তিশালী জিনিস। সাহিত্যিকেরা জানেন, বৈষম্যের শিকার যে নারীরা, তাঁরাও জানেন ভাষার শক্তি কী ভয়ংকর। যে সমাজে যত বেশি মানুষ ভাষার শুদ্ধতা আনার চেষ্টা করবে, সে সমাজ তত সভ্য হবে।

শাঁখা সিঁদুরের গল্প

ইস্কুলে বিবাহিত মেয়েরা যেন শাঁখা সিঁদুর পরে না আসে, অবিবাহিত মেয়েদের কাছে নিজেদের দাম্পত্য জীবনের গল্প না করে, কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদের একটি ইস্কুল কর্তৃপক্ষ এমন আদেশই জারি করেছে। জারি করা মাত্র ভীষণভাবে ক্ষেপে উঠলো মিডিয়া, মানুষ। কী? হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে ফতোয়া! কর্তৃপক্ষ বোঝাতে চাইছেন, দাম্পত্য জীবনের সরস বর্ণনা অবিবাহিত মেয়েদের যদি আগ্রহী করে তোলে বিবাহিত জীবনের প্রতি, তবে তারা পড়াশোনায় আগ্রহী না হয়ে বরং যত শীঘ্র পারে বিয়ে করার জন্য আগ্রহী হবে। কতৃপক্ষের যুক্তি কারও পছন্দ হয়নি, হুমকির মুখে ইস্কুলের শাঁখা সিঁদুর না পরার আদেশ তুলে নিতে বাধ্য হলেন কর্তৃপক্ষ।

আর ওদিকে উত্তর চব্বিশ পরগণার গুমা গ্রামের রীনা বৌদ্ধকে গ্রামবাসীরা প্রচণ্ড মেরে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তার অপরাধ, বিবাহিত হয়েও শাঁখা সিঁদুর না পরা। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার কারণে রীনা শাঁখা সিঁদুর পরেননি, কিন্তু গ্রামবাসীর ফতোয়া, শাঁখা সিঁদুর পরতেই হবে, তা না হলে গ্রামে থাকা চলবে না। রীনা বৌদ্ধ অগত্যা তার স্বামী বীরেন্দ্র বৌদ্ধকে নিয়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তিনি তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিরাপদে বাস করতে চান কিন্তু সেই নিশ্চয়তা এখনও তিনি প্রশাসনের কাছ থেকে পাননি।

শাঁখা সিঁদুরের গল্প অনেক। আমার বাড়িতে প্রায়ই গল্প করতে আসে সোনারপুরের সপ্তমী। জন্ম তার সুন্দরবনে। বন্যায় বাড়ি ঘর ভেসে গেল যে বছর, সে বছর তার বাবা মা তার এগারোটা ভাইবোনকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছিলো সোনারপুরে। সপ্তমী তখন সাত মাসের শিশু। সপ্তমীকে মেঝেয় বসিয়ে রেখে লোকের বাড়িতে কাজ করতো তার মা। সপ্তমীও অল্প বয়স থেকেই লোকের বাড়িতে কাজ করছে। বারো তেরো বছর বয়সেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। স্বামী কোনওদিন ভালোবাসেনি। শ্বশুরবাড়িতে দাসীর কাজ করতো, তারপরও প্রতিদিন তাকে স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা প্রচণ্ড মারতো। এত অত্যাচার সয়েও স্বামীর বাড়ি বলেই রয়ে গিয়েছিল সে। দুটো মেয়ে-বাচ্চা জন্মেছে, বাচ্চাগুলো তখনও কোলে, স্বামী তাকে মেরে প্রায় আধমরা করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। সেও পনেরো বছর হয়ে গেল। এই পনেরো বছর স্বামী তার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করেনি, বাচ্চাদুটো বেঁচে আছে কী মরে গেছে তা জানতেও কোনওদিন চেষ্টা করেনি। কোনওদিন কোনও

খরচপাতি দেয়নি। অসম্ভব আর্থিক কষ্টে দিনের পর দিন কাটিয়েছে। না খেয়ে বা আধপেট খেয়ে বেঁচেছে সপ্তমী, বাঁচিয়েছে দু বাচ্চাকে। তার স্বামী আরেকটা বিয়ে করে নিয়েছে সেও অনেক বছর। কিন্তু সপ্তমী এখনও পরে আছে শাঁখা সিঁদুর, এখনও পরে আছে হাতে লোহা। দেখে সপ্তমীকে জিজ্ঞেস করেছি, 'যে লোক তোমাকে এত কষ্ট দিলো, এত মারলো, তাড়িয়ে দিল, তোমার সঙ্গে পনেরো বছর কোনও সম্পর্ক নেই। তুমিও কোনওদিন তার কাছে ফিরবে না। সেও তোমাকে নেবে না। তবে কেন পরে আছো শাঁখা সিঁদুর?'

সপ্তমী বলে, 'আমাদের মধ্যে একবার শাঁখা সিঁদুর পরলে তা আমরা ফেলতে পারি না।'

আমি বললাম, 'তুমি ডিভোর্স দিচ্ছ না কেন?'

বললো, 'আমাদের মধ্যে মেয়েরা ডিভোর্স করতে পারে না।'

বললাম, 'কে বলেছে পারে না? খুব পারে। তোমার স্বামীর সঙ্গে তোমার তো ডিভোর্স হয়নি, স্বামী তো আরেকটা বিয়ে করে বসে আছে। তোমাদের মধ্যে তো ডিভোর্স না হলে ফের বিয়ে করাও আইনত নিষিদ্ধ, সেটা জানো?'

সপ্তমী আমার কথা ঠিক বুঝতে পারলো না। আমাকে আবার বুঝিয়ে বলতে হল যে এখনকার হিন্দু আইনে ডিভোর্স দেওয়ার অধিকার মেয়েদের আছে এবং কোনও পুরুষ বা নারীর একাধিক স্ত্রী বা স্বামী রাখার অধিকার নেই। না, সপ্তমী এসব আইনের কথা জানে না। সে গড়গড় করে অনেক চেনা পুরুষের নাম বলে গেল, যারা দুটো তিনটে স্ত্রী নিয়ে এক বাড়িতে বাস করছে।

'কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করি।

বললো, 'সোনারপুর, সুভাষগ্রাম, সুন্দরবন।'

সপ্তমীকে আমি দেখেছি কিছু একটা কথা যখন সে আমাকে বিশ্বাস করাতে চায়, তাড়াতাড়ি তার এক হাতের শাঁখাকে আরেক হাতে চিমটি মেরে ধরে বলে, 'আমার স্বামীর দিব্যি খেয়ে বলছি দিদি....'

সপ্তমীর কাছে বড় পবিত্র জিনিস এই শাঁখা। এটি সে যে করেই হোক পরতে চায়। এটি ফেলতে যেদিন হবে, সেদিন তার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ দিন।

আমি হেসে বলি, 'তোমার স্বামী তোমার কোনও খবরই নেয়নি। তোমার দুরবস্থায় কোনও রকম সাহায্য কোনওদিনই করেনি। তোমার দু বাচ্চা জানেই না বাবা কাকে বলে। ওই লোক বেঁচে থাকলেই কী, না থাকলেই কী।'

সপ্তমী বললো, 'আমার স্বামী যেভাবেই থাকুক, আমি চাই বেঁচে থাকুক।'

'কেন?' আমার প্রশ্ন।

সপ্তমীর উত্তর, 'আমি শাঁখা সিঁদুর নিয়েই মরতে চাই।'

শাঁখা সিঁদুর নিয়ে মরলে সপ্তমী স্বর্গে যাবে। সপ্তমীর মতো মেয়ে প্রচুর চারদিকে। আমি সেই মেয়েদের কথা জানি, যাদের স্বামী আরেকটা বিয়ে করে অন্যত্র সংসার করছে, ফিরেও তাকায় না, জানি সেই মেয়েদের কথা স্বামীরা যাদের মেরে হাড়

গোড় ভেঙে ফেলে রাখে, জানি সেই মেয়েদের কথা, যে মেয়েরা অমানুষিক পরিশ্রম করে সারাদিন যা উপার্জন করে, তার পুরো টাকাই মদ্যপ জুয়ারী স্বামী সন্ধেবেলা এসে কেড়ে নেয়, জানি সেই মেয়েরা কী পরম যত্নে সিঁদুর পরে, কী আহ্লাদে শাঁখা পরে।

'শাঁখা সিঁদুর না পরলে তো নানারকম সম্ভাবনা আছে। কারও সঙ্গে তোমার প্রেম হতে পারে, তাকে বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করতে পারো। কোনও ভালো লোকের দেখা তো পেতে পারো।'

আমার কথা শুনে সপ্তমী জোরে হেসে ফেললো। বললো, 'না, না, বিয়ে আমাদের একবারই হয়। স্বামী আমাদের একজনই থাকে। ভালো লোকের কথা বলছেন? না, দিদি। কাউকে বিশ্বাস নেই। প্রথম প্রথম ভালো হলেও শেষে গিয়ে সব লোকই আমার স্বামীর মতোই।'

সপ্তমী একদিন বললো, 'বদ লোকের উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য শাঁখা সিঁদুর আমাদের পরতেই হয়। এগুলো পরা দেখলে লোকেরা বুঝে যাবে আমরা কোনও বেওয়ারিশ মাল নই।'

আমার বোঝা হল, শাঁখা সিঁদুর মেয়েদের জীবনে বিরাট এক নিরাপত্তা। স্বামীর কোনও অস্তিত্ব না থাকলেও বেওয়ারিশ মাল ভেবে শিয়াল শকুনেরা যেন তাদের খুবলে না খেতে পারে, সে কারণে শাঁখা সিঁদুরের আশ্রয় তাদের নিতেই হয়।

কিন্তু শাঁখা সিঁদুর মেয়েদের সত্যিকার কোনও নিরাপত্তা দিতে পারে বলে আমি মনে করি না। যে পুরুষ ছিঁড়ে খেতে আসে, ধর্ষণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে আসে, বদ উদ্দেশে বদমাইশি করতে আসে, শাঁখা সিঁদুর তাদের জন্য কোনও বাধা নয়।

সপ্তমীর জন্য, সপ্তমীর মতো আরও লক্ষ মেয়ের জন্য আমার খুব কষ্ট হতে থাকে। মেয়েটি একা থাকে, একা একটি বেড়ার ঘরে। খেতে পাক বা না পাক, কোথায় কোন সুদূরে আমোদ ফুর্তি করা স্বামীর মঙ্গলের জন্য যত পুজো আচ্চা আছে, সবই অভাবী মেয়েটি সাধ্যের বাইরের খরচাপাতি দিয়ে হলেও করে। কী নিরাপত্তা দেয় তাকে শাঁখা সিঁদুর। জিজ্ঞেস করেছিলাম তাকে কেউ কি চেষ্টা করেনি অসম্মান করতে?

'খুব করেছে।' সপ্তমীর কথা। 'দিন রাত লোকে করেই যাচ্ছে।'

'তবে আর কী লাভ!' বলতে চেয়েও বলিনি। নিজেই বললো, 'রাতে রাতে ঘুম হয় না। বালিশের কাছে একটা দা নিয়ে শুই। দরজায় যখনই খুট খুট শব্দ হয়, দা নিয়ে দরজার কাছে যাই। আয় কে ঢুকবি ঢোক, আজ তোর একদিন কী আমার একদিন।'

'এত সাহস তোমার সপ্তমী!' মুগ্ধ বিস্ময়ে বলি।

'সাহস না থাকলে লোকে কেটে ফেলতো গো দিদি। কেউ দু পয়সা দিয়ে আমাকে সাহায্য করার নেই। সোনারপুর থেকে সাত সকালে উঠে পান্তা খেয়ে ভিড়ের ট্রেন ধরি। সাত লোকের বাড়িতে কাজ করে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফিরি। সাহস আছে বলে একটু একটু করে টাকা জমিয়ে একটা জায়গা কিনেছি, জায়গার ওপর হোক না দরমার, ঘর তো একটা করেছি। লোকে কত বড় ছোট কথা বলেছে, বলেছে

কলকাতায় গিয়ে গিয়ে লাগু ধরি। কারও কথায় আমি কান দিইনি। কান দিলে চলবে? আমাকে কি একবেলা খেতে দেবে নাকি ওরা?

জিজ্ঞেস করি, ‘তবে শাঁখা সিঁদুর না পরলে লোকে কী ভাববে কী বলবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো কেন? যা ইচ্ছে তাই বলুক, ভাবুক। বেওয়ারিশ মাল ভাবলে তোমার কী যায় আসে? যদি বলো, তোমার অনুমতি ছাড়া তোমাকে কেউ স্পর্শ করবে, তোমাকে কেউ বিরক্ত করবে, তোমার ওপর কেউ ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাতে কী? তোমার দা তো আছেই। ভয় কিসের?’

সপ্তমীর চোখে অন্য ভয় খেলা করে। সেই ভয়টা দীর্ঘ দীর্ঘকাল ধরে মহা দাপট নিয়ে বিরাজ করা সংস্কারকে ভাঙার ভয়। এই ভয়টা সপ্তমীর মতো আরও সহস্র সপ্তমীর আছে।

নিম্নবিত্ত মেয়েরা কী কী সব কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে, উচ্চ-শ্রেণীর, উচ্চ-শিক্ষিত উচ্চ-বিত্ত মেয়েদের পক্ষে সেসব কল্পনা করাও অসম্ভব। সপ্তমীরা আইন জানে না তাই মানে না। মুখের অন্ন জোগাতে বাধা দেয়, এমন যা কিছুই দেখে সজোরে উপড়ে ফেলে, পাছে লোকে কিছু বলের ধার কখনও ধারে না। ভীষণ সাহস আর শক্তি নিয়ে এরা একা একা বেঁচে থাকে। এদের দু পয়সা দিয়ে সাহায্য করার, একবেলা খাবার দিয়ে সহযোগিতা করার কেউ নেই। এরা যুদ্ধ করে প্রতিদিন, ভাতের একটি দানার জন্যও যুদ্ধ করতে হয়। এরা কোনওদিন ইস্কুলে যায়নি, স্বরে অ স্বরে আ জানে না। কিন্তু লাফিয়ে কী করে ট্রেনটা ধরতে হয় জানে। কেউ কাঁধ খামচে ধরলে কী করে গুষ্ঠি তুলে গালি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে হয় জানে। নিজের পয়সার দিকে কেউ হাত বাড়ালে সেই হাত কি করে মুচড়ে দিতে হয় জানে। রাতের অন্ধকারে ঘরের দরজা ভেঙে কেউ ঢুকে পড়লে মাথায় কী করে কোপ দিতে হয় জানে। শুধু জানে না কী করে ফেলে দিতে হয় হাতের শাঁখা, কী করে মুছতে হয় সিঁদুর। সংস্কারের শেকলে বন্দি এখনও বেশির ভাগ মেয়ে, এমনকী দুর্দান্ত সাহসী মেয়েও।

ধর্ম থাকবে, নারীর অধিকারও থাকবে, এটা হয় না

নারী-স্বাধীনতা, মানবাধিকার, মানবতা, মুক্ত চিন্তা, মতপ্রকাশের অধিকার, গণতন্ত্র এবং ধর্মমুক্ত জীবনাচরণের সঙ্গে ধর্ম, ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্মীয় আইন, ধর্মীয় শাসন ইত্যাদির বিরোধ সবচেয়ে বেশি। এই বিরোধ আজকের নয়, যেদিন থেকে ধর্মের আবির্ভাব সেদিন থেকেই। নারীর অধিকারের কথা বলবো, কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদীরা আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবে না, সুযোগ পেলে আক্রমণ করবে না, তা তো হতে পারে না। কেউ কেউ বলে, ওদের খোঁচাও কেন, বা উসকে দাও কেন, বা বাড়াবাড়ি করো কেন, তাই তো ওরা ফতোয়া দেয়, বা হত্যা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর অর্থ মৌলবাদের কারণে নারীরা নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে হোক, মৌলবাদ সমাজে ত্রাসের সৃষ্টি করছে করুক, মৌলবাদ নারীকে শেকল পরাচ্ছে পরাক, নারীকে অন্ধকারে বন্দি করছে করুক, কিন্তু নারী যেন মুখ বুজে থাকে। মুখ বুজে না থাকলে মৌলবাদীরা আবার নাখোশ হবে, রাগ হবে, গালি দেবে, পাথর ছুঁড়ে মারবে। এর ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, তা তো কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না।

একটা সময় ছিল, যখন জগতে ছিল ধর্মের শাসন, সেই সময়কে বলা হয় 'দ্য ডার্ক এজেস' বা 'অন্ধকার যুগ'। খ্রিস্টানেরা ডাইনি আখ্যা দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতো মেয়েদের। হিন্দুরা মেয়েদের জ্যান্ত পোড়াতো, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে বাধ্য করতো তাদের, পুরুষের বহুবিবাহ তো ছিলই, উত্তরাধিকার এবং মানবাধিকার থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করা হত, যৌনদাসী আর পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবেই শুধু ব্যবহৃত হত মেয়েরা। মেয়েদের জ্যান্ত না পোড়ালেও যৌনদাসী এবং পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করা আর সব ধর্মের মতো ইসলামেরও আদর্শ। জগতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক, যুক্তিবাদী, এবং মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসীরা ধর্মীয় শাসনের সমালোচনা করেছেন, সাম্যের কথা, সমানাধিকারের কথা মুখ ফুটে বলেছেন, এবং তাঁদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা হয়েছে সব কালেই, সব সমাজেই। গ্যালিলিও গ্যালিলেই, জিয়োর্দানো ব্রুনো থেকে শুরু করে বাংলার বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায় সকলের ওপরই আক্রমণ হয়েছে। অন্ধকার সমাজকে যে মানুষই আলোকিত করতে চেয়েছেন, তাদের মুণ্ডুচ্ছেদ করার লোকের কোনওকালেই অভাব ছিল না। এখনও নেই।

যুক্তিবাদীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে নৈতিক এবং লৌকিক শিক্ষা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে গেলেও এবং রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক করার ব্যবস্থা হলেও

অধিকাংশ মুসলিম অঞ্চল আজও পড়ে আছে অনেক পেছনে। পুঁজিবাদী শক্তি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে নিজেদের স্বার্থে অনেককাল ধরে ব্যবহার করে আসছে। সাধারণ মানুষকে অজ্ঞতা আর অলৌকিকতার মধ্যে কৌশলে ডুবিয়ে রেখেই স্বার্থসিদ্ধি সম্ভব হয়েছে। মুসলিম শাসকদের স্বৈরাচার, ব্যক্তিস্বার্থ, অদূরদর্শিতা অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রকে এখনও সভ্যতা থেকে আলোকবর্ষ দূরে সরিয়ে রাখছে। মানবাধিকার, মানবতা, নারীর অধিকার, গণতন্ত্র, বাক্ স্বাধীনতার অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। ওখানে যা ঘটছে, তার প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন দেশের সংখ্যালঘু মুসলিম এলাকায়। এর ফলে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার বদলে মানুষ হয়ে উঠছে মৌলবাদী। তা ছাড়াও মুসলিম দেশগুলোয় বৃহৎ পরাশক্তির অহমিকার বোমা-বিস্ফোরণ মুসলিম যুবসমাজকে পথভ্রষ্ট করে মৌলবাদী হওয়ার পথে পা বাড়াতে সাহায্য করেছে। কমিউনিজমের পতনও দিগভ্রান্ত করেছিলো মানুষকে, ধর্মকেই আশ্রয় হিসেবে জেনেছে তারা।

বিপ্লব ছাড়া, গণজাগরণ ছাড়া মৌলবাদের দানবীয় শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করা আজ অসম্ভব। এদের ভয়ে যত কুঁকড়ে থাকবে মানুষ, সভ্যতার সংকট ততই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বাইরে থেকে যেমন জোর করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না, জোর করে মানবাধিকারও কোথাও চাপানো যায় না। যাদের জন্য গণতন্ত্র, যাদের জন্য সমানাধিকার, তাদেরকে প্রস্তুত হতে হয় এসব গ্রহণ করার জন্য। সচেতন না হলে প্রস্তুত হওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগাতে যুগে যুগে বহু চিন্তক, বহু সংস্কারক চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ব্যক্তিগতভাবে নিজের লেখালেখির মাধ্যমে সেই চেষ্টা আমি করছি।

মুসলিম অধ্যুষিত দেশে জন্ম হওয়ার কারণে মেয়েদের ওপর ইসলামের আইন এবং সংস্কারের শাসন দেখেছি খুব কাছ থেকে। বহু ধর্ম আর সংস্কৃতির সমাজে বড় হওয়ার কারণে অমুসলিম মেয়েদের ওপর অন্যান্য ধর্মের এবং সংস্কৃতির অনাচারও দেখা হয়েছে যথেষ্ট। আমি অতি ক্ষুদ্র একজন মানুষ। ডাক্তারি পড়েছি। ডাক্তারি করে সচ্ছল জীবন কাটাবো, এরকম কথা ছিল। সব ছেড়ে ছুড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নারী-বিদ্বেষীতে, পুরুষতান্ত্রিকে, ধার্মিকে আর অসহিষ্ণু মৌলবাদীতে ভরা সমাজে আমি যে নারীর অধিকারের কথা জোর গলায় বলতে শুরু করেছি, তা কেন? শখে? নাকি দায়িত্ব বোধ করেছি সমাজকে সুস্থ করার? কাউকে না কাউকে তো রুখে দাঁড়াতে হয় দুঃশাসনের বিরুদ্ধে। কেউ কেউ তো কোনও দুরভিসন্ধির সঙ্গে আপোস না করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে!

সুস্থতা, সাম্য আর সুন্দরের স্বপ্ন নিয়ে ধর্ম, মৌলবাদ, কুসংস্কার, পুরুষতন্ত্র ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আজ আমি তেরো বছর নির্বাসন-জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছি। মুখ বুজে থাকার শর্ত মেনে নিলে আমি হয়তো দেশে ফিরতে পারতাম। আশ্রয় চেয়ে চেয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে দৌড়োতে হত না। ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে বন্ধু স্বজনহীন দুঃসহ জীবন কাটাতে হত না। শুধু লিখবো বলেই তো, যে কথা লেখে না খুব বেশি মানুষ, শুধু যাবো বলেই তো সেই পথে, যে পথে সাহস নেই সবার যাবার।

আমি বারবার বলি মৌলবাদের বিরুদ্ধে এ আমার একার লড়াই নয়, এ সকল মুক্তচিন্তায়, মত প্রকাশের অধিকারে আর ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মানুষের লড়াই। এ লড়াই সত্যের সঙ্গে অসত্যের। যুক্তির সঙ্গে যুক্তিহীনতার। নতুনের সঙ্গে পুরোনোর। সভ্যতার সঙ্গে অসভ্যতার। সাম্যের সঙ্গে অসাম্যের। এ লড়াই জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞতার। শিক্ষার সঙ্গে অশিক্ষার। প্রগতির সঙ্গে পশ্চাৎপদতার।

প্রায়ই আমার ওপর রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক ধার্মিক মৌলবাদীদের হামলা হয়। হামলা হয় কেন? ফতোয়া জারি হয় কেন? মাথার দাম ঘোষণা হয় কেন? নিশ্চয়ই আমি সঠিক জায়গায় আঘাত করতে পেরেছি। আমি নারীর অধিকারের পক্ষে লিখবো এবং নারী-অধিকার বিরোধী শক্তি আমার ওপর খুশি থাকবে তা তো হতে পারে না।

কেবল শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেই যে তা হামলা, তা নয়। হিংস্র হামলা অপপ্রচার এবং বিষোদগার করেও তো হয় খুব। যখনই আমার ওপর মৌলবাদীদের আক্রমণ হয়, তখনই দেখেছি প্রগতিশীল মানুষ বা শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী যাঁরাই এগিয়ে আসেন মৌলবাদীদের সমালোচনা করতে, বলেন, তসলিমার মতের সঙ্গে অথবা সব মতের সঙ্গে আমি বা আমরা একমত নই, কিন্তু তার ওপর আক্রমণের প্রতিবাদ করছি। আমার তখন খুব জানতে ইচ্ছে করে আমার কোন মতের সঙ্গে তাঁরা একমত নন। ১. মানবাধিকার। ২. নারীর অধিকার। ৩. মানববাদ। ৪. সেক্যুলারিজম। এই চারটির মধ্যে কোনটি তাঁরা মানেন না? এই চারটি আদর্শের জন্যই তো আমার লেখালেখি, আমার লড়াই।

প্রগতিশীলের মুখোশ পরে থাকা কিছু মৌলবাদী আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, আমি যেন কাউকে না খোঁচাই, না ক্ষেপাই। আমি যেন 'বাড়াবাড়ি' না করি। আমার সংযত হওয়া উচিত, বুঝে শুনে লেখা উচিত, যেন মৌলবাদীরা বিরক্ত না হয়, মিছিল না করে। কেউ কেউ বলেন, এগুলো ইচ্ছে করেই করি, যেন মৌলবাদীরা ক্ষুব্ধ হয়, আস্ফালন করে আর আমার প্রচার হয়। কেউ কেউ বলেন, আমি লিখতে পারি না, না পদ্য না গদ্য। আমি সাহিত্যিক নই। আমি শুধু হঠাৎ হঠাৎ মৌলবাদীদের উসকে দেওয়া যায়, এমন মন্তব্য করি। মৌলবাদীদের তাই আমাকে আক্রমণ করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। কেউ কেউ বলেন, নারীর শিক্ষা স্বাস্থ্য স্বনির্ভরতা ইত্যাদি নিয়ে কোনও দিন লিখিনি আমি, নারীর অন্য কোনও স্বাধীনতা চাই না, শুধু যৌন স্বাধীনতা চাই। সুতরাং মৌলবাদীরা তো আক্রমণ করবেই। যাঁরা এসব অভিযোগ করেন, তাঁরা এই দেশে বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিরাট নাম করেছেন। আমার বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার আর মিথ্যে ছড়ালে মৌলবাদী-আক্রমণের যেন গ্রহণযোগ্যতা কিছু থাকে, এটাই চান তাঁরা।

ধর্মীয় মৌলবাদীরাই শুধু প্রতিবন্ধক নয়, আমার কণ্ঠরোধ করার জন্য বিশাল শক্তি উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে সামনে। বোকা ধর্মান্ধরা বিধায়ক হয়েও প্রকাশ্যে খুনের হুমকি দেয়, ল-বোর্ডের মাথা হয়েও মাথার দাম ঘোষণা করে, আমাকে হত্যা করে ফাঁসিতে যাবে অবধি বলে। দেশসুদ্ধ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক তাদের দেখে ছি ছি করে। কিন্তু সেই চালাক লোকেরা, যাদের আমরা প্রগতিশীল বলে জানি, খুব পণ্ডিতি ভঙ্গিতে

যখন বলেন আমার বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় অথবা এমন কথা আমার বলা উচিত নয়, যে কথায় অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে। তখন তাঁরা জনসাধারণকে অনেক বেশি প্রভাবিত করতে পারেন এবং তাঁরাই তখন প্রগতির বিরুদ্ধ-শক্তি হিসেবে মৌলবাদীদের চেয়েও দ্বিগুণ ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। 'বাড়াবাড়ি না করার ফতোয়া' 'মাথার দামের ফতোয়া'র চেয়ে বেশি বিপজ্জনক। মাথার দামের ফতোয়া দিলে হঠাৎ একদিন হুট করে খুন হতে হবে। বাড়াবাড়ি না করার ফতোয়া দেওয়া মানে বাকিজীবন আমাকে মুখ বুজে থাকতে হবে। একদিনের যন্ত্রণার চেয়ে দীর্ঘদিনের যন্ত্রণা নিশ্চয়ই ভযাবহ।

আমি যদি নারী বিরোধী দুই প্রধান শক্তি ধর্ম এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলি তাহলেই তো ধার্মিক এবং মৌলবাদীদের জন্য তা 'বাড়াবাড়ি'। এবং সেই শান্তিপ্রিয় সাহিত্যিকরাও একে বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন মৌলবাদ এবং নারীস্বাধীনতা দুটোই একটা সমাজে সহাবস্থান করবে এবং এদের মধ্যে কখনও কোনও সংঘাত হবে না। সংঘাত হলে দোষ নারীর। তাঁরা দুধ কলা দিয়ে মৌলবাদ নামক বিষধর সাপকে পুষে যাওয়ার উপদেশ দেন। চোখের সামনে এক সাপ থেকে লক্ষ সাপ জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু ভয়ে কুঁকড়ে মুখ বুজে শ্বাস বন্ধ করে বেঁচে যাওয়াকে তাঁরা ভাবেন 'বাড়াবাড়ি না করা'।

আমার ভাবতে ভালো লাগে এই মৌলবাদ বিরোধী সংগ্রামে আমি একা নই, অগুনতি ধর্মমুক্ত যুক্তিবাদী মানববাদী মানুষের মিছিলে আমি একজন। আমি ক্ষুদ্র একটি মানুষ কিন্তু 'আমরা' ক্ষুদ্র নই। আমাকে হয়তো একদিন খুব সহজেই নিঃশেষ করে দেবে শত্রুপক্ষ। কিন্তু 'আমাদের' নয়। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশংকা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় আমাকে। সেইদিন আমার মরেও শান্তি হবে, যেদিন জানবো নারীরা তাদের সবচেয়ে বড় বিরোধী শক্তিটিকে সনাক্ত করে পেরেছে। শক্তির নাম ধর্ম, নাম মৌলবাদ। সেইদিন আমার মরেও শান্তি হবে, যেদিন জানবো, জগতে মৌলবাদের অস্তিত্ব নেই, আর নারী তার পূর্ণ অধিকার নিয়ে মানুষের অধিকার নিয়ে শিক্ষা ও স্বনির্ভরতা নিয়ে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম নিয়ে বাঁচে। কোনও মৌলবাদ নেই যে বলে ঘোমটায় মাথা ঢাকো, বোরখায় গা ঢাকো, ঘরবার হবে না, পরপুরুষের সামনে যাবে না, হাসবে না, কথা বলবে না। মরেও শান্তি হবে যেদিন জানবো যে কোথাও কোনও মৌলবাদ নেই যে চোখ রাঙিয়ে বলে, স্বামীর দাসী হবে, অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তার সব আদেশ নিষেধ, স্বামীর আর সব স্ত্রীদের মেনে নেবে, স্বামী যত চায় তত সন্তান জন্ম দেবে, স্বামীর মার খাবে মুখ বুজে। কোনও মৌলবাদ নেই যে তর্জনী তুলে বলে, কারও উত্তরাধিকারী নও তুমি, কারও কিছু নও তুমি, তোমার জীবন তোমার নয়, অন্যের সুবিধের জন্য, অন্যের মঙ্গলের জন্য, তুমি মানুষ নও, তুমি নরকের কীট, তুমি দোযখের দরজা।